আমি ভিশি বলছি

জয়ন্ত দত্ত



আমি ভিশ বলছি

আমি ভিশ বলছি

জয়ন্ত দত্ত

পরিবেশক

নাথ ব্রাদর্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৮০
মাঘ ১৩৮৬
প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা-৭০০০২৯
প্রচ্ছদ শিল্পী
গৌতম রায়
মুদ্রাকর
জি. শীল
ইম্প্রেসন প্রবলেম
কলকাতা-৫

পনেরো টাকা

উৎসর্গ

যার প্রেরণা, ইচ্ছা ও সাহায্যে
এই গ্রন্থের প্রকাশ
সমীরকুমার নাথ
প্রীতিভাজনেষু

আমি ভিশ বলছি

ইডেনে শীতের দুপুর।

ক্রিকেটের নন্দন কানন ইডেনের বুকে ব্যাট হাতে নেমেছেন ক্রিকেটের নন্দদুলাল। গোটা মাঠ স্তব্ধ। বিস্ময় বিস্ফারিত দু চোখের কোলে সজল আনন্দাশ্রু। আহা—কে গো এই সাধন সিদ্ধ সন্ন্যাসী। যার হাতে অর্জুনের শক্তিলব্ধ অপরাজেয় গাণ্ডিব! বিপদের মধ্যে কে এই যোগী তাপস—অনাবিল পদসঞ্চালনে লাল বলের উদ্দাম লহরীকে উপেক্ষা করে যিনি বাজিয়ে চলেছেন আপন হাতের ডমরু। যার ঝংকারিত প্রাণ উন্মাদনায় বুকের তন্ত্রীতে বেজেছে যৌবনের স্বতস্ফূর্ত হৃদয় চঞ্চলতা। রূপের সঙ্গে রঙ—রঙের সঙ্গে সুর—সুরের সঙ্গে তাল—সব মিলিয়েই সৃষ্টি হয় এক অনুপম শিল্পশ্রী—যার তুলনায় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রূপকার বাধ্য হন নিজের আপন স্বর্গীয় অহংকারকে তুচ্ছ করে নবজাতককে বরণ করতে। দু হাত বাড়িয়ে নিজের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে, তাই উদার শিল্পীকে নির্দ্বিধায় বলতে শোনা যায়ঃ "এসো, তোমাকে আমি গ্রহণ করি। তোমার আবির্ভাবে আমার শাশ্বত আত্মার মুক্তি হোক। তোমার শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে জাগ্রত হোক আমার অস্তিত্ব। তোমার বিকাশে হোক আমার প্রকাশ।"

সৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার এই চরম মিলনেই পৃথিবীর যাবতীয় শিল্প সত্তার প্রতিষ্ঠা। জগৎ-বিখ্যাত শিল্পী ভিশ কি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জানতেন, তিনি কি সৃষ্টি করতে চলেছেন?' মনে হয় জানতেন না। রূপের মধ্যে অরূপের পরিক্রমা না ঘটলে তো সত্যিকার শিল্প সাধন সম্ভব হয় না। তাই সেদিন মোনালিসার সুষমাসিদ্ধ হাস্যময় রূপের কথা চিন্তা না করেই সর্বকালের সেরা শিল্পী তাঁর সাধন সাধনা শুরু করেছিলেন। সৃষ্টি হয়েছিল অমর শ্বাশ্বত রূপ ঐশ্বর্যের সুষমাসিদ্ধ ধ্রুপদী লালিত্যের এক চিরকালীন অমৃতময় রূপ।

ফিরে আসি ইডেনের ক্রিকেট প্রাঙ্গণে।

হলুদ উইকেট লক্ষ্য করে ধেয়ে আসে লাল বলের অগ্নিবান। বিধ্বস্ত ভারতীয় ক্রিকেটের মর্মান্তিক হৃদয়যন্ত্রণা। বুকের গভীরে বেজে

চলেছে ব্যাথার বেহাগ রাগিনী। লক্ষ্য লক্ষ্য ক্রিকেটানুরাগীর হৃদয় তন্ত্রীতে সংগোপনে ধ্বনিত হয়ে চলেছে এক সুগভীর আন্তরিক আর্তি—"কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।"

একজন যায়, অন্যজন আসে—সেই বা কতক্ষণ। তবে কি কেউ নেই? কেউ কি পারবে না এই উদ্দাম লহরীর ভীষণতা থেকে ভারতের ক্ষতবিক্ষত মুমূর্ষু ক্রিকেটকে রক্ষা করতে? পারবে নাকি জাতীয় স্বার্থে ভারতীয় ক্রিকেটের বিনম্র মর্যাদাকে সবার উপরে নতুন করে তুলে ধরতে?

মনের আশা সংশয়ে দোলা দেয়। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলতে থাকে মনের আশা—নিরাশার দ্বন্দ্ব। অনিশ্চিত ক্রিকেটের দিকে তাকিয়ে লক্ষ লক্ষ উৎকণ্ঠিত কলকাতার ক্রিকেটপ্রিয় মানুষ—হৃদয়যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে—প্রার্থনা করতে থাকেন ক্রিকেটের দেবতার কাছে।

মেঘ সরে যায়। ইডেন ধীরে ধীরে নবপ্রাণের উন্মাদনায় হয়ে উঠে আলোকিত। বাতাসে বাতাসে শিহরণ জাগে। শোনা যায় কানাকানি—"ওরে আর ভয় নেই—সে এসেছে—এসেছে আমাদের মুক্তির দেবদূত।"

খানিক আগে যে ইডেন ক্যারিবিয়ান বলবাজদের হুংকারিত রক্তচক্ষুর শাসানিতে বিবর্ণ প্রাণহীন হয়ে উঠেছিল, সেই ইডেনে আবার চললো হিল্লোলিত প্রাণচেতনা। ১৯২ রাণের মাথায় রবার্টস মদনলালের উইকেট ছিটকে দিয়ে ভেবেছিলেন গোটা ভারতবর্ষকে বুঝি তিনি নিজের হাতের মুঠোয় পুরে ফেলেছেন। কিন্তু তাঁর সেই আশা যে কত অমূলক, তা বোঝা গেল একজন খুদে ব্যাটধারীর একাগ্র সাধনসিদ্ধ ব্যাট চালনার মধ্যে। অনভিজ্ঞ কার্যণ ঘাউড়ীকে সঙ্গী করে বিশ্বনাথ সেদিন ত্রাণকর্তার ভূমিকায় দলের সমস্ত দায়-দায়িত্ব তুলে নিলেন নিজের কাঁধে। শুরু হলো গোটা একটা দলের সঙ্গে এক নির্ভীক যোদ্ধার মহাসমর। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যু

বধের পর অর্জুন গাণ্ডিব হস্তে যে রোষানলে সপ্তরথীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, ঠিক সেই রূপে ক্রিকেটের মহাসমরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন ক্রিকেটের অর্জুন বিশ্বনাথ। তাঁর হাতের ব্যাট সাধনসিদ্ধ গাণ্ডিবের মতো লাল বলের সমস্ত অহংকারকে ধূলায় লুণ্ঠিত করতে লাগলো।

চমৎকার স্কোয়ার কাট।

অফের দিকে সাতজন সেনানী দাঁড় করিয়েও বিশ্বনাথকে মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ করতে পারলেন না ক্যারিবিয়ান দলনেতা লয়েড। নিখুত ছবির মতো তাঁর হাতের ব্যাট থেকে সৃষ্টি হতে লাগলো এককেটি অনুপম শিল্প—সংগীতের সুরে, কাব্যের রসে, শিল্পের গাম্ভীর্যে যা হয়ে উঠেছিল একক, অবর্ণনীয়।

বিশ্বনাথ যে একজন জাত শিল্পী, তার প্রমাণ সেদিন পেয়েছিলেন ইডেনের মানুষ। তাঁর সৃষ্টি ১৩৯ রাণের ইনিংসটি আজো ইডেনের স্মৃতির দেয়ালে ভিঞ্চির মোনালিসার মতো খোদাই করা আছে।

পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে পড়ছে সেই দিনটির কথা! মনে পড়াই স্বাভাবিক। সার্থক শিল্পের অনুপম রূপবিন্যাস একবার প্রত্যক্ষ করলে কি তা ভোলা যায়, নাকি ভোলাটা উচিত। তাই আজো কলকাতার মানুষ অসংখ্য গরিমাদীপ্তময় ইনিংস প্রত্যক্ষ করার পরও শট দেখতে পায়, বিশ্বনাথ সৃষ্ট সেই ক্লাসিক কাব্যময় ধ্রুপদী ইনিংসটি—এখানেই বুঝি শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব, শিল্পীর উত্তরণ।

থাক—১৯৭৪-৭৫ সালের কথা।

এই ম্যাচ প্রসঙ্গে আবার পরে বলা যাবে। এখন তার আগে আসুন আমরা পিছনের দিকে আরো কয়েকটা বছর পিছিয়ে যাই।

১৯৬৯-৭০।

ভারতীয় ক্রিকেটের যুগসন্ধিক্ষণের মুহূর্তে! ইংল্যাণ্ড ও নিউ-

জিল্যাণ্ডের সঙ্গে তার আগে ভারতীয় দল খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। বিশেষ করে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে হতাশ হয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটের কর্মকর্তার দল। তারা পুরনো খেলোয়াড়দের বাতিল করে এই সফরে বেশ কিছু নতুন ক্রিকেটারদের দিয়ে পরীক্ষামূলক লড়াই-এর চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় নি। নতুন খেলোয়াড়দের অধিকাংশই পারেননি, পুরনো খেলোয়াড়দের প্রকৃত উত্তরসূরী হতে। যাঁদের নিয়ে ছিল অনেক আশা উদ্দীপনা তাঁরা প্রমাণ করেছেন নিজেদের অযোগ্যতা। এর ফলে ১৯৬৯-৭০ সালের মরশুমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিকেট কর্তার দল বোম্বাইয়ের প্রথম ম্যাচে কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে আবার ডাক দিলেন দল থেকে বাতিল হয়ে যাওয়া সারদেশাই ও বোরদেকে। পাতাউদীর নেতৃত্বে এই ম্যাচে ভারতীয় ব্যাটধারীরা কেউই পারলেন না নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে। ব্যর্থ হলেন সারদেশাই ও বোরদে। অস্ট্রেলিয়া একরকম প্রায় সহজ ভাবেই ম্যাচ জিতে গেল আট উইকেটে।

প্রথম পরাজয়।

কর্মকর্তার দল আবার নতুন করে বসলেন ভাবনা চিন্তা করতে। দেশে কি সত্যি আর কোন তরুণ খেলোয়াড় নেই? ভারতীয় ক্রিকেটের ধারা কি থেমে গেল! উমড়িগড়, মঞ্জরেকারের পর বোরদে, সারদেশাই যে ভাবে জায়গা নিয়েছিলেন, সেই জাতের কি আর কোন নতুন খেলোয়াড় নেই?

শুরু হলো ভাবনা চিন্তার পর্ব।

দীর্ঘ আলোচনার পর ক্রিকেট বোর্ড সিদ্ধান্ত নিলেন একজন তরুণ খেলোয়াড় সম্পর্কে। নিউজিল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে তাই একটি তরুণ ব্যাটসম্যানকে দলে ডাকা হয়নি। হয়ত তাকে সেই সফরেই ডাকা উচিত ছিল।

রণজি ট্রফিতে এই খুদে ছেলেটা খুব একটা খারাপ খেলছে না।

তাছাড়া নিউজিল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে বোর্ড সভাপতি একাদশের হয়ে খেলে মন মাতিয়ে ছিল সকলের। হাতে চোস্ত মার আছে। অভিজ্ঞের দল সেদিন তাঁর ৬৮ রাণের শক্ত সংযত মধুর ইনিংসটি প্রত্যক্ষ করে বলেছিলেন,—"ভবিষ্যতের সম্ভাবনা।"

অতএব কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড অভিজ্ঞ সারদেশাই, বোরদে, স্থূর্তি ও আবিদ আলীকে বাদ দিয়ে দলে নিলেন অশোক গন্ধোত্রা, সোলকার, সুব্রত গুহ ও বিশ্বনাথকে।

বিশ বছরের তরুণ বিশ্বনাথ সেদিন নিজেও ভাবতে পারেননি, কানপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর আকর্ষিক ভাবে ডাক পড়তে পারে।

প্রথম টেস্টে বিপর্যস্ত ভারত কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে দারুণ লড়াই করলো। এই ম্যাচে গড়ে ছিল ৩২০ ও ৩১২ রাণে সাত উইকেটের ইনিংস। চমৎকার বোলিং করেছিলেন বেদী ও প্রসন্ন। অস্ট্রেলিয়া দল ভারতীয় স্পিনের সামনে মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল। ম্যাচের ফলাফল ছিল অমীমাংসিত।

প্রথম ইনিংসে নবাগত বিশ্বনাথ ব্যাট হাতে উইকেটে এসে দাঁড়াবার সুযোগ পেলেন না। স্থিরভাবে তাঁকে নজর করার আগেই অভিজ্ঞ ম্যাকেঞ্জি তাঁকে ইনসুইং বলে বধ করলেন। গোটা মাঠ মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েছিল!

কে এই যুবক—পরিচয় দেওয়ার আগেই বিদায়ের প্রস্তুতি। ব্যর্থ সুকুমার লজ্জায় মাথা নামিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন প্যাভেলিয়ানের পথে। অসহ্য—গোটা মাঠের মানুষ তাকে দেখছে। উপেক্ষার দৃষ্টিতে বিদ্ধ করছে। পথ যেন ফুরতে চায় না। ইচ্ছে করে এক ছুটে প্যাভেনিয়ানের মধ্যে প্রবেশ করে নিজেকে আত্মগোপন করতে। এই মুখ তিনি দেখাবেন কাকে? কে তাঁকে সান্ত্বনা দেবে?

প্যাভেলিয়ানে প্রবেশ করছেন বিশ্বনাথ। ব্যাট হাতে বেরিয়ে আসছেন দলনায়ক পাতাউদী। মুখোমুখি দেখা। লজ্জায় দলনায়কের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারে না সে। সহসা শুনতে পেলো দল-

নায়কের কণ্ঠস্বর। বাতাস কাঁপিয়ে বুকের গভীরে প্রকম্পিত হলো সেই কণ্ঠস্বর—"দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, এখনও আর একটা ইনিংস তোমার হাতে আছে। মনোবল হারাবার কিছু নেই।"

শুধু এই কথা—পাতাউদী প্রবেশ করলেন মধ্যমাঠে। প্যাভেলিয়ানে প্রবেশ করে কারো সঙ্গে দেখা করতে মন চাইলো না আর। কথা বলবেন কার সঙ্গে, কোথায় বসবেন তিনি—সবাই যে তাঁকে দেখছে। কারো আশা তো তিনি পূরণ করতে পারেননি। দু পায়ের প্যাড খুলতে খুলতে তাঁর দুচোখ জলে ভরে এলো। আবছা হয়ে এলো দৃষ্টি। তবে কি আমার ভবিষ্যৎ আজই নির্ধারিত হয়ে গেল! আর কি আমি পাব না ভারতীয় দলের একজন অংশীদার হতে!

মনের ভাবনায় দোলা লাগে। আবার বুকের গভীরে বেজে ওঠে ব্যথার নূপুর। রক্তে রক্তে প্রকম্পিত হয় পাতাউদীর আন্তরিক কথাগুলি—"দুচিন্তার কোন কারণ নেই, এখনও আর একটা ইনিংস তোমার হাতে আছে।"

কথাগুলো উর্মিমালার মতো একের পর একে আছড়ে পড়তে থাকে। কে যেন বলতে থাকে—"ওহে যুবক, নিজেকে বিশ্বাস কর, নিজের শক্তির কথা ভাব। আত্মবিশ্লেষণ হৃদয়ের গ্লানি দূর করে—মনকে বিশ্বাসী হতে শেখায়। বিশ্বাস দিয়ে নিজের শক্তিকে আঁকড়ে ধরে রাখলে, আত্মসত্বা জাগ্রত হয়। নিজেকে বল, আমি পারবো, পারবো বিগত গ্লানি আর ব্যর্থতার মধ্যে আত্ম-ঐশ্বর্যের সুষমাকে প্রকাশ করতে।"

সেই মনের মধ্যে একটা কঠিন বিশ্বাস বটবৃক্ষের মতো শিকড় গেড়ে বসলো। তারি পরিপূর্ণ এক রূপ প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলো কানপুরের গ্রীনপার্ক।

গ্রীসন, কনোলী, ম্যাকেঞ্জী, ম্যালেট দিয়ে আক্রমণ চালিয়েও বিশ্বনাথকে দ্বিতীয় ইনিংসে মুহূর্তের জন্য শান্ত করতে পারলেন না অস্ট্রেলীয় দলনেতা বিল লরী।

চমৎকার মার! উইকেটের চারদিকে তাঁর হাতের ব্যাট সুদর্শন-চক্রের মতো পাক খেতে লাগলো। ক্রিকেট কেতাবে যতগুলি মার আছে, তার সবগুলিকেই একে একে প্রদর্শন করলেন খুদে মানুষটি। শান্ত, সংযত, রূপলাবণ্য মিশ্রিত নিরহংকর বৈরাগ্যের সঙ্গে সেদিন সমন্বয় ঘটেছিল এক বীরসত্ত্বার। একদিকে হুংকারিত তেজস্বী গরিমা আর অন্যদিকে সাধনসিদ্ধ বৈরাগ্যের দীপ্তি সব মিলিয়ে সেদিনের বিশ্বনাথ প্রমাণ করলেন ভবিষ্যৎ ভারতীয় ক্রিকেট ভূমিতে নিজের অস্তিত্ব।

দেখতে দেখতে কানপুরের ভূমি সার্থক শিল্পীর নিখুঁত তুলির টানে হয়ে উঠলো রমণীয়। উদ্বত লাল বলের সার্বিক অহংকারকে হেলায় পদদলিত করে, তরুণ এক ভারতীয় শিল্পী আপন যাদুস্পর্শের মোহিনী রূপকোঠায় সৃষ্টি করলেন পিকাশোর ভাস্কর্য সদৃশ্য এক শাশ্বত শিল্পশৈলী, যার বর্ণাঢ্য রূপ পরিক্রমায় সার্থক হলো কানপুরের ঐতিহ্যময় ক্রিকেট প্রাঙ্গণ।

অনবদ্য ইনিংস খেললেন বিশ্বনাথ। সুযোগহীন তাঁর এই ১৩৯ রাণের রমণীয় ইনিংসটি আজো যে কোন ক্রিকেটারের কাছে সুখ-স্বপ্নময় কল্পনার প্রত্যাশা।

কানপুরের পর দিল্লী

রাজধানী দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলায় ভারত জিতলো। ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে সে এক অমোঘ মুহূর্ত।

২৮শে নভেম্বর। উজ্জ্বল সূর্যালোকে উদ্‌ভাসিত ফিরোজ শাহ কোটলায় টসে জিতলেন লরী। পর পর দুটি ম্যাচে টসে হারার পর—এই হলো তাঁর প্রথম জয়। এই ম্যাচে ভারতীয় দলের খুব একটা

পরিবর্তন ঘটানো হলো না। কেবলমাত্র কানপুরে অশোক গন্ধোত্রা সফল হতে না পারার দরুন, তাঁর বদলী হিসাবে দলে আনা হলো বাংলার অম্বর রায়কে।

ভারতীয় দলপতি, সুব্রত গুহ ও সোলকার দিয়ে শুরু করলেন আক্রমণ। প্রথম আধ ঘন্টার মধ্যেই অস্ট্রেলীয় ব্যাটিংয়ে বিপর্যয় ঘটলো। সুব্রত গুহর অফ্ স্টাম্পের বাইরে পীচ পড়া বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনলেন লরী। বল তাঁর ব্যাটের কানায় লেগে ভিতরে ঢুকে পড়ে ধাক্কা দিল উইকেটে। মাত্র দলের ৩৩ রাণের মাথায় নিজস্ব ৬ রাণ করে গুহর বলে ফিরে গেলেন লরী। প্রাথমিক এই বিপর্যয় অবশ্য কাটিয়ে উঠতে অস্ট্রেলিয়ানরা চেষ্টার ত্রুটি করলো না। চমৎকার ক্রিকেট খেললেন স্ট্যাকপোল ও ইয়ান চ্যাপেল। উইকেটের চারদিকে রাজসিক মারের বহর দেখিয়ে চ্যাপেল এই ইনিংসে গড়লেন সেনচুরি। স্ট্যাকপোল হাত খুলে মেরে শেষ অবধি নিজস্ব ৬১ রাণে আউট হলেন বেদীর বলে। স্ট্যাকপোলের বিদায়ের প্রায় পরে পরেই একে একে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন ওয়ালটার্স, রেডপাথ, পল সিহানের মতো ব্যাটধারী। একশো রানে দুই উইকেট থেকে আধ ঘন্টার মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার চেহারা পাঁচ উইকেটে একশো তেত্রিশ রানে। অস্ট্রেলিয়ানদের সৌভাগ্য যে তাদের এই বিপর্যয় সামলাতে চ্যাপেলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চেষ্টার ত্রুটি করলেন না টেবার। ভারতীয় স্পিনের সামনে তাঁরা অসাধারণ খেললেন। খেলার গতি অসম্ভব ঝিমিয়ে পড়েছিল এক সময়। নিখুঁত কেতাবী ঢঙে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলে চ্যাপেল ও টেবার আবার নতুন করে প্রমাণ দিলেন অস্ট্রেলীয় চরিত্রের। তীব্র আক্রমণের সামনে নতি স্বীকার করতে অস্ট্রেলিয়ানরা কোন কালেই রাজি নন। তাঁদের কাছে মূল লক্ষ্যই হলো ম্যাচ জেতা। এই প্রসঙ্গে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় জগৎবিখ্যাত ক্রীড়া সমালোচক স্যার নেভিল কার্ডাসের উক্তিটি মনে পড়ছে। একদা কার্ডাস সাহেব বলেছিলেন—

"Kangaroo is a funny animal. When attacked, it defends itself.… No match is ever lost till it is won."

প্রকৃত ক্রিকেট-রসিকদের কাছে মনে হয় কার্ডাসের এই উক্তিটি অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট চরিত্রের প্রহেলিকাময় রস অনুধাবনের পক্ষে যথেষ্ট।

পাক্কা দেড় ঘণ্টায় চ্যাপেল ও টেবারের ব্যাট থেকে রান উঠলো মাত্র কুড়িটি। সৌভাগ্য অস্ট্রেলিয়ানদের—বেদী ও প্রসন্নের নিখুঁত ফ্লাইটের টান বারবার খেলতে ভুল করা সত্ত্বেও নেহাতই ভাগ্যের দোহাইয়ে বিসদৃশ ভাবে প্রাণে বেঁচে গেলেন টেবার। শেষ অবধি ২৫১ রানের মাথায় টেবারের অস্বস্তিকর ক্রিকেটের মুক্তি ঘটলো। বেদীর শূন্যে ভাসমান বলের পাকে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে টেবার স্ট্যাম্প হলেন ইঞ্জিনিয়ারের হাতে। মাত্র ন রাণের ব্যবধানে ফিরলেন ম্যালেট। শেষ অবধি চ্যাপেল ও ম্যাকেঞ্জির প্রচেষ্টায় অষ্টম উইকেটে রান উঠলো কিছুটা। এই ইনিংসে তুরন্ত ব্যাট করলেন চ্যাপেল। তাঁর বীরদীপ্ত ব্যাট থেকে নির্গত হয়েছিল ১৩৮রানের একটি উত্তপ্ত ইনিংস। ভারতের পক্ষে বেদী ও প্রসন্ন পেলেন চারটি করে উইকেট।

এরপর ভারতীয় দলের পালা। ফারুক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে প্রথম উইকেটে জুটি বাধলেন অশোক মানকাদ। চমৎকার খেলা শুরু করলেন তুই ব্যাটধারা। ম্যাকেঞ্জি, কোনোলী, গ্লিসন, ম্যালেটকে ছিন্নভিন্ন করে দেদার মেজাজে হাত খুলে পেটাতে লাগলেন তুই ব্যাট-ধারী। ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন শুরুতেই মারের রাজা। তাঁদের উদ্ধত ব্যাটের দর্পিত ঘায়ে রান এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছালো সত্তরের কাছা-কাছি। ঘন ঘন বোলার বদল শুরু করলেন লরী। মাঠের চারদিকে খেলোয়াড় ছড়িয়ে প্রাচীর সৃষ্টি করেও রানের গতিকে বাধা দিতে পারলেন না। শেষ অবধি নিজের মারমুখী খেলার ভুলেই কোনোলীর একটি নিকৃষ্ট বলে সরাসরি বোল্ড হলেন ইঞ্জিনিয়ার। অশোক মানকাদের সঙ্গে জুটি বাঁধতে এগিয়ে এলেন বোম্বাইয়ের দলপতি অজিত ওয়াদেকার। বাঁহাতি ওয়াদেকার মারমুখী ক্রিকেটার হিসাবে

পরিচিত। দিল্লীর মানুষকে তিনি খুশী করতে ভুললেন না। উইকেটের চারদিকে হাত খুলে মেরে দলের রান বাড়াতে লাগলেন অশোক মানকাদের সঙ্গে। এই সময় লরী স্ট্যাকপোলকে নিয়ে এলেন ম্যালেটকে বদল করে। নতুন বোলার স্ট্যাকপোলকে পেয়ে হাত খুলে মারার প্রবণতা যেন বেড়ে গেল। একথা ঠিক—এইদিন স্ট্যাকপোল সত্যি ভাল বল দিয়েছিলেন। একমাত্র তাঁর বলেই বেশ কয়েকবার বিপাকে পড়েছিলেন ভারতীয় ব্যাটধারীরা। ওয়াদেকার তবু বিপদের মধ্যে ঝুঁকি নেওয়ার চেষ্টা করলেন। এর ফলে অচিরেই তাঁকে দোমোনা ভাবের জন্য আউট হতে বাধ্য হতে হলো। স্ট্যাকপোলের ঝোলানো বলে ড্রাইভ করতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সংযত করার চেষ্টায় স্ট্যাকপোলের হাতেই ক্যাচ তুলে বিদায় নিলেন ওয়াদেকার।

ওয়াদেকার ফিরছেন—প্যাভেলিয়ান থেকে বেরিয়ে আসছেন সেই আকাঙ্ক্ষিত দক্ষিণ-ভারতীয় তরুণ যুবক। ধীর স্থির শান্ত, পরিচ্ছন্ন এক যোগী পুরুষ এসে দাঁড়ালেন উইকেটের সামনে। গোটা দিল্লীর মানুষ উত্তেজনায় আবেগে থর থর কেঁপে উঠলো। এই কি সে—এই কি তিনি? দু চোখ ভরে তাঁরা প্রত্যক্ষ করতে থাকেন সাধনসিদ্ধ বৈরাগীকে, যাঁর হাতের একতারার মোহিত ঝংকারে উদ্বেল হয়ে ওঠে সমাগত দর্শকদের হৃদয়তন্ত্রী। একতারার সুরমাধুর্য ভাববিহ্বলতা এনে দেয় উদ্বেলিত চিত্তের—তাঁরা শিল্পীর সঙ্গে খনিকের মধ্যেই হয়ে যান একাকার। পরিচয় ঘটে অন্তরে-অন্তরে। আত্মস্থ শিল্পী নিজের ভাবসাধনায় নিরহংকার ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেন রমণীয় মুদ্রা।

বিস্ময় জাগানো খুদে মানুষটি নিজের জাগ্রত সত্বাকে প্রকাশ করে প্রথম হুক সট নিলেন গ্রীসনকে। এরপর চমৎকার ভাবে লেগের দিকে দু-দুটো বাউণ্ডারী মারলেন কোনোলীর বলে। চোখ জুড়ানো স্বপ্নের মার—কল্পনার রঙ তুলীতে আঁকা ঠিক যেন এক রেখাচিত্র। মাত্র পঁচাত্তর মিনিট—সময় যেন পার হয়ে গেল কোথা দিয়ে। ব্যাট

হাতে যে এতক্ষণ কোন ক্রিকেটারের খেলা মানুষ দেখছিল, এ কথা যেন ভুলে গিয়েছিল সকলে। মনে হচ্ছিল কোন শিল্পীর ধ্রুপদী শিল্পের মাধুর্য লাবণ্যতায় গোটা মাঠ যেন অবগাহনে ব্যস্ত ছিল এতক্ষণ।

নিখুঁত মন মাতানো একেকটি স্ট্রোক। যেমন অন ড্রাইভ, তেমনি স্কোয়ার কাট। নন্দলাল বসুর আঁকা একেকটি অমর শিল্পচিত্র যেন। ব্যাট স্পর্শিত লাল বল ঠিক তার পথ করে নিচ্ছে সীমানার বাইরে ছুটে যাওয়ার। আহা—কি সে উন্মাদনা!

মাত্র পঁচাত্তর মিনিট ব্যাটিংয়ে ক্রিকেটের ক্লাসিক স্ট্রোকগুলিকে প্রদর্শন করে ভারতীয় ক্রিকেটের যোগীসাধক শিল্পী বিশ্বনাথ দিনের শেষ বেলায় ফিরে এলেন ম্যালেটের বলে। পরের দিন সকালে লাঞ্চের আগেই ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘটলো। অশোক মানকাদ স্নায়ুর চাপে বিধ্বস্ত হয়ে মাত্র তিন রানের জন্য সেনচুরি লাভে বঞ্চিত হয়ে ফিরে এলেন প্যাভেলিয়ানে ২২৩ রানে ভারতের ইনিংস শেষ হলো। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র কিছু রাণে এগিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়ানরা মোটেই সুবিধে করতে পারলেন না। মাত্র তিন ওভার নিয়মরক্ষায় পেস আক্রমণ চালিয়ে পাতাউদী ডাক দিলেন প্রসন্ন ও বেদীকে। ভারতীয় স্পীন বোলিংয়ের বুদ্ধির জালে অচিরেই জড়িয়ে গেল গোটা অস্ট্রেলিয়া দল। একমাত্র ইয়ান চ্যাপেল ছাড়া আর কেউই পিঠ সোজা রেখে দাঁড়াতে পারলেন না। মাত্র ১০৭ রাণে অস্ট্রেলিয়ার মস্ত নামডাক সর্বস্ব দলটি মুড়িয়ে গেল। বেদী ও প্রসন্ন পেলেন পাঁচটি করে উইকেট।

জয়ের জন্য ভারতের তখন দরকার মাত্র একশো একাশি রান। ইঞ্জিনিয়ার ও অশোক মানকাদ—এমনি এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে সুযোগ নিতে পারলেন না। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে চারদিক থেকে ভারতকে সাঁড়াশি আক্রমণে চেপে ধরলেন লরী। স্পিন উইকেটে তিনিও ফায়দা তোলার চেষ্টা করলেন ম্যালেটকে দিয়ে। তাঁর এই প্রচেষ্টা কার্যকারী হলো। শুরুতেই মাত্র ১৮ রানের মধ্যেই ফিরে

গেলেন ছুই প্রারম্ভিক ব্যাটধারী। উইকেটে এসে জুটি বাঁধলেন ওয়াদেকার ও বিশ্বনাথ।

একজনের হাতে বীরচক্র—অন্যের হাতে নৃত্য মুদ্রার বরাভয়। একজন বেপরোয়া, অন্যজন ধীর, স্থির, সংযমী। উইকেটের চারদিকে হাত খুলে বেপরোয়া পেটাতে লাগলেন ওয়াদেকার। ম্যালেটকে ওই মারের মুখে তুলে নিতে বাধ্য হলেন লরী। ম্যাকেঞ্জি-কোনোলীকে দিয়ে তিনি করলেন আক্রমণ। তাতেও কোন ফল ফললো না। সাধক সন্ন্যাসী তাঁর নিরহংকারিত ব্যাটের বিনম্র দাপটে এঁকে যেতে লাগলেন একের পর এক রমণীয় দৃশ্যাবলী।

রান বাড়তে লাগলো।

সময় গড়াতে লাগলো। ভারতের জয় পায়ে পায়ে হেঁটে এসে সহজভাবে পৌঁছলো ফিরোজ শাহ কোটলায়।

কোনোলীর বলে শেষ রানটি এলো বিশ্বনাথের স্পর্শিত ব্যাট ঝলক থেকে।

জয়—জয়—ভারত জিতলো। দিল্লীর মানুষ প্রেম-উন্মত্ততায় জড়িয়ে ধরলো ক্রিকেটের শিল্পীকে—যার অনুপম শিল্পশৈলীর সুষমা ভারতের জয় মাহাত্ম্য এক অমৃতময় রস-সাগরে পরিণত হয়েছিল সেদিন। এই মরশুমে বিশ্বনাথ বাকি ছুটো ম্যাচে খারাপ খেললেন না। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথম সিরিজেই তাঁর চারটি ম্যাচের আটটি ইনিংসের মধ্যে একটিতে অপরাজিত থেকে সংগৃহীত হলো ৩৩৪ রান—যার গড় ছিল ৪৭·৭১ রান।

আমার ছেলাবেলা

আমার নাম গুণ্ডাপ্পা রঙ্গনাথ বিশ্বনাথ। যদিও আমার সত্যিকার পরিচয় এই নামে নয়—আমার বন্ধু ও আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষীর দল তাঁরা আমার নাম দিয়েছেন—ভিশ—এই ভিশ নামেই আমায় সকলে এক নজরে চিনে নেয়। এই নামেই আমার যথার্থ পরিচয় ক্রিকেট এবং ক্রিকেট-প্রিয় মানুষের সঙ্গে।

আমার এই নাম—আমার দাদুর দেওয়া, মায়েরও খুব পছন্দ—অতএব আমারও পছন্দ আমার নিজের নামটিকে। নিজেকে ভালোবাসা জীবনের কাছে সবচেয়ে বেশী করে দরকার। নিজেকে ভালোবাসতেই মানুষ শেখে নামের প্রতি মোহ আকাঙ্ক্ষার গণ্ডি পার করে মাথা তুলে দাঁড়াতে। আমিও বরাবর চেয়েছি, এমন একজন হতে, যাতে আমার নাম সবাই করে। সবার কাছে ছড়িয়ে পড়বে আমার নাম—আমি থাকবো মুখে মুখে। জীবনের এই বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল বহু আগে। আমি তখন নেহাতই স্কুলের ছাত্র। গাঁয়ের পাঠশালায় বই খাতা বগলে নিয়ে স্কুলে যেতাম। কিন্তু একথা ঠিক—তখন মনে বিশেষ কোন স্থির চিন্তা ছিল না, আমি কি হবো। তখন আমি বয়সের কল্পনার ডানায় ভর করে পাখীর মতো ছুটে যেতে চাইতাম সর্বত্র—যা দেখতাম তাই হতে বাসনা জাগতো। যাতেই বিস্ময় বোধ করেছি, তাকেই আঁকড়ে ধরেছি।

ভদ্রওয়াত্তির সেই দিনগুলো ছিল সোনালী সুখ-স্বপ্নের মতো। মেঠো পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম বন্ধুদের সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে বলি, ছোট থেকেই আমার স্বভাব ছিল একটু লাজুক গোছের। বেশী কথা বলতে আমার লজ্জা করতো, তবে মানুষের সঙ্গে মিশতে যে ভালো লাগতো না তা নয়। আমি মিশতাম সকলের সঙ্গে—কথা কম বললেও আমাকে সকলে ভালোবাসতো। বিশেষ করে আমার মা—আমার

জীবনে আমার মায়ের আদর্শ অনেক বড়। তা বলে ঠিক নয় যে আমি আমার বাবাকে কম ভালোবাসতাম। সত্যি বলতে কি আমার বাবা ছিলেন খুব ভালো মানুষ। দিনরাত তিনি ব্যস্ত থাকতেন নিজের কাজ নিয়ে। কাজের মানুষ ছিলেন তিনি। বাবা ছিলেন স্টেট ইলেকট্রিক সিটি বোর্ডের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। কাজেই বাবাকে কাজের জন্য বড় একটা কাছে পেতাম না, যতটা কাছে পেতাম মাকে।

ভাইবোন মিলিয়ে আমরা ছ'জন। দুই ভাই, চার বোন। ভাই-বোনে আমাদের বড় মিল। বিশেষ করে আমার দুই ছোট বোন ছিল আমার জীবনের খেলার সাথী।

ক্রিকেট খেলার প্রতি আমার আগ্রহ শুরু হয় দশ বছর বয়স থেকে। সেই ছোট বয়সে হাতে একটা চাওড়া গোছের শক্ত লাঠি নিয়ে অনেকদিন একা একাই ক্রিকেট ব্যাটের অনুশীলন করেছি। মুখ দিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ করে নিজের ব্যাটিং ভঙ্গিমার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছি।

ব্যাট করতে বরাবরই আমার ভালো লাগতো। বোলিং করার অভ্যাস রপ্ত করেছিলাম অনেক পরে। স্কুলের মাঠে কতদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড়দের খেলা দেখতাম। ভাবতাম—হায় রে আমি কবে বড় হয়ে ওদের মতো ক্রিকেট খেলবো।

ক্রিকেটের প্রতি একাগ্র বাসনাই আমাকে সত্যিকার ক্রিকেটার হতে সাহায্য করেছে একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না।

কেবল একাগ্র বাসনাই ছিল আমার মূলধন।

আমার ছোটখাটো চেহারাটার জন্য আমাকে কম ঝক্কি পোয়াতে হয় নি। একবার একজন বন্ধুস্থানীয় দাদা আমার ক্রিকেট খেলার মানসিক বাসনার কথা জেনে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "দূর বোকা, তুই ক্রিকেট খেলবি কি করে। তোর মতো ওই রকম বেঁটে আর রোগাটে চেহারা নিয়ে কি ক্রিকেট খেলা হয়। ক্রিকেট খেলতে হলে

ভাল শরীর ও স্বাস্থ্যের দরকার হয়। তোর চাইতে তোর ব্যাটের উচ্চতা ও ওজন তো অনেক বেশী—সামলাবি কি করে ?"

কথাগুলো সে আমাকে হাল্কা সুরে ঠাট্টার মেজাজে বললেও, আমার বুকের ভিতরে খোদাই হয়ে গিয়েছিল। বারবার মনে হয়েছে—সত্যি কি তাই ? আমার মতো শরীর নিয়ে ক্রিকেট খেলা যায় না।

পরক্ষণে কে যেন আমাকে শক্তি যুগিয়ে বলেছে—ভিশ নিজেকে বিশ্বাস কর। নিজের বিশ্বাসকে নিজের মন দিয়ে আঁকড়ে ধর। শারীরিক অক্ষমতা বা ক্ষমতাই মানসিক ইচ্ছা প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়—এর জন্য প্রায়াজন হলো নিজের মনের বিশ্বাসী একাগ্রতা। যদি তোমার একাগ্র সাধনা থাকে তাহলেই তুমি একদিন না একদিন বড় হতে পারবে। কেউ তোমায় দমিয়ে রাখতে পারবে না। নতুন এক বাসনায় কে যেন আমাকে উজ্জীবিত করলো। আমি শুরু করলাম আমার নির্জন ক্রিকেট সাধনা। নিজেকে নিজে প্রায়ই বলতাম ঃ ভিশ ক্রিকেটার তোমাকে হতেই হবে। মস্ত ক্রিকেটার। তোমার সামনে ব্যাট হাতে কে দাঁড়িয়ে আছেন দেখতে পাচ্ছ ? কে তোমার আদর্শ পুরুষ—তুমি তাকে মনে মনে আরাধনা কর। তার মতো হওয়ার চেষ্টা কর।

একলব্য নির্জনে বসে কেবল অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের অবয়ব চিন্তার মাধ্যমে নিজেকে শক্তিমান করে তুলেছিলেন—যার সাক্ষাৎ পরিচয়ে পরবর্তী পর্যায়ে স্বয়ং গুরু দ্রোণাচার্যও বিস্মিত হয়েছিলেন—অতএব মানস কল্পনায় গুরু-মূর্তি প্রদর্শিত হলে, বাস্তব প্রতিফলনে গুরুর প্রয়োজন কিসের ? সাধনাই ধন—সাধনাই শিল্পের বিকাশ—শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব, সেই শুরু হয়েছিল বিশ্বনাথের ক্রিকেট জীবনের নির্জন সাধনা। একলব্যের মতো সেদিন বিশ্বনাথের মানস হৃদয়ে ফুটে উঠেছিল এক মূর্তি !

বাঁহাতি ব্যাটধারী। হাতে আছে চোস্ত মার। অথচ কি নিরহংকার ব্যক্তিত্ব !

আমি ওঁর মতো হবো, ঠিক ওঁর মতো—উনিই তো আমার মানস প্রেমিক। বুকে নিভৃত গভীরে, সেই প্রথম সংগোপনে বেজেছিল সাধনার মন্ত্র—বেজে উঠেছিল সুর। আমায় দেখ—আমায় অনুকরণ কর। রক্তের গভীরে তরঙ্গিত সেই নাম মন্ত্র বুকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের নির্জন শিল্পী সাধক শুরু করলেন একাগ্র সাধনা।

আমার জীবনের প্রিয় খেলোয়াড় কে জানেন? জানেন কাকে আমি আমার হৃদয় মন্দিরে স্থাপন করে ভজনা করেছি? যাঁকে আমি অনুসরণ করতে চেয়েছি বরাবর? আমার বিকাশে যাঁর প্রকাশ ঘটছে? তিনি হলেন আমার 'ক্রিকেটীয় সাধনার মন্ত্রগুরু—চল্লিশ পঞ্চাশ দশকের শ্রেষ্ঠ অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার নীল হার্ভে।

যার প্রতিভা আছে, তার প্রকাশ ঘটবেই এর জন্য গুরুমশাইয়ের পাণ্ডিত্য বা তার সাহচর্য পাওয়ার প্রয়োজন হয় না—প্রয়োজন যেটুকু তা হলো নিজেকে সাধনপথে ঠিক মতো ধরে রাখা। মনের মধ্যে তাই গুরুর মন্ত্র নিয়েই সাধকেরা আপন বিশ্বাসে পথ চলতে পারেন। যে পথ চলায় একাগ্রতা থাকে, যে পথ চলায় স্বতস্ফুর্ত আন্তরিকতা থাকে, বিশ্বাস থাকে—সে পথ পথিককে আপনি পথনির্দেশ দিয়ে দেয়। তবে হ্যাঁ—মনের মধ্যে শিকড় আঁকড়ে রাখার জন্য যে বিশ্বাসী সাধনার প্রয়োজন, সেই সাধন সত্বাকে জাগ্রত রাখার প্রয়োজনীয়তায় একজন আত্মিক শাসকের প্রয়োজন—এই আত্মিক শাসকই হলেন আমাদের মতো সাধারণের চোখে গুরু, যিনি সাধককে ভক্তিমার্গের বীজমন্ত্র দান করেন।

ভিশের জীবনে একাগ্রতাই ছিল তাঁর সাধনা, নিজেকে ক্রিকেটার তৈরী করার সংকল্পে তিনি আত্মদান করেছেন সার্বিক ইচ্ছাশক্তিকে।

ভীষ্মের পণ—এই পণ রাখতে নিজেকে কোনদিনের জন্য কোন মায়ার বন্ধনে তিনি জড়াতে প্রশ্রয় দেননি। ওই এক প্রতিজ্ঞা দিবা-রাত্রি তাঁর হৃদয়কে ঘুণ পোকার মতো কুরে কুরে খেয়েছে। আমার

এই ঈশ্বর প্রদত্ত পাঁচ ফুট উচ্চতা শরীরটাকে নিয়ে প্রমাণ করে দিতে হবে আমি একজন মস্ত ক্রিকেটার হয়েছি। যারা আমাকে একদিন ঠাট্টা করেছিল—তাদের সেই ঠাট্টার এটাই হবে যোগ্য জবাব।

সত্যি বলতে কি আজ আমি তৃপ্ত। আরো তৃপ্তি পাই যখন সাংবাদিকদের চোস্ত, পরশ্রীকাতর কলমগুলো থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে আমার নামের ডগায় একেকটা গালভরা বিশেষণ। 'লিট্‌ল মাস্টার' কত কি। তবে কি জানেন, আমি কিন্তু এখনো পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাইনি। এখনও আমি অসম্পূর্ণ। আজো অনেক দায়িত্বপূর্ণ বড় ইনিংস খেলার পর আমার মনে হয় আমি তো কিছুই করতে পারি-নি—আমি যে এর চাইতেও আরো অনেক বড় দায়িত্বপূর্ণ খেলা খেলতে চাই।

আমার ক্রিকেট জীবন শুরু ১৯৬০ সাল থেকে। আমি এলাম বাঙ্গালোরের ফোর্ট হাই স্কুলে। এই স্কুলে এসেই আমার ক্রিকেটের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গেল দ্বিগুণ। এই স্কুলে এসেই আমি খুব তাড়া-তাড়ি কয়েকটি বড়সড় খেলায় জায়গা পাই। এর আগে আর একটা কথা পাঠকদের জানিয়ে দিতে চাই—আমি তখন মহীশূর স্কুলের ছাত্র। সবে বড় খেলার জন্য স্কুল ট্রায়ালে নাম দিয়েছি। এই ট্রায়াল ম্যাচে আমি আমার সাধ্যমতো ব্যাট করলাম, বোলিংও করলাম ভাল। সবাই ভেবেছিল আমি নির্ঘাত নির্বাচিত হব। এই বিশ্বাস আমারও ছিল। অথচ আশ্চর্য—যখন দলের বাছাই খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হলো তখন দেখলাম আমার নামটা বাদ পড়ে গেছে। অবাক যে হইনি তা নয়। খুব অবাক হয়েছিলাম। পরে শুনলাম স্কুল-কর্তৃপক্ষ আমার শারীরিক গঠনের কথা চিন্তা করেই তাঁরা আমাকে দল থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

আবার একটা আঘাত পেলাম। সে আঘাত আমাকে সইতে হলো। আঘাত ছাড়া নিজেকে তো চেনা যায় না—তাই সেই আঘাতের কথা মনে করে আজ আর দুঃখ পাই না, বরং মনে হয়

তারা আমায় আঘাত দিয়ে ভালই করেছিলেন, এই আঘাত আমাকে আমার নিজের কাছে চিনিয়ে দিয়েছে। মনের গোঁ আরো বেড়ে গিয়েছিল—হয়ত তারই ফলে অচিরে এলো আমার সাফল্য। বাঙ্গালোর ফোর্ট স্কুলে থাকাকালীন আমার ডাক এলো বড় আসরে খেলার। এখানকার সিটি একাদশের হয়ে নেতৃত্ব করার সুযোগ পেলাম মহীশূরের রাজ্য পর্যায়ের পেণ্টাম্বুলার প্রতিযোগিতায়।

সবচেয়ে আশ্চর্য—এই আসরে আমি ব্যাটসম্যান হিসাবে খুব একটা সফল হতে না পারলেও বোলার হিসাবে দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলাম সকলের। এই আসরে আমি সর্বসাকুল্যে উইকেট পেলাম ১২৫টি।

সেই শুরু হয়ে গেল ক্রিকেট আসরে আমার আনাগোনা। তবু প্রতি মুহূর্তে সংশয়। মনের কোণে লাগে দোলা। শুধু বোলার হিসাবে সাফল্য দেখিয়ে আমার কি হবে—আমি তো চাই একজন ব্যাটসম্যান হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে। নতুন করে আবার শুরু করে দিলাম অনুশীলন। দিন নেই, রাত নেই আমার ভিতরের তাগিদ আমাকে তাড়না করতে লাগলো। মনের এই আত্মজ তাগিদ যতই বাড়ছিল, ততই কঠিন হয়ে বসেছিল আমার বিশ্বাসবোধ—একজন নামী ব্যাটসম্যান আমাকে হতেই হবে।

ক্রিকেট আমায় অনেক দিয়েছে। দিয়েছে প্রতিষ্ঠা, সম্মান, তৃপ্তি। ক্রিকেটের ঋণ শোধ করার মতো কোন ক্ষমতা আমার নেই, তবু প্রাণপণ চেষ্টা করি।

সময়ের হিসাব-নিকাশ করে, রানের দুর্লভ কীর্তি গড়ার দিকে না তাকিয়ে, বিশ্বনাথ নিজের খেলাই খেলার চেষ্টা করেন সব সময়। তাঁর ক্রিকেটের সঙ্গে অদৃশ্য নিয়মে মেশামিশি হয়ে আছে এক শিল্পসত্তা। তাঁর ব্যাটের মনোরম স্নিগ্ধতায় গোটা মাঠ ভরে ওঠে। রূপলাবণ্য, রাজসিকতার রমণীয় বিন্যাসে বিশ্বনাথ যে সকলের চাইতে

অনেক আলাদা, তাঁর সুষমা স্নিগ্ধ ব্যাটিংয়ের অনাবীল ভঙ্গিমায় শিল্প-স্বকীয়তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বহুবার।

সময়কে হিসাব করে, রানের দিকে নজর রেখে ব্যাটিং করার মধ্যে যে স্থূল যন্ত্রিকতা আছে, তা মনে হয় এই খুদে শিল্পীটির কাছে অজানা নয়। তাই তিনি সময়ের দিকে না তাকিয়ে, নিজের পূর্বতন নজির ভাণ্ডার প্রতি সচেষ্ট না হয়ে নিজের আভিজাত্যের মধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন সব সময়। অনুকূল পরিবেশের মধ্যে ক্ষত্রিয় এই শিল্পী তাঁর চারিত্রিক শিল্পসত্তাকে বড়সড় রান গড়ার প্রলোভনের মধ্যে কোন কালেই প্রশ্রয় দিতে আগ্রহী হননি। বরং প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে যখন সমস্যা হয়ে উঠেছে জটিল, দলের সফলতর সহকারীরা ব্যর্থ হতে শুরু করেছেন—ঠিক তখনই তিনি নিজের ঐশ্বর্যের বিস্তার ঘটিয়ে "রণংদেহি" মূর্তিতে নিজেকে সাগ্রহে প্রকাশ করেছেন। এর প্রমাণ একবার নয়, বহুবার—বহুবার দিয়েছেন বিশ্বনাথ। স্বকীয় ভঙ্গিতে জটিল সমস্যাকে সামনে রেখে তিনি উদ্ধত ভঙ্গিমায় বিকশিত করেছেন নিজের স্বাতন্ত্র্য রাজসিকতা। প্রখর অনুভূতশীল বিশ্বনাথের অনুপম ব্যাটের পরশে দর্শককুল হয়েছেন রোমাঞ্চিত। তাঁর নিখুঁত হৃদয়হরণকারী স্ট্রোক দর্শকদের মোহিত করেছে। শিল্পীর মানসিকতায় গড়া বিশ্বনাথের ব্যাটিং দেখতে দেখতে তাই হয়ত মনে পড়ে যায় নন্দলাল বসুর রেখাচিত্রময় অ্যালবামের কথা। সময় বা রানের হিসাব-নিকাশ করার মতো অবসর তখন একবারের জন্যও মনে আসে না। দর্শক মাত্রই তখন দেখতে পান সরু তারের ওপর বিচরণ মন্ত্র নিয়ে এক দাম্ভিক শিল্পী উদার মানসিকতায় আপন মাধুর্যকে দু'হাতে বিলিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছেন মহাপ্রস্থানের পথে। কি তার রূপ, কি তার ঐশ্বর্য, কি তার দক্ষতা, কি তার মাধুর্য, সুষমা। তাই সত্যিকার যাঁরা ক্রিকেটের জাত বিচারক—তাঁরা বড় রানের গরিমার মধ্যে নিখুঁত শিল্পীকে খোঁজার চেষ্টা করেন না। চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব উত্তরণ করে চিত্ত যেখানে স্থির ধ্রুবতারার মতো নিশ্চল

হয়ে যায়, দেবাত্ম আরাধনায় তখনই সেই শুচিশুভ্রতার মধ্যে দর্শন মেলে তাঁর—তিনি সে ক্রিকেটের সেই একজন, যাঁর পরশ মাধুর্য অনুভবে দর্শকদের হৃদয়তন্ত্রীতে বাজে বাউলের একতারার মন-মাতানো হৃদয় আর্তি—"আমি কোথায় পাব তারে—"

আমার ক্রিকেট জীবনের সত্যিকার সময় ১৯৬৭ সাল। স্বপ্নেও ভাবিনি আমাকে কোনদিন রাজ্য দলে বড় প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণের জন্য এত তাড়াতাড়ি ডাকা হবে। ডাক এলো প্রথম রণজি ট্রফি খেলার জন্য ১৯৬৭ সালে। শুরু মুহূর্তে সর্বাগ্রে নিজেকে প্রশ্ন করলাম—ভিশ তুমি কি পারবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে? তোমার সামনে দিগন্তবিস্তৃত সুখস্বপ্নের ভবিষ্যৎ—যদি পার তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছতে দেরী হবে না, নচেৎ তোমায় পিছিয়ে যেতে হবে অনেকখানি। আবার নতুন করে তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে।

নিজের প্রশ্নে নিজেকে বিশ্লেষণ করেছি। শেষ অবধি নিজেইআবার নিজের কাছে উত্তর দিয়ে বলেছি—পারবে, নিশ্চয়ই পারবে—পারবে বলেই তো এতকাল সাধনা করছ। সাধনার ধন বিফল হয় না। কেবল বিশ্বাস রাখ—নিজের ওপর নিজের বিশ্বাস! এই বিশ্বাসবোধ মানুষকে হারায়, জেতায়।

দলে আমি জায়গা পেলাম।

মিথ্যে বলবো না প্রথম খেলতে নেমে, বড় আসরে নিজেকে আমার প্রতিষ্ঠা করতে দেরী হলো না। শুরু মুহূর্তে বড়সড় একটা রানভরা ইনিংস খেললাম অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে। আমার বিরুদ্ধে সেদিন সাত সাতজন বোলারকে কাজে লাগিয়েও কোন সুবিধে করতে পারেনি অন্ধ্র দল। ২৩০ রাণের এই ইনিংসটি আমার জীবনের একটা বড় রান।

রণজি ট্রফিতে বছর দুয়েক ভাল খেলার পর আমার ডাক এসেছিল নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় বোর্ড সভাপতি একাদশের হয়ে খেলার। সেই খেলায় সাধ্যমতো ভাল খেলার চেষ্টা করেছিলাম।

এরপর হঠাৎ করেই আমার জীবনে এলো সেই অমোঘ মুহূর্ত। ১৯৬৯ সাল। রেডিও মারফতে শুনলাম ভারতীয় দলে আমার নাম। কানপুরের ম্যাচে আমি খেলছি।

সেই ক্রিকেট জীবন শুরু—সেই হলো বিশ্বনাথ থেকে আন্তর্জাতিক মহলে ভিশ নামের পরিচয়। এখন যদি প্রশ্ন করা যায়, ভিশ তোমার জীবনের সেরা খেলা কোন্‌টি—সে উত্তর দেওয়া হয়ত তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। সত্যি তো একজন সাধক শিল্পীর পক্ষে কি নিজের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা সম্ভব ? না—কোনদিনই কোন শিল্পী নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে বিচার করতে পারেন না। শিল্পীর মধ্যে শিল্প বিচারের স্থূলতা অনুপ্রবেশ মানেই শিল্পসত্তার মৃত্যু। অতৃপ্ততার আকর্ষণই তাই যত তীব্র হয়, তাতেই প্রকাশ ঘটে শিল্পীমনের। সৃষ্টির জন্য শিল্পীমনের আন্তরিক বেদনা থাকলেও, বিচারের অধিকার তাঁর নেই। বিচারশক্তিকে কাজে লাগিয়ে শিল্পের সাধনা তাই সম্ভব হয়নি কোনকালে, আর সেই কারণেই ভারতীয় ক্রিকেটের এই শাশ্বত শিল্পীর পক্ষে বলা সম্ভব হয় না কোন্‌টি আমার সেরা খেলা।

ওহে দর্শককুল, তোমরা তো তাকে দেখছ। বিচারের চাতুর্য, গুণপনার বিশ্লেষণ ক্ষমতা তো তোমাদের আছে—তোমরাই বল না ভিশের কোন ইনিংসটি সেরা।

কঠিন প্রশ্ন-উত্তর মেলে না। কি করে এই প্রশ্নের সহজ উত্তর দেওয়া যাবে। একজন ধ্রুপদী শিল্পীর শিল্পশৈলীর মাধুর্য কি এত সহজে বিচার করা যায়! যত দেখি, তত ভাবি—যত ভাবি—ততই সে তলিয়ে যায় অরূপের রূপসাগরে। রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে অনুভবে—ভারতীয় ক্রিকেটে ভিশ একক। তাঁর তুলনা একমাত্র তাঁর সঙ্গেই করা যায়। রানের মোহ, সময়ের হিসাবে, দর্শনীয় গরিমা, প্রতিষ্ঠার মায়া—কিছুই যে তাঁর মধ্যে নেই। তাঁর হাতের একতারায় বাজে বৈরাগ্য রাগিণী। পতনের ভয় নেই, পরাজয়ের

গ্লানি নেই, ব্যর্থতার দুঃখ নেই, প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা নেই—এই রূপই শাশ্বত ভারতের বৈরাগ্য সাধনের রূপ। এই রূপকে তাই বিচার না করাই ভাল। কেবল অনাবিল হৃদয়-উচ্ছ্বাসে বৈরাগ্যসাধকের দিকে তাকিয়ে বলা যায়ঃ যা অন্য কেউ করতে পারে না, তাই সে সহজ সাধনসিদ্ধ ভঙ্গিমায় অতি সহজে করে ফেলে, এখানেই সে অন্যের চাইতে তফাত। অনেক আলাদা।

তাই বলিঃ ভারতীয় ক্রিকেটে ভিশ একজন সেই জাতের ব্যাট-ধারী, যার ব্যাট থেকে অনাবিল সহজ সরল হৃদয় তাগিদায় নির্গত হয় রমনীয় ক্রিকেটের দুর্লভ স্ট্রোকগুলি। যে স্ট্রোক করতে, দশজন ব্যাটধারী কল্পনার ভাবজগতে বিচরণ করেন, বুকের সাহসে কুলোয় না—সেই স্ট্রোকই তাঁর ব্যাট থেকে অবিরত ধারায় অতি সহজে নির্গত হয়—তাই ভিশ নিজেই নিজের রূপে শ্রেষ্ঠ, নিজের অহংকারে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর অনবদ্য কব্যিক ব্যাটিং প্রতিভা সম্পর্কে একদা ভারতীয় ক্রিকেটের বরপুত্র সানি বলেছিলেন—"ভিশ যখন ব্যাট করে আমি দু চোখ ভরে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। ওর ব্যাটিংয়ের কোন মুহূর্তকে আমি হারাতে চাই না। ওকে যত দেখছি ততই বিস্মিত হচ্ছি—ও নিজে জানে না, ও কতবড় ক্রিকেটার।"

বিশ্বনাথকে জানার পক্ষে সানির এই উক্তি মনে হয় যথেষ্ট। ভারতীয় ক্রিকেটে বিশ্বনাথের প্রয়োজন প্রকৃতভাবে প্রথম বোঝা যায় ১৯৭৪-৭৫ সালের মরশুমে। অনন্যসাধারণ এক ক্রিকেটারের পরিচয় দিলেন বিশ্বনাথ লয়েড দলের বিরুদ্ধে—সেই তিনি প্রতিষ্ঠা পেলেন একজন সত্যিকার ত্রাণকর্তার ভূমিকায়!

বিশ্বনাথ প্রসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশী সোচ্চার ছিলেন পাতাউদী। এবং তারও বহু আগে যিনি ভিশের মধ্যে প্রথম খুঁজে পেয়েছিলেন জাত শিল্পীর অভিজাত সৃজনক্ষমতা—তিনি হলেন দক্ষিণ ভারতীয় ক্রিকেটের একজন আন্তরিক মানুষ—সুব্রামানিয়াম।

সুব্রামানিয়ামের নাম হয়ত ক্রিকেটের রেকর্ড বইয়ের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। হয়ত তিনি আলোচিত হবেন না কোন-দিন একজন উচ্চশ্রেণীর ক্রিকেটার হিসাবে—তবে তিনি তাঁর অভূত-পূর্ব সুদূরদৃষ্টিসম্পন্ন হৃদয়বোধের জন্য চিরকাল বেঁচে থাকবেন ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে। আর কেনই বা বেঁচে থাকবেন না, তার অবদান কি কম—নিজে একজন মস্ত ক্রিকেটার না হলেও, বহু মস্ত ক্রিকেটারকে তো তিনি উপহার দিয়েছেন। তাঁর উপহারের অন্যতম ফসল প্রসন্ন, চন্দ্রশেখর, পরে বিশ্বনাথ। এই সুব্রামা-নিয়ামের আন্তরিক প্রচেষ্টায়, তাঁরই হাত ধরে তাঁরা পেয়েছিলেন বড় খেলায় আত্মপ্রকাশের সুযোগ।

সাধারণ একটা ক্লাব ম্যাচে এই সুব্রামানিয়াম বিশ্বনাথকে ব্যাট হাতে প্রথম দেখেই টের পেয়েছিলেন তাঁর শিল্পসম্মত সৃজন শক্তির। তাই ম্যাচ শেষে সেই সন্ধ্যায় সুব্রামানিয়াম নিজের মনের কথা প্রকাশ করেছিলেন প্রসন্নর কাছে।

জান প্র্যাস, আজ একজন জাত ব্যাটসম্যানের খোঁজ পেয়েছি। কি চোস্ত মার আছে ওই ছোট্ট ছেলেটার হাতে, চোখে না দেখলে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। আমার মনে হয় ওই ছোট্ট ছেলেটাকে ঠিকমতো ধরতে পারলে, ও অনেক বড় হতে পারবে।

শুধু মুখের কথাই নয়, কাজও করেছিলেন সুব্রামানিয়াম সাধ্যমতো—অচিরেই এই মানুষটির হাত ধরে মহীশূরের পরবর্তী রনজি ট্রফির খেলায় আত্মপ্রকাশ ঘটলো ভিশের।

*　　　*　　　*

প্রাথমিক পর্যায়ে ভিশের একটি চমৎকার খেলা ছিল হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে ভিশ বড়সড় রান করতে না পারলেও তাঁর চোস্ত রাজসিক ক্রিকেট দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন পাতাউদী ও জয়সিমা। বারবার তাঁরা হাততালি দিয়ে তারিফ করেছিলেন খুদে ছেলেটিকে। পরে ম্যাচ শেষে মুগ্ধ পাতাউদী সুব্রামানিয়ামকে বলে-

ছিলেন—সাবু, এমন একটা ভাল খেলোয়াড় যোগাড় করলে কোথা থেকে—ওর মধ্যে সম্ভাবনা আছে অনেক।

সেই পাতাউদীর মনে গভীরভাবে দাগ টেনে গেলেন ভিশ। পরের বছর ১৯৬৮-৬৯ সালে ইস্ট ও নর্থ জোনের খেলায় বিশ্বনাথকে আবার দেখা গেল মনমাতানো ভূমিকায়। সেই পাতাউদী সোচ্চার হলেন ভিশ প্রসঙ্গে। এরপর পাতাউদীর সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন চান্দু বোরদে। বোর্ড সভাপতি দলের হয়ে নিউজিল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে অধিনায়ক বোরদের সঙ্গে জুটিতে খেলে ভিশ মন মাতিয়েছিলেন সকলের। এই ম্যাচের পরই বোরদে বিশ্বনাথের তারিফ করে বললেন ঃ "ছেলেটির মধ্যে সৃজনশক্তি ভরপুর। ভবিষ্যতে দেশ ওর প্রতিভায় উপকৃত হবে। ভিশের ক্রীড়াশৈলী ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা!"

পাতাউদী বা বোরদের কথাগুলো যে শুধুমাত্র সাময়িক ভাবোচ্ছাসের উক্তি ছিল না তার স্পর্ধিত প্রমাণ কানপুরে ভিশের অনবদ্য ১৩৭ রাণের মধ্যে।

ভিশ নিজেই নিজের ঐশ্বর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রমাণ দিয়েছেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি সৃজন শিল্প প্রতিভায় অন্য সকলের চেয়ে অনেক আলাদা।

ভারতীয় ক্রিকেটের মুক্তধারা

১৯৭১!

ভারতীয় দল চললো ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে। এই সফর সব দিক দিয়ে ছিল ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই সফরে দলের নেতা নির্বাচিত হলেন নবাব পাতাউদীর পরিবর্তে বোম্বাইয়ের অধিনায়ক অজিত

ওয়াদেকার। শুধু তাই নয় এই দলে যেমন নেওয়া হলো বিশ্বনাথ, অশোক মানকাদ, সুনীল গাভাসকর, জয়ন্তী লালের মতো তরুণ খেলোয়াড়দের তেমনি দলে নির্বাচিত হলেন অভিজ্ঞ জয়সীমা, দুরানী ও সারদেশাই।

এই সফরে ভারত তার ক্রিকেটীয় প্রতিভার চরম দ্যুতি প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত করলো না। সফরের গোড়াতেই হাঁটুর ব্যথায় বেশ কিছুটা পিছিয়ে গেলেন ভিশ। তাঁর এই পিছিয়ে যাওয়া সৌভাগ্য এনে দিয়েছিল অভিজ্ঞ সারদেশাইকে। প্রথম টেস্টে সারদেশাই ২১২ রান করে প্রমাণ দিলেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। একমাত্র তিনি ও সোলকার ছাড়া কেউই ধোপে টিকলেন না। এই ম্যাচে বিশ্বনাথ ছিলেন অনুপস্থিত। খেলার ফলাফল অমীমাংসিত রেখেই দ্বিতীয় টেস্টের আসর বসলো ৬ই মার্চ তারিখে।

ভারতীয় ক্রিকেটের লাল হরফের দিন।

ভারত এই ম্যাচে অসাধ্য সাধন করলো। বর্ষিয়ান অভিজ্ঞ সোবার্স-এর দলকে ভারত হারালো কুইন্স পার্ক ওভালে সাত উইকেটে। এই ম্যাচে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটলো সানির। জয়ন্তী লালের পরিবর্তে সানিকে দেওয়া হলো জায়গা। চমৎকার ইনিংস খেললেন সানি। উভয় ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে নির্গত হলো রাজসিক রানদীপ্তি। ৬৫ ও ৬৭ নট আউট থেকে সানি প্রমাণ দিলেন নিজের অস্তিত্ব। শুধু কি তাই, এই ম্যাচে অভিজ্ঞ সারদেশাই আবার করলেন সেনচুরি। ১১২ রানের একটি মনোরম ইনিংস গড়লেন তিনি সেই সোলকারকে সঙ্গী করে। এই ম্যাচ জেতার পিছনে গাভাসকার, সারদেশাই ও সোলকারের ভূমিকার মতো আর একটি মানুষের কথা না বললে সত্যের অপলাপ হয়। তিনি হলেন সেলিম দুরানী। লয়েড ও সোবার্সকে মাত্র দু ওভারের ব্যবধানে ছিটকে দিয়ে ভারতের জয়ের পথকে বহুলাংশে সুগম করে দিলেন তিনি। মাত্র ১৭ ওভার বোলিং

করে ২১ রানের বিনিময়ে দুরানী দখল করলেন মূল্যবান দুটি উইকেট। একমাত্র ডেভিস ছাড়া ক্যারিবিয়ান ক্ল্যাল্লিসোর ছেঁড়া তারে কেউ আর স্বর তুলতে পারলেন না।

এই ঐতিহাসিক ম্যাচের সাক্ষী সেদিন বিশ্বনাথ ছিলেন না। ভিশকে এই মরশুমে প্রথম দেখা গেল জর্জটাউনের তৃতীয় টেস্টে। এই ম্যাচের ফলাফল ছিল অমীমাংসিত। ভারতীয় দল এই ইনিংসে ভালই খেললেন। দলের গোড়াপত্তন করলেন অশোক মানকাদ ও সানি। মানকাদ করলেন ৪২ রান, এই সঙ্গে সানির ব্যাট থেকে বেরিয়ে এলো ১১৬ রাণের একটি উত্তপ্ত ইনিংস। ভিশ প্রথম ম্যাচে আত্মপ্রকাশ করে ভালই খেললেন। তাঁর শিল্পসুষমাবিজড়িত ব্যাট থেকে প্রকাশিত হলো একটি অর্ধশত রান। চতুর্থ ও পঞ্চমের ফলাফলও হলো অমীমাংসিত। সত্যি বলতে কি এই সফরে সানি যতটা সফল হয়েছিলেন, সে তুলনায় বিশ্বনাথ কিছুই করতে পারেননি। মোট তিনটি টেস্টের পাঁচটি ইনিংসে একটি অর্ধশত রান সহ তাঁর মোট রান এলো ১৩৫, যার গড় ছিল ২৭·০০। এই তুলনায় সানির গড় ছিল ১৫৪·৮০ রান!

ক্যারিবিয়ানদের হারিয়ে এই মরশুমে অজিত ওয়াদেকার ফিরে এলেন রাবার জয় করে। এই প্রথম ভারত রাবার জয়ের গৌরব অর্জন করলো।

ওয়াদেকারের ভাগ্যপ্রসাদগুণ দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত হলো ইংল্যাণ্ড সফরে। এই মরশুমে দল থেকে বাদ পড়লেন অনেকে। দুরানী, জয়ন্তী লাল, জয়সীমাকে বদল করে নেওয়া হলো বাতিল হওয়া চন্দ্রশেখর ও আবিদ আলীকে। এই ইংল্যাণ্ড সফর ভারতীয় ক্রিকেটের গৌরবকে এগিয়ে দিল আরো একটা ধাপ। এই মরশুমে ভারত জয়লাভ করলো ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। একটি মাত্র জয়ের সুবাদে ভারত জিতলো রাবার। জয় আর জয়—নতুন সূর্যের উদয় ভারতীয় ক্রিকেট

ভূমিকে করে তুললো আলোকিত। এই সফরে ভিশ কি করলেন এই কথাই পাঠকদের জানতে ইচ্ছে করছে নিশ্চয়ই।

একটা কথা পরিষ্কার এই মরশুমেও বিশ্বনাথ পুরোপুরি সুস্থ বোধ করলেন না। ইংল্যাণ্ডের কড়া ঠাণ্ডায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারলেন না ভিশ। একমাত্র প্রথম ম্যাচটি ছাড়া ভিশের ব্যাটিং গরিমার শাশ্বত শিল্পসত্তার কোন প্রকাশ ঘটলো না গোটা মরশুমে। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানিয়ে রাখি, ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ায় সানিও সুবিধে করতে পারেননি।

* * *

প্রথম টেস্টের ফলাফল হলো অমীমাংসিত। এই ম্যাচে ভারতীয়দের পক্ষে বিশ্বনাথের ৬৮ ও ওয়াদেকারের ৮৫ রাণ ছাড়া আর কোন বড়সড় রান করতে পারলেন না কেউই। ষষ্ঠ উইকেটে ভিশ-ওয়াদেকারের জুটি ১৭৫ থেকে টেনে নিয়ে গেল ২৬৭ রান। অনবদ্য ব্যাট করলেন ভিশ। তাঁর নিরহংকারিত ব্যাটের দাপটে বৃটিশ কলম-বাজের দল মুগ্ধচিত্তে হাত খুলে প্রশংসা করলেন। এই খুদে ছোকরাটির মধ্যে হবসের সুষমা, কম্পটনের লালিত্য, উলির ধ্রুপদী-শিল্পসত্বার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

ভিশের সেদিনের ইনিংস ছিল সম্পূর্ণ ক্লাসিক পর্যায়ের। দান্তে, হোমার, মিলটন সংমিশ্রণ ভাব, ছন্দ শব্দ চয়নের পারিপাট্যে সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল ভিশের এক অমর ক্রিকেট কাব্য। প্রাইস, স্নো, হাটন, গ্রিফোর্ড, ইলিংওয়ার্থ কাউকেই ক্ষমা করেননি ভিশ। উইকেটের চারদিক তাঁর হাতের তানপুরায় মূর্ছিত হয়েছিল সপ্ত সুরের প্রাণ-উচ্ছ্বাস। ছবির মতো একটা নিখুঁত ইনিংস ক্রিকেটের তীর্থভূমি লর্ডসে সৃষ্টি করে ভারতীয় শিল্পী বিদায় নিলেন দাম্ভিক যুগপুরুষের মতো। কম গেলেন না ওয়াদেকার। তাঁর বাঁহাতি ব্যাটের ঝরকায় ছিল প্রাণখোলা হৃদয়ের পাগলপারা হাতছানি।

দ্বিতীয় টেস্টের ভিজে মাঠে ভিশ সুবিধে করতে পারেননি—

এই ম্যাচের ফলও হলো অমীমাংসিত। এরপর শেষ ও তৃতীয় ম্যাচের আসর বসলো ওভালের বুকে।

তুলনাহীন চন্দ্রশেখর আবার নিজেকে তুরুপের তাস হিসাবে প্রমাণ করলেন। অনিশ্চিত ক্রিকেট ভাগ্যকে এক চন্দ্রশেখর আকস্মিক ধাক্কায় নিশ্চিত করে দিলেন ভারতের পক্ষে। মাত্র ১০১ রানে ইংল্যাণ্ডের মতো একটা বনেদি দল এক চন্দ্রশেখরের বোলিংয়ের ধাক্কায় মাথা নোয়াতে বাধ্য হলো। মাত্র ৩৮ রানে ৬টি উইকেট দখল করলেন চন্দ্রশেখর। এই ম্যাচে ভিশ প্রথম ইনিংসে ফিরে এলেন শূন্য হাতে। পরের ইনিংসে করলেন ৩৩টি সুন্দর মূল্যবান রত্নখচিত রান, যার গৌরব রান সংখ্যার ব্যাপক অঙ্কের গুরুত্ব না পেলেও, ঐশ্বর্যের মূল্যায়নে ছিল মূল্যবান। মোট তিনটি টেস্টে ছটি ইনিংস খেলে বিশ্বনাথের সংগ্রহশালায় জমা পড়লো ১২৮ রান, যার গড় ছিল ২৫·৬০।

পর পর দু-দুটি মরশুমে নিজেকে যথার্থভাবে প্রকাশ করতে না পারার যন্ত্রণায় আত্মদহিত হচ্ছিলেন শিল্পী। শুরু হয়েছিল সাংবাদিকদের কানাকানির পর্ব।

নিজেকে আবার পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য সাধক শিল্পী শুরু করলেন নির্জন সাধন। হে ক্রিকেট তুমি আমায় দেখ। আমায় বিশ্বাস দাও—শক্তি দাও—দায়িত্ব গ্রহণের মর্যাদা দাও।

ক্রিকেট শিল্পী ক্রিকেটারের সকরুণ প্রার্থনা পূরণ করলেন। মুখ তুলে তাকালেন। বরাভয়ের মুদ্রায় মৃদু হেসে বললেন: ওহে শিল্পী পুরুষ, আত্মদহনেই পাপ মুক্ত হয়—আমি আছি। তোমার মধ্যেই ঘটবে আমার শক্তির প্রকাশ। তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধ-যাত্রা করতে পার।

সাধক শিল্পী যোদ্ধা ফিরে এলেন। আবার ঘটলো রণক্ষেত্রে অর্জুনের পুনঃপ্রবেশ। দীর্ঘদিন ব্রহ্মচর্য পালনের পর অর্জুন যেন মোহত মুক্ত—আপন চেতন সত্তায় জাগ্রত।

ইংল্যাণ্ড এলো ভারত সফরে। সেটা ছিল ১৯৭২-৭৩ সাল। টনি

লুইসের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড এলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ৭০৩ নম্বর ম্যাচটি খেলতে। দিল্লীতে বসলো প্রথম খেলার আসর।

দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলায় অনুষ্ঠিত হলো ভারত ইংল্যাণ্ডের ১২৫তম টেস্ট ম্যাচ। এই ম্যাচে ইংল্যাণ্ডের নয়া বোলার আর্ণল্ড, কট্টম, গ্রেগ ও আণ্ডারউডের বোলিং এর সামনে ভারতীয় দল দাঁড়াতেই পারলেন না। যে দল গত সিরিজে ক্যারিবিয়ান পেসম্যানদের বিরুদ্ধে রাজসিক খেলার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই দল এই মরশুমের প্রথম খেলায় হালে পানি পেল না। সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ হলো ছুই সম্ভাবনাময় ব্যাটধারী—সানি ও ভিশ। গাভাসকার ছুই ইনিংসে ১২ ও ৮ রান করে ফিরে এলেন। ভিশ করলেন যথাক্রমে ২৭ ও ৩ রান। প্রথম ম্যাচে ভারত হারলো।

দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দল মাত্র ২৮ রানের ব্যবধানে ম্যাচ জিতলেও, সানি বা ভিশ এই টেস্টেও সফল হতে পারলেন না।

বার্থতার পর ব্যর্থতা।

নিজের ব্যর্থতার দিকে তাকিয়ে বারবার থমকে যাচ্ছিলেন ভিশ। তবে কি বড় রান পাওয়া আর সম্ভব হবে না! শেষ অবধি প্রত্যাশা পূরণ হলো চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টে। চতুর্থ টেস্টে সৌভাগ্যময় কানপুরের মাঠে ভিশ আবার খেললেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খেলা। প্রথম ইনিংসে ২৫ রান করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে করলেন ৭৫ রান। তাঁর রাজসিক ব্যাট আবার হয়ে উঠলো স্ফুরিত। শিল্পসুষমায় রঞ্জিত ভিশের গরিমা-দীপ্ত ব্যাট জলুসে কানপুর হয়ে উঠলো পবিত্র। ফুরফুরে এক ঝলক বাতাসের মতো স্নিগ্ধতা বহুদিন বাদে দর্শকেরা আবার অনুভব করলেন কানপুরের দৌলতে। পদ্মপাতায় জলের মতো টলমল করে উঠলো সেদিনের ক্রিকেট। শরতের মেঘ-বৃষ্টি-রোদের সংমিশ্রণে এক অপরূপ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুললেন ক্রিকেটের রূপকার। দীর্ঘ ব্যর্থতার পর আহত সিংহের মতো গর্জে উঠলেন খুদে মানুষটি। স্ফীত কেশরের আস্ফালনে প্রকাশ ঘটলো আত্মাভিমানী এক পুরুষসিংহের আত্মচেতনা।

উইকেটের চারদিকে রূপবান মদন যেন তাঁর রূপবহ্নির প্রহেলিকা ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

নিখুঁত স্কোয়ার কাট।

শক্ত মার—অথচ কি সাবলীল ছিল সেই মার মারার ভঙ্গিমা, এতটুকু ক্লান্তি ছিল না। দ্বিতীয় ইনিংসে জন্মকবির মতো একটি নিখুঁত ছন্দময় কাব্য রচনা করে ভিশ করলেন পঁচাত্তর রান।

পরের ম্যাচ অর্থাৎ শেষ টেস্টে এই অসমাপ্ত ইনিংসের সমাপ্তি ঘটলো। দীর্ঘ ব্যর্থতার পর গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা ক্ষুধার্থ সিংহের মতো তিনি দাপিয়ে পড়লেন বৃটিশ বলরাজদের ওপর। মুহুর্মুহু লাল বলের অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করেও তাঁরা সেদিন পারলেন না একজন ভারতীয় ক্লাসিক শিল্পীর তপভঙ্গ করতে। যোগীপুরুষ তাঁর সাধনলব্ধ সমগ্র ঐশ্বর্য ছড়িয়ে নিজেকে প্রকাশ করলেন সবার ওপরে। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্-এর মন্ত্রে দক্ষিণ ভারতবর্ষের জ্ঞানচেতনা থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে ভিশ ধরলেন দলের হাল। হে ভারত ভুলো না আমাকে। আমি থাকতে তোমার মর্যাদার কোন হানি হবে না। আমি তোমাকে রক্ষা করবো—আমাকে তুমি বিশ্বাস কর—আমি তোমার সেই ত্রাণকর্তা অনিদ্র প্রহরী।

ভিশ সেনচুরি করেলন। দীর্ঘদিন বাদে আবার এলো ভারতীয় ব্যাটধারীদের মধ্যে সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি। ম্যাচের ফলাফল অমীমাংসিত।

এই সফরে ব্যাটিং পর্যায়ে বিশ্বনাথ পেলেন দ্বিতীয় স্থান। ৫টি ম্যাচের দশটি ইনিংসে ব্যাট করে তাঁর এলো সর্বসাকুল্যে ৩৬৫ রান—যার গড় ছিল একটি নটআউট ৪০'৫৫ রান।

এরপর কয়েক মাসও কাটলো না। আবার ইংল্যাণ্ড সফরে দ্বিতীয় বারের মধ্যে যাত্রা শুরু হলো।

ইংল্যাণ্ডে দ্বিতীয় সফর

১৯৭১ সালে ভারতীয় দল ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যে ক্রিকেটের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে ১৯৭৪ সালের ক্রিকেটের কোন মিলই ছিল না। ১৯৭১ সালের সেই দীপ্ততা, মহিমা, গরিমা চলতি মরশুমে ধুলিসাৎ করে ভারত সম্পূর্ণ রিক্ত হাতে ফিরে এলো ইংল্যাণ্ড থেকে। একাত্তরের সংগৃহীত ঐতিহাসিক "রাবার" হলো ভারতের হাতছাড়া—শুধু তাই নয় সেই সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সামগ্রিক ব্যর্থতা উপহাসের উপকরণ হিসাবে পরিগণিত হলো। চলতি মরশুমে তরুণ ক্রিকেটারেরা হলেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। একাত্তরের দল থেকে চুয়াত্তরের দলে বাদ পড়েছিলেন অনেকে। নতুনদের মধ্যে ছিলেন সুধীর নায়েক, গোপাল বসু, ব্রিজেস প্যাটেল ও মদনলাল। ইংল্যাণ্ডের হিমশীতল ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও মেঘলা ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে ভারতীয় দল এই মরশুমে শামুকের মতো গুটিয়ে গিয়েছিল।

ওল্ডট্রাফোর্ডের প্রথম টেস্টে ভারত হারলো ১১৩ রানে। তবু প্রথম ম্যাচে ভারতীয় দল খুব একটা খারাপ ফল দেখালেন না। টসে জেতা ডেনিস প্রথম ব্যাট নিয়ে দেড় দিনে তুললেন ৫২৮ রান। ফ্লেচার করলেন ১২৩ রান। ভারতীদের পক্ষে চমৎকার বোলিং করলেন বেদী ও আবিদ আলী। আবিদ পেলেন ৭৯ রাণে ৩টি উইকেট, বেদী ৮৭ রানে ২টি। ভারতের পক্ষে ব্যাটিং পর্বে দেখা গিয়েছিল শোচনীয় ব্যর্থতা। মাত্র ৩২ রানে তিনটি উইকেট পড়ে গেলে, দলের হাল ধরলেন সানি আর ভিশ। উইকেটের চারপাশে ক্রিকেটের প্রায় সবগুলি কেতাবী মার মেরে উভয় ব্যাটস-ম্যান প্রমাণ দিলেন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব। সানির মধ্যে যেমন ফুটে

উঠেছিল অকৃপণ শক্তির গরিমা, তেমনি ভিশের মধ্যে স্পষ্টত উজ্জ্বল ছিল শিল্পের বিনম্র লাবণ্য। ক্ষণেক বৃষ্টিধারার পর যেমন সূর্যালোকে চারপাশ ঝলমল করে ওঠে, ঠিক তেমনি ঝলমলে হয়ে উঠেছিল ভারতীয় দলের ব্যর্থতা সূচিত ইনিংসটি। উইকেটের চারদিকে ক্রিকেটের দেদার মণিমাণিক্য ছড়িয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের রাজযোগী সন্ন্যাসী শেষ অবধি আত্মদান করলেন। আণ্ডারউডের অফকাটারে আবার একটা স্কোয়ার কাট করতে গিয়ে বোল্ড হলেন ভিশ। প্যাভেলিয়ানে ফেরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় ইনিংস গুটিয়ে গেল অনেকখানি। প্যাটেল, ইঞ্জিনিয়ার, মদনলাল ফিরলেন মাত্র পচিশ রান যোগ করে। শেষ অবধি সানি ও আবিদের প্রচেষ্টায় অষ্টম উইকেটের জুটিতে মানরক্ষা হলো। সানি মারলেন অনবদ্য সেনচুরি। ১০১ রান করে তিনি হলেন রান আউট।

দ্বিতীয় ইনিংসে ওই একই চিত্র—সেই ভিশ আর সানি। চরম বিপর্যয়ের মধ্যে দুই ব্যাটধারী—ভারতবর্ষের মানমর্যাদাকে প্রাণপণ শক্তিতে আগলাবার চেষ্টা করলেন। সানির মুখরিত ব্যাটিং প্রতিভার সঙ্গে ভিশের ধ্রুপদী শিল্পের চাতুর্য বহুকাল মনে রাখবেন বৃটিশ সাংবাদিকের দল।

নেভিল কার্ডাস অনুপস্থিত ছিলেন বলেই এমন একটি ক্রিকেট বর্ণনা থেকে ক্রীড়াসাহিত্য যথার্থ ভাবে বঞ্চিত হয়েছে বলতে হবে। সেদিনের উপস্থিত সাংবাদিকেরা ভিশের লালিত্যময় ব্যাটিংয়ের চেহারা দেখে বিস্ময়ে পুলকিত হয়েছিলেন। আশ্চর্য, এতটুকু শরীরের মধ্যে এত দীপ্তি আছে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ক্রিকেট যে কত নিখুঁত কায়দায় খেলা যায়, তা খুদে ভিশকে দেখলেই বোঝা যায়। ওঁর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় হবসের লাবণ্য, কম্পটনের স্নিগ্ধতা, মুস্তাকের দৌরাত্ম্য, হাজারের সংযম, হাটনের মেজাজ, ডনের গরিমা, উলির সৌন্দর্য।

দিন কয়েকের ব্যবধানে লর্ডসের বুকে বসলো দ্বিতীয় টেস্টের আসর। এই ম্যাচে ভারতকে বৃটিশ ক্রিকেটারেরা দাঁড়াতেই দিলেন না। ভারতীয় বোলারদের বেপরোয়া ভাবে ঠেঙিয়ে ইংল্যাণ্ড গড়লো ৬২৯ রানের ইনিংস। অ্যামিস চমৎকার খেললেন। ভারতের মাটিতে ব্যর্থ হওয়া অ্যামিস করলেন ১৮৮ রান। সঙ্গে মাইক ডেনিস ১১৮ ও গ্রেগ ১০৬ রান। মাত্র ৪ রানের জন্য সেনচুরি থেকে বঞ্চিত হলেন এডরিচ। একমাত্র বেদী ছাড়া আর কোন বোলারই লাইন, লেংথ ঠিক রেখে বল দিতে পারলেন না। যে চন্দ্রশেখর একাত্তরে এই লর্ডসের বুকে ভেল্কি দেখিয়ে বৃটিশদের বিস্মিত চোখজোড়া কপালে আটকে দিয়েছিলেন, সেই তিনি চুয়াত্তরে মারমুখী ব্যাটিংয়ের সামনে হলেন মর্মান্তিক বিধ্বস্ত।

ইংল্যাণ্ডের মস্ত রানের সামনে ভারতীয় দল সূচনা ভালই করেছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার-গাভাসকার জুটিতে রান এসেছিল ১৩১। এরপর সানি আউট হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বিপর্যয়। অল্প রানের ব্যবধানে আউট হলেন প্যাটেল, ওয়াদেকার। ভিশ উইকেটে এসে দাঁড়ালেন। আবার শুরু হলো নতুন করে ব্যাটের সঙ্গে বলের লড়াই।

লাল বল ধেয়ে আসে উদ্ধত ফণা বিস্তারে হলুদ উইকেট লক্ষ্য করে। স্পর্ধিত হাতের ব্যাট সেই উদ্ধত ফণাকে ভেঙে-চূরে দিয়ে নিজের প্রভাবকে চায় প্রতিষ্ঠা করতে। খুদে মানুষটি একাই লড়লেন। হাত খুলে মারতে লাগলেন নির্মমচিত্তে—ক্ষমা নেই, দুশ্চিন্তা নেই, মায়া নেই, মমতা নেই, নেই কোন সংশয়। চমৎকার একটা অর্ধশত রানের নির্মল ইনিংস দেখ দেখ করে বেরিয়ে এলো বিশ্বনাথের সাবলীল ব্যাট থেকে।

তারপরই ঘটলো ছন্দপতন।

ইন্দ্রসভায় মদন হলেন তপোভঙ্গ। রূপমাধুর্যের অবসান ঘটল। আবার সেই আণ্ডারউড—আবার সেই স্কোয়ার কাট! বলটা অসম্ভব

নিচু হয়ে যাওয়ায় দৈববশতঃ ভিশের উইকেটটি নিজের দখলে পেলেন আণ্ডারউড। এরপরেই বিপর্যয়। ৩০২ রানে ইনিংস শেষ।

ভারতকে ফলোঅন দিলেন মাইক ডেনিস। দ্বিতীয় ইনিংসের চিত্র উদ্ঘাটন না করাই ভাল। এক ঘণ্টাও ভারতীয় দল ব্যাট ধরে রাখতে পারলো না। বৃষ্টি-ধোয়া পিচে মাত্র ১৬ ওভারে ক্রিস ওল্ড ও আর্ণল্ড মিলে মুড়িয়ে দিল গোটা ভারতবর্ষকে। মাত্র ৪২ রানে ১৯৫২ সালের ইতিহাসকে পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে গোটা দল নিঃস্ব চেহারায় ফিরে এলো প্যাভেলিয়ানে। মুখ টিপে হাসলেন বৃটিশ কলমবাজের দল। তাঁরা চরম রসিকতায় বললেনঃ "ওহে ভারতবাসী, ব্ল্যাক ইণ্ডিয়ান, তোমাদের ক্রিকেট খেলার শখ কি মিটেছে? যদি না মেটে তো বল, আমরা তোমাদের এখনও আর একটা ইনিংস পুরস্কার দিতে পারি। কোথায় গেল হে তোমাদের সেই তুরুপের তাস—চন্দ্রশেখর।" একাত্তর সালে এই মাঠেই ইংল্যাণ্ড হেরেছিল, সেই পরাজয়ের দংশন যন্ত্রণা তারা ভুলতে পারেনি—এসব হলো সেই হীনমন্যতারই প্রকাশ।

তৃতীয় টেস্টেও ভারত সফল হতে পারেনি। এই ম্যাচেও ভারতকে এক ইনিংস ৭৮ রানে হারতে হয়েছিল। ভিশ এই টেস্টে মাঝারি ক্রিকেট খেললেন। তাঁর ব্যাট থেকে উভয় ইনিংসে যথাক্রমে নির্গত হলো ২৮ ও ২৫ রান। মোট তিনটি টেস্টে ছটি ইনিংস খেলে ভিশ করলেন ২০০ রান, গাভাসকার করলেন ছয় ইনিংসে ২১৭ রান।

চরম ব্যর্থতা আর মানসিক গ্লানি নিয়ে ওয়াদেকার ভারতে ফিরলেন। যে মানুষ একাত্তরে স্বদেশে ফেরার পর সর্বত্র পূজিত হয়েছিলেন, সেই তিনি হলেন এবারের সফর শেষে সর্বাপেক্ষা নিন্দিত ও সমালোচিত। তাঁর বিরুদ্ধে উঠলো অসংখ্য অভিযোগ। বিশেষ করে প্রসন্নকে এই সফরে ঠিকমত ব্যবহার না করার জন্য—প্রসন্ন-বিরোধী মনোভাব যে ওয়াদেকারের মধ্যে ছিল, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি ১৯৭১ সালের মরশুমে।

অভিযোগে অভিযোগে বিধ্বস্ত ওয়াদেকার এই সফর শেষে অবসর গ্রহণ করলেন ক্রিকেট থেকে। ওয়াদেকার দল থেকে সরে যাওয়ার ফলে ভারতীয় ক্রিকেটে সৃষ্টি হলো নতুন এক সংকট পর্ব। কে নেবেন দলের দায়িত্ব। সামনেই ক্যারিবিয়ান সিরিজ। ক্লাইভ লয়েড আসছেন তাঁর দলবল নিয়ে ভারতে। রণভূমি সুসজ্জিত। এমত অবস্থায় কর্তৃপক্ষ আর কোন উপায়ান্তর না পেয়ে বাতিল হয়ে যাওয়া পাতাউদীকে ডাক দিলেন নতুন করে। জাতীয় সংকটে আত্মাভিমান ভুলে পাতাউদী এগিয়ে এলেন দলের দায়িত্ব নিতে।

এই মরশুম ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক বছর। ভেঙে যাওয়া মানসিক দুর্বলতাগ্রস্ত বিচ্ছিন্ন ভারতীয় দলকে সেদিন ঐক্যবদ্ধ করতে পাতাউদীর ভূমিকা ছিল অনন্য। তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় দল আবার নতুন প্রাণশক্তিতে হয়ে উঠলো ভরপুর। পুরনো ব্যর্থতা, গ্লানিকে অতিক্রম করে ভারতীয় ক্রিকেটারেরা মনপ্রাণ ঢেলে এক নব উন্মাদনায় আত্মদান করতে হয়ে উঠলো প্রস্তুত। শুরু হলো ব্যাট-বলের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

এই মরশুম পাতাউদীর ক্রিকেট জীবনের যেমন একটি উল্লেখ-যোগ্য অধ্যায়কে সুচিত করেছে, তেমনি গৌরবান্বিত করেছে খুদে ব্যাটধারী ভিশের চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট জীবনকে।

১৯৭৪-৭৫ সালের ক্রিকেট মরশুম বিশ্বনাথের মরশুম। এই সফরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নতুন আলোকবর্তিকায় আত্মপ্রকাশ হতে দেখলো একজন ভারতীয় খুদে শিল্পীকে।

অমর ইনিংস খেললেন ভিশ।

চোখের ওপর এখন সেই দিনগুলো রঙিন ছবির মতো ফুটে আছে। ভিশের হাতের ব্যাটে প্রতিফলিত হয়েছিল পিকাশোর মোহিনী শিল্পের যাদুস্পর্শ। ভিঞ্চির অমর 'মোনালিসা'র শুচিশুভ্র পবিত্র স্নিগ্ধ হাসির ছায়ায় অমরত্ব পেয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট শিল্পী।

ক্যারিবিয়ানদের লাল বলের অহংকারিত দাপটকে ভূলুণ্ঠিত করে

খুদে বিশ্বনাথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজেকে। তাঁর বৈরাগ্যসাধন মন্ত্রে মুখরিত হয়েছিল ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস। স্বর্গের দেবশিশুর মতো সাধক রূপবান শিল্পী অরূপের রূপসাধনায় আত্মস্থ করেছিলেন সমগ্র দর্শক সত্তাকে।

প্রথম দুটি ম্যাচে ভারত পরাজিত হলো। ভিশ মাঝারি গোছের ইনিংস রচনা করলেন। সুষমাসিদ্ধ এই ইনিংসগুলির মধ্যে শিল্পশৈলীর ক্লাসিকতা থাকলেও পুরোদস্তুর বহিঃপ্রকাশ ছিল না। ভিশকে প্রত্যক্ষ করা গেল ইডেনের তৃতীয় টেস্টে। শিল্পী বিশ্বনাথ রচনা করলেন ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেনের বুকে তাঁর সার্থক শিল্পের এক অমর অভিব্যক্তি। সাধনযন্ত্রের সুরমূর্ছনায় ইডেন হলো রোমাঞ্চিত। আজও বাতাসের বুকে কান পাতলে আমরা শুনতে পাই সেই চেনা সুর। এখনো অনেক পরিপূর্ণ ক্রিকেটের ছায়াময় রূপ অবগাহন করেও নয়নের যেন তৃষ্ণা মেটে না। ঘুরে ফিরে মন চলে যেতে চায় সেই রমণীয় অনবদ্যএকটি কাব্যিক ইনিংসের খোঁজে। এক অনিদ্র প্রহরী তার অনিন্দসুন্দর রূপ পশরা সাজিয়ে স্বপ্নের মধ্যে যেন পথ পরিক্রমা করে চলেছেন। অন্ধকার সর্পিল গহ্বরে প্রবেশ করতে যেখানে শত বাধার প্রাচীর, প্রাণের সংকট, সেই পথেই চলেছেন মশাল হাতে এক বৈরাগী পথিক। পরনে ত্যাগ মন্ত্রের প্রতীক গৌরিক বস্ত্র—হাতে ন্যায়দণ্ড, যাঁর তৃতীয় নয়ন থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলোকবহ্নিবাণ।

ইডেনের সেই অপরূপ সাজে সজ্জিত ক্রিকেটের কথা আগেই বলেছি। শুরু করেছিলাম গ্রন্থের সূচনা, এবার আবার নতুন করে ফিরে আসতে চাই সেই পুরনো পর্বে। ইডেনের বুকে ভিশের রচিত অমর ক্রিকেট-কাব্যের কথায়।

ইডেনে বিশ্বনাথ

২৭শে ডিসেম্বর।

ইডেনে শীতের দুপুরে ভারতীয় ব্যাটধারীদের শোচনীয় ব্যর্থতার মধ্যে একটি মানুষের আন্তরিক স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছিল কলকাতার মানুষ।

টসে জেতা পাতাউদী নতুন সংকল্পে ভারতীয় দলের হয়ে গোড়াপত্তনের দায়িত্ব তুলে দিলেন ইঞ্জিনিয়ার ও সুধীর নায়েকের হাতে। গাভাসকার অসুস্থ—তিনি না খেলায় ভারতীয় ব্যাটিং শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তবে অনেকেই ভরসা রেখেছিলেন নায়েকের ওপর। কিন্তু হায়রে দুর্ভাগ্য—লয়েডের বুদ্ধিখচিত ক্যারিবিয়ান আক্রমণের দৌরাত্ম্য অচিরেই শঙ্কিত করে তুললো ইডেনকে। রবার্টসের প্রথম ওভারের আউটসুইং বলে ব্যাট ছুঁয়ে বিপদ ডেকে আনলেন নায়েক। খানিক বাদে ফিরে গেলেন পার্থসারথি শর্মা। ৩২ রানে আউট হলেন ইঞ্জিনিয়ার। গোটা ইডেনে লাল বলের দুরন্ত দাপট দেখে শিউরে উঠলো। এই প্রতিকূল অবস্থায় বিশ্বনাথ জাগ্রত দেব-পুরুষের মতো নিজের কাঁধে তুলে নিলেন দলের সমস্ত দায়িত্ব। ধীর স্থির ভঙ্গিমায় সময়ের দিকে চোখ না রেখে দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব গরিমায় প্রকাশ করলেন নিজেকে। তাঁর সেদিনের খেলার মধ্যে যেমন ছিল বিশ্বাসী আত্মনির্ভরতা তেমনি ছিল সাধনসিদ্ধ অস্ত্র প্রয়োগের সাবলীল দক্ষতা। চমৎকার ভঙ্গিমায় তরুণ অংশুমানকে পাশে নিয়ে ভিশ দুরন্ত সাগর পাড়ি দেবার সংকল্প নিলেন। দুর্গম গিরি কান্তার মরু পথে সেই শুরু হলো এক দল যোগী শিল্পীর অনন্ত পথ পরিক্রমার পর্ব। হৃদয় অন্বেষণে এ যেন পথ খোঁজা। রবার্টস, জুলিয়েন, হোল্ডার, গিবস, উইলেটকে কাজ লাগিয়েও ক্ষণিকের জন্য

সংশয় সৃষ্টি করতে পারলেন না লয়েড। নির্ভীক যোদ্ধা জয়ের গৌরবদীপ্ততায় তখন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সংকল্পে ব্রতী। উইকেটের চারদিকে সাধনসিদ্ধ ক্রিকেটীয় বান প্রয়োগ করে আপন চলার পথ করে নিতে ভিশ দেরী করলেন না। টুকরো টুকরো একেকটা সুন্দর কেতাবী মার—সেই সঙ্গে সংগৃহীত হতে লাগলো রানের অঙ্ক। স্কোর বুকে রান এলো ৩২ থেকে ৯০ রানে। অংশুমান বেশ খেলছিলেন, শেষ অবধি তিনিও ফিরলেন নিজস্ব ৩৬ রানের মাথায়। আহত পাতাউদী এবার অসমাপ্ত ইনিংস শুরু করলেন পুরোদস্তুর নবাবী চালে। হিংস্র সিংহের মতো স্ফীত কেশর আস্ফালনে ব্যাট হাতে এসে দাঁড়ালেন উইকেটে। আহত হওয়ার আগে যে পাতাউদী কিছুটা স্তিমিত ছিলেন, সেই তিনি হলেন জাগ্রত। জুলিয়েনের বলে চমৎকার স্ট্রোক করলেন। রান বাড়লো। ভিশ পূরণ করলেন পঞ্চাশ রান। শেষ অবধি দলের ১৬৯ রানের মাথায় বিশ্বনাথ গিবসের ফ্লাইটে ভুল করায় আউট হলেন লেগবিফোর উইকেট। এরপর পাতাউদী ও মদনলালের জুটি রান টানতে লাগলেন। টেনে হিঁচড়ে শেষ পর্যন্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটলো ২৩৩ রানের মাথায়। ভারতীয় দলের ইনিংস সমাপ্তি ঘটলো। ভারতীয় ব্যাটধারীদের ব্যর্থতার প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করতে গিয়ে জনপ্রিয় এক ইংরিজি দৈনিক পত্রের পাতায় ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক লালা অমরনাথ লিখলেন—"Viswanath proved his worth by contributing 52 runs, the product of immense confidence,...His square cuts really met the eyes and he might do better if persisted with."

শুধু কি তাই, ভিশের সেদিনের চমকপ্রদ ইনিংস প্রত্যক্ষ করে আর একজন ভারতীয় সাংবাদিক বললেন—"With his correct technique he seemed to inspire the young cricketer to bring out his best."

কথাটা যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় অংশুমানের দৃঢ়তায়। ভিশ যদি সেদিন তাঁর ব্যাটিং গরিমার প্রভাব বিস্তার করতে না পারতেন, তাহলে হয়ত বিপর্যয়ের মধ্যে নবপ্রাণচেতনায় প্রেরণা পাওয়া সম্ভব হতো না অংশুমান গাইকোয়াড়ের।

সত্যি সেদিন ভিশ প্রেরণা যুগিয়েছিলেন গোটা দলকে। তাঁর ব্যাটিংয়ের রাজসিক দীপ্ত মহিমায় সমুজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল ইডেন। বুকের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে উঠেছিল ক্রিকেটের পদাবলীর সুর। কলকাতার মানুষ অবাক বিস্ময়ে বলে উঠেছিল—"এ কি রূপে দিলে দরশন।"

সত্যি সেদিন ইডেনের বুকে যেন নেমে এসেছিলেন ক্রিকেটের দেবতা। আপন প্রিয়জনের ওপর সমস্ত শক্তিকে প্রয়োগ করে ক্রিকেটের দেবতা সেদিন যেন ধরা দিয়েছিলেন নিজেকে। রূপের মাঝে অরূপের অভিব্যক্তি দেখে কলকাতার ক্রিকেট হয়ে উঠেছিল ধন্য।

চোখের ওপর এখনও ভাসে খুদে শিল্পীর সেই অবর্ণনীয় ধ্রুপদী শিল্পশৈলীর প্রকাশ মাহাত্ম্য। নিখুঁত স্কোয়ার কাট—মাটির বুকে মুখ গুঁজে লাল বল প্রণয়পরশে হিল্লোলিত প্রাণাবেগে ধেয়ে চলেছে সীমানার বাইরে। একেকটা মার—যেন কোন ক্রিকেটারের ব্যাটের স্পর্শরঞ্জিত নয়, রঙ তুলিতে আঁকা একটি নিটোল ছবি। এ যেন শিল্পের দক্ষতায় কল্পনার সূক্ষ্ম ঘায়ে খোদাই করা "সত্যম্-শিবম্ সুন্দরম"-এর মূর্তি।

দল যেখানে বিপদগ্রস্ত, দর্শকচিত্ত যেখানে শঙ্কিত সেখানেই ঘটেছে তাঁর আবির্ভাব। স্বয়ং শক্তিমান তো একদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আছেন তাঁর সৃষ্টির কাছে। তিনি যে কথা দিয়ে গেছেন, যখনই বিপদ আসবে, যখনই আসবে শক্তি পরীক্ষার অমোঘ সময়, তখনই মানবকল্যাণে বিশ্বশান্তি কামনায়, সৃষ্টির আকর্ষণে, আমার প্রকাশ ঘটবে—এই কি সেই তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা?

প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে সমস্যার জটিল স্তর উত্তরণ করে

ভিশ ভারতীয় ক্রিকেটকে বহুবার রক্ষা করেছেন। তাঁর এই ক্রিকেট চরিত্রটি কারো আছে অজানা নয়। বিশ্বনাথ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এই ম্যাচ বর্ণনার প্রকল্পে ক্রীড়া সাংবাদিক প্রভাপ রামচাঁদ লিখেছেন—"Viswanath normally builds up his innings slowly whether it is becuase of India's poor position (he has invariably come in at a time when India have lost quick wickets) or whether it is his natural habit, it is difficult to say. I have watched Viswanath play several innings at various matches since I969 and I have never seen the crowd booing him for slow scoring or even yawning while he batted. Viswanath has always been watched with keen interest. Even a forword defensive stroke—normally a dull thud of bat agaist ball—is a thing of real beauty and grace when Viswanath plays it···some of his strokes could well be the work of an ethereal beauty or the work of a sculptor."

ইডেনের বুকে ভারতীয়দের মতো ক্যারিবয়ান ব্যাটধারীরাও খুব একটা সফল হতে পারলেন না। লয়েড, রিচার্ড, কালীচরণ গ্রীনিজ কেউই সফল হতে পারলেন না। একমাত্র মারমুখী ফ্রেডরিকস দলের ২৪০ রানের মধ্যে করলেন শত রান। মাত্র সাত রানে পিছিয়ে পড়া ভারতীয় ব্যাটধারীরা শুরু করলেন দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা। এই পর্যায়ের খেলায় ভারতীয় ক্রিকেটারেরা আবার হলেন ব্যর্থ। রবার্টস, জুলিয়েন, হোল্ডাররের মতো পেসম্যানদের দিয়ে লয়েড বাজিমাৎ করলেন। এই অবস্থায় লয়েডকে তবু নিশ্চিন্ত হতে দিলেন না বিশ্বনাথ। তাঁর ছায়াময় মানস মূর্তিটি মনে হয় লয়েডের অন্তঃকরণে দুঃস্বপ্নের মতো আচ্ছন্ন হয়ে ছিল! তিনি জানতেন, ভিশ উইকেটে

অবধি এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালো যা দেখে ভারতবাসী জয়ের কথা ভাবতে ভুল করলেন না।

বিশ্বনাথের সেদিনের ব্যাটিংয়ের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লেখা হলো : "Viswanath batting with all the artistry at his command, had taken five hours and a quarter to reach that work. The seventh wicket pair now settled down to play some really fighting cricket....That was the plan any way."

শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গে লেখক বললেন—"The match—and the series—hung in the balance as Viswanath joined."

নববর্ষের সূচনায় ভারতীয় ক্রিকেটের নবতম কীর্তি হলো সূচিত। শেষ কাজটি সমাধা করলেন বাঁহাতি বেদী। তাঁর ঝোলানো বলে মরিয়া হয়ে মারতে গিয়ে বোল্ড হলেন রবার্টস।

জয়—ভারতের জয়।

মাত্র ৮৫ রানে ভারত জিতলো ক্যারিবিয়ান দলের বিরুদ্ধে। এই জয়ের সুবাদে ভারতবাসী আবার নতুন করে চিনে নিলেন তাঁদের ক্রিকেট অর্জ্জুন বিশ্বনাথকে।

ইডেনের এই ম্যাচ প্রসঙ্গে রাজু ভারতন তার "Indian cricket : The vital phase" নামক গ্রন্থে বিশ্বনাথ প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—"Vish rose to the occasion splendid to demonstrate that If Lloyd was the pillar of west Indian batting, he was the caterpillar of Indian batting ! The caterpillar assumed butterfly form at last as Vish struck the balance between attack and defence that had consistently eluded him. He was the picture of grace and poise, playing the ball caressingly off the toes and square driving with pomp and aplomb. He

থাকতে ভারতীয় দলকে চট করে হাতের মুঠোয় পাওয়া সম্ভব হবে না। তাই তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন বিশ্বনাথকে আউট করার জন্য। কিন্তু ক্রিকেটের সৌভাগ্য—বিশ্বনাথ তাঁদের সেই লাল বলের সমস্ত দাপটকে হেলায় হারিয়ে প্রকাশ করেছিলেন নিজেকে। ১৯২ রানে ষষ্ঠ উইকেট মদনলালের পতনের পর ভিশ নিজের ঐশ্বরিক ক্ষমতার পরিচয় দিলেন।

ইডেন স্তব্ধ হয়ে ছিল।

সংশয় দোলা দিচ্ছিল অনিশ্চিত ক্রিকেট অন্তরে। কার্যণ ঘাউড়িকে সঙ্গী করে বিশ্বনাথ মাথা ঠাণ্ডা রেখে একক কাণ্ডারী ভূমিকায় পাড়ি দিলেন দুর্গম পথযাত্রায়।

উইকেটের চারদিকে ঘুরতে লাগলো তাঁর হাতের ব্যাট। তাঁর ব্যাটের স্পর্ধিত ঘায়ে লাল বলের দাপট খানখান হয়ে গেল। বিদ্যুৎ-স্পর্শিত চকিত চমকের দ্যুতি ছড়িয়ে গিয়েছিল ইডেনের সর্বত্র।

মেঘ সরে ছিল।

আলো ফুটে ছিল।

ভিশের জীবন বিপন্ন করা ইনিংস গরিমার মনোরম দীপ্তির প্রাণ উন্মাদনার নির্মল প্রয়াসে রক্ষা পেল ভারতবর্ষ। ক্রিকেট মর্যাদা রক্ষার তৃপ্তির আনন্দে কোটি কোটি ভারতবাসী সেদিন এই খুদে ক্রিকেট শিল্পীকে বরণ করতে ভুললেন না। রক্তের গভীরে সেই প্রতিষ্ঠা হলো ক্রিকেটার অর্জুনের শাশ্বত হৃদয় আসন।

চোখ মেলে তাকালো ভারতের মানুষ। সেনচুরি করলেন বিশ্বনাথ। অর্ধশত রান করলেন ঘাউড়ি। ১৯২ থেকে রান এলো ২৮৩তে। শেষ অবধি রবার্টসের ইনসুইংগার বোল্ড করলো ঘাউড়িকে। বিশ্বনাথ আউট হলেন ১৩৯ রানের মাথায়। ভারতীয় ইনিংসের যবনিকা পড়লো ৩১৬ রানে।

কেউ কল্পনার চোখে ভাবতে যা সাহস পায়নি, তাই শেষ অবধি সম্ভব হলো ভিশের প্রচেষ্টায়। চতুর্থ দিনের সংশয়ভরা ক্রিকেট শেষ

finelly found his batting form. playing pace and spin alike with time to spare.···His 139 runs especially, was a truly professional knock in which the amateur spirit was judiciously blended."

শুধু তাই নয় পরিচ্ছেদের প্রান্তে ইডেনে ভারতের জয়ের প্রসঙ্গে তিনি একথাও বললেন—"Chandra it was who changed the caribbean complexion in the 46 balls, but it is as Vishwanath's test this Calcutta test will be remembered. His 52 on the first day showed he now knew when to drive and when to apply the brakes ; his 139 in the second innings marked his coming of age as a world class batsman. Vish played the bowling purely on its demerits. He also held three fine catches in the slip and had a hand in a runout. What move could one man do ?"

সত্যি তো, একটা মানুষ আর কি করতে পারেন—তিনি যে অনেক করেছেন—তাঁর কাছে আমরা ঋণী, ঋণী ভারতীয় ক্রিকেট। তাই বলি, হে ভারতীয় ক্রিকেট ঋত্বিক, তোমার মহিমাদীপ্ত রাজসিক ঐশ্বর্যের মূল্যায়ন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা অক্ষম, আমরা দীন আমরা রিক্ত—তুমি শুধুমাত্র আমাদের আন্তরিকতা গ্রহণ কর। আমাদের পথ দেখাও। তোমার সাধনসিদ্ধ পথে ভারতীয় ক্রিকেটের যাত্রা সফল হোক এই আমাদের কাম্য।

স্বপ্নের ইনিংস

ইডেনের পর মাদ্রাজের চীপক মাঠে আবার এক অনন্যসাধারণ রাজসিক ইনিংস খেললেন ভিশ। ক্রিকেটের রাজভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে, সমগ্র মূল্যবান ঐশ্বর্যকে দুহাত ভরে চীপক উদ্যানে বিলিয়ে দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের যোগী শিল্পী এক অম্লান স্বপ্নের ইনিংস গড়লেন। তাঁর মাধুর্য দীপ্তির মহিমায় একালের ক্রিকেট হয়েছিল তৃপ্ত।

ইডেনের গরিমা রেশ বাতাসের শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে না যেতেই মাদ্রাজের বুকে অনুষ্ঠিত হলো চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ।

ভিশের ইডেনের ইনিংসটি যদি তাঁর ক্রিকেট জীবনের শ্রেষ্ঠ গরিমা হয়, তাহলে চীপকের ইনিংসটিকে বলবো তাঁর ক্রিকেটীয় সাধনার এক মহত্ত্বের ইনিংস। ইডেনে প্রকাশ ঘটেছিল ভিশের শ্রেষ্ঠত্বের, গরিমার, ঐশ্বর্যের, চীপকে বিকাশ ঘটেছে তারই প্রকাশ মহত্ত্বের।

স্মরণেও সুখ, তৃপ্তি। মানুষ কি পারে—পারে কি একক প্রচেষ্টায় এমন এক মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে নিজেকে বিপন্ন করে জাতীয় মর্যাদাকে রক্ষা করতে ? যে পারে, সেই তো শ্রেষ্ঠ—তিনি তো মহৎ।

ভিশ পেরেছিলেন। বিশ্ব ক্রিকেট প্রেমিকের দল সুখ-স্বপ্নের ঘোরে কাল্পনিক ভাববিলাসে যে রূপ গরিমার কথা মনে করে তৃপ্ত হয়ে ওঠেন, সেই একটি কাল্পনিক ইনিংস সহজ অনাবিল ভঙ্গিমায় রচনা করলেন ভিশ।

সহজ সবল শৃঙ্খলাবদ্ধ কঠোর ব্রত সংমিশ্রিত ব্যাটিংয়ের নম্র শুচি-শুভ্র স্নিগ্ধতার পরশ বুলিয়ে ছোট্ট মানুষটি সারা মাঠকে যেন আপন সৃজন প্রতিভার আধার করে তুলেছিলেন সেদিন।

গোটা চীপক বিস্ময়ে স্থির হয়ে ছিল। একি দেখছেন সকলে!

এ কি কোন মানুষ ক্রিকেটারের সাধনলব্ধ ক্রিকেট প্রতিভা, নাকি ক্রিকেটের দেবতার স্পর্শ পাওয়া কোন কল্পনার দেবদূত!

নিখুঁত চোস্ত মার—সেই সঙ্গে অনমনীয় মানসিক দৃঢ়তা। এক-দিকে কঠোর শাসন শৃঙ্খলা আর একদিকে ধ্রুপদী শিল্পের উদাসীন আন্তরিক স্পর্শ, সব মিলিয়ে ভিশের এই ইনিংসটি ছিল অমৃতময় রূপকারের এক সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয়ধন। এই রূপ পরিক্রমা দেখতে দেখতে চোখে জল এসেছিল। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল সারা শরীর—রক্তে রক্তে ছড়িয়ে গিয়েছিল এক অচেনা ঐশ্বর্যকে আন্তরিক ভাবে পাওয়ার অফুরান আনন্দ অনুভব!

টসে জিতে ছিলেন পাতাউদী। ভেবেছিলেন স্পিন উইকেটে আগেভাগে ব্যাটিং পর্ব সেরে নিয়ে এক মস্ত রানের ইমারত গড়ে লয়েডকে জব্দে ফেলবেন। নাবাবের সেই নবাবীয়ানার প্রত্যাশা কার্যকরী হয়নি। বরং লয়েড বাহিনীর লাল বলের দৌরাত্ম্যে এক বিপরীত নগ্ন শোক-চিত্রের অবতরণা করেছিল ভারতীয় তাঁবুতে। রবার্টস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ লাল বলের গতিতে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছায়া ফুটিয়ে তুললেন। সোলকারকে দিয়ে এই ম্যাচে গোড়াপত্তন করে ভারতীয় কর্মকর্তার দল যে নবতম প্রত্যাশায় বুক বেঁধেছিলেন, তা রবার্টসের বুদ্ধিদীপ্ত বোলিংয়ের সামনে অচিরেই গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। কোনরকমে বিসদৃশভাবে উনিশটি বলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার পর সোলকারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। অফস্ট্যাম্পের বাইরে লাফিয়ে ওঠা বলে শিশুসুলভ ভঙ্গিমায় ব্যাট দিয়ে খোঁচা মেরে বিদায় নিলেন তিনি। ইঞ্জিনিয়ার কিছুটা বেপরোয়া ছিলেন। জুলিয়েনের বলে দুটি বাউণ্ডারী মারার পর তৃতীয় বাউণ্ডারীর প্রত্যাশায় বলের লাইন ও গতি না বুঝে ব্যাট চালানোর ফলে তাঁকেও ফিরতে হলো মাত্র ২৪ রানের মাথায়। লয়েড এই সময় বুদ্ধি করে ভারতকে চেপে ধরে ছিলেন পেশ বোলিংয়ের আক্রমণে। বলের গতি কিছুটা কমিয়ে নিয়ে রবার্টস চেষ্টা করলেন পিচ থেকে বল ঠুকে ওপরে

তুলতে। তাঁর এই প্রচেষ্টা অল্প সময়ের মধ্যেই কার্যকারী হলো। লাফানো বলে মুখ বাঁচাতে গিয়ে আউট হলেন মানকাদ। নিচু হয়ে আসা ছুটি বলে ফিরে গেলেন অংশুমান ও পাতাউদী। ভারতীয় তাঁবুতে তখন ত্রাহী মধুসূদন অবস্থা। মাত্র ৭৪ রাণে পাঁচ-পাঁচটি চোস্ত দামী ব্যাটধারীর পতন।

দলের এই সমূহ বিপদের মধ্যে একমাত্র আত্মিক শক্তি বিস্তারে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন একটি মাত্র মানুষ। মুখে তাঁর কোন ভাবান্তর নেই। ধীর স্থির, ধৈর্যের প্রতিভূ যেন। মাত্র ছুটো রান যোগ হলো—এবার ফিরলেন মদনলাল। অবস্থা দাঁড়ালো চরমে। ছয় উইকেটে ৭৬ রান। সপ্তম উইকেটে প্যাভেলিয়ান থেকে একক প্রহরী ভিশকে সঙ্গ দিয়ে ব্যাট হাতে বেরিয়ে এলেন সেই কার্যণ ঘাউড়ী।

চীপক মাঠের মানুষের হৃদয়পটে ভেসে উঠলো ইডেনের সেই নির্মল শিল্পের দৃশ্য। চোখ বুজিয়ে গোটা দেশের মানুষ প্রার্থনা শুরু করলো ক্রিকেট দেবতার কাছে—"হে ক্রিকেটের দেবতা, তুমি সদয় হও—তোমার শক্তিকে তুমি জাগ্রত কর।"

নিরহংকার চিত্তে খেলে চলেছেন ভিশ। ভ্রূক্ষেপহীন এক ক্ষমা-সুন্দর রূপ গরিমা। সময়ের হিসাব নেই, ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহ নেই, যা আছে তা হলো শিল্পীর উদাসীনতা, যোগীর সংযম ব্রত।

ঘাউড়িকে সঙ্গী করে প্রায় এক ঘন্টাকাল এক অনিন্দ্য সুন্দর দেবশিশু সুন্দর একটি ইনিংস গড়ার পথে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর যোগসিদ্ধ হাতের ব্যাট মুক্ত কৃপাণের মতো লাল বলের রঞ্জিত অহংকারকে চীপকের বুকে গুঁড়িয়ে দিয়ে তিল তিল করে সৃষ্টি করতে লাগলেন একটি কাল্পনিক স্ফটিক সৌদ্ধ গরিমাকে। কাব্যিক রস বিন্যাসিত তিলোত্তমা এই ইনিংসটিকে সেদিন যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান।

মানুষ কল্পনায় যে ছবি চিন্তার প্রশ্রয় পায় না, সেই স্বপ্নের ছবি

সাবলীল ক্রীড়াবিন্যাসে আপন মাধুর্য আঙ্গিকে চিত্রিত করলেন ভারতের একজন ক্ষুদে শিল্পী-সাধক।

ভিশের পট আঁকা ইনিংসটির পাশে কার্ষণ ঘাউড়ি সঙ্গী হিসাবে প্রাণশক্তিতে যুগিয়ে যেতে লাগলেন ধৈর্যের প্রেরণা। চমৎকার খেলছিলেন ঘাউড়ি। রান বাড়ছিল। হাত খুলে নিজের সমস্ত রকম রূপকে প্রকাশ করছিলেন ভিশ। সময় মতো বল মেরে নিজের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে নিজের মতো ক্রিকেট খেলতে কসুর করলেন না তিনি।

ভারতের দুর্ভাগ্য—কার্ষণ টিকলেন না। শেষঅবধি রবার্টসের নিচু বল তাঁর প্যাড ব্যাটের ফাঁক দিয়ে গলে এসে ধাক্কা দিল উইকেটে। ১১৭ রানে বিদায় নিলেন ঘাউড়ি। দৃশ্য মেলাতে না মেলাতে আবার পতন। এবার ফিরলেন প্রসন্ন। ভরসা এখন বেদী আর চন্দ্রশেখর। ওই অবস্থার মধ্যে নিজস্ব ৪৪ রানকে মূলধন করে বেদীর সহযোগিতায় আরো ৪৩ মিনিট পার করে দিলেন ভিশ। ১৬৯ রানে পতন ঘটল নবম উইকেটের।

চন্দ্র শেষ জুটি।

ভিশ তখন দাঁড়িয়ে উইকেটে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওই অবস্থায় ২৩ মিনিটের মধ্যে ১৪টি বলের বিরুদ্ধে সঠিক ভাবে ব্যাট ধরে রেখেছিলেন চন্দ্রশেখর। ঠিক সময় ঠিক রান নিয়ে ভিশ এগিয়ে যাচ্ছিলেন রান সংগ্রহের দিকে। পতন যে দলের যে-কোন মুহূর্তে ঘটে যাবে তা তিনিও জানতেন। তবু এত জেনেও নিজের ধৈর্যকে মুহূর্তের জন্য হারাতে দিলেন না তিনি। শেষ অবধি ১৯০ রানের মাথায় চন্দ্রশেখর রবার্টসের বলে ব্যাট ছুঁয়ে লয়েডের হাতে ধরা পড়লেন।

সব শেষ হয়ে গেল। অবসান ঘটলো এক অমর যোদ্ধার অবিস্মরণীয় যুদ্ধ-কাহিনীর। মাত্র তিন রানের জন্য সেনচুরি বঞ্চিত ভিশ অপারেজয় সম্রাটের মতো মাথা উঁচু করে ফিরে এলেন প্যাভেলিয়ানে।

তাঁবুতে ফেরার পথে তাঁকে করতালিতে অভিনন্দিত করলেন

লয়েড বাহিনীর সৈনিকেরা। এই ম্যাচ প্রসঙ্গে বর্ণনা দিতে গিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া-সাহিত্যিক মতি নন্দী লিখলেন—"বিশ্বনাথ স্বপ্নের ইনিংস খেলেছে।"···শুধু এই কথাই নয়, সেই সঙ্গে ম্যাচ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন—"বিশ্বের সেরা ব্যাটধারীরা স্বপ্নে যে ইনিংস খেলে, আজ চীপকে বিশ্বনাথ তাই খেললো।···দেখলাম তিনটি রান প্রয়োজন ছিল তার একটি সম্মান লাভের জন্য। শিল্পীর উদাসীনতায় সে তা প্রত্যাখ্যান করে গেল। যখন বেদী ও চন্দ্র তাঁর সঙ্গী বিশ্বনাথ তখন অন্তত চল্লিশটি রান ছেড়ে দিয়েছে। মুহূর্তের জন্য লোভের বশবর্তী হয়ে সে নিজেকে থামিয়ে আনেনি।"

প্রতাপ রামচন্দ্র এই ম্যাচ প্রসঙ্গে তাঁর "Great Moments In Indian Cricket" গ্রন্থে বলেছেন—"Viswanath launched such a furious counter attack that Lloyd was thunder-struck. The batsman's name has always been linked with grace, beauty, artistry and seldom with power and potent assaults. The crowd at Chepauk that day were priviledjed to witness one of the greatest innings in the history of Indian Cricket."

১৯০ রানে ভারতীয় ইনিংসকে মুড়িয়ে যেতে দেখে অনেক বুদ্ধিজীবী সমালোচকেরা ভেবেছিলেন, এই ম্যাচে লয়েড মস্ত রানের ইনিংস গড়ে ভারতকে অচিরেই কোণঠাসা করে ফেলবেন। কিন্তু তাঁদের সেই প্রত্যাশা কার্যকারী হলো না চীপকের উইকেটে প্রসন্ন ও বেদীর লেংথ-মাপা গুণের কল্যাণে। বিশেষ করে এই ম্যাচে প্রসন্ন তাঁর স্পিন বোলিংয়ের মহিমা বিস্তার করে ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং চেহারাকে এমন একটা জায়গায় টেনে আনলেন, যা দেখে অতি-বাস্তববাদী ক্রিকেট সমালোচক পর্যন্ত বিস্মিত হতে বাধ্য হলেন।

চমৎকার বোলিং করলেন প্রসন্ন। তার অফস্পিন মিশ্রিত নিখুঁত লেংথ ও লাইনের টানে, তিনি আবার নতুন করে প্রমাণ দিলেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। বেদী একপ্রান্ত থেকে যেমন বাঁ হাতের মোচড়ে ফাঁস জড়ালেন, তেমনি অন্য প্রান্ত থেকে প্রসন্ন। এই দুই বোলারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ক্যারিবিয়ান দল মুড়িয়ে গেল মাত্র ১৯০ রানে। একমাত্র রিচার্ড ও লয়েড কিছুটা আত্মশক্তি প্রয়োগ করে খেলার চেষ্টা করলেন—বাকিরা কেউ পারলেন না প্রত্যাশা পূরণ করতে। প্রসন্ন ৭০ রানে পেলেন ২৩ ওভারে পাঁচটি উইকেট, বেদী ৪০ রানে ১৯ ওভারে তিনটি। খেলা জমে উঠলো। ক্রিকেটের অনিশ্চিত ভাগ্য মুহূর্তের জন্য আবার ঝুঁকে পড়লো ভারতের দিকে।

এই ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটধারীরা কিছুটা গুছিয়ে খেলার চেষ্টা করলেন। তবু প্রাথমিক পর্যায়ে সুবিধে করতে পারলেন না সোলকার। এই ইনিংসে ভিশের সাহচর্যে কিছুটা দেখেশুনে আত্মনির্ভরতায় ব্যাট করার চেষ্টা করলেন অংশুমান।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভিশ আবার একটি সুন্দর নিখুঁত ইনিংস খেললেন। প্রথম ইনিংসের মতো তাঁর এই ইনিংসে সংযম ধরা না পড়লেও শিল্পশৈলী প্রকাশে অভাব ঘটলো না কোন। চমৎকার কায়দায় তিনি জুলিয়েন, হোল্ডার রবার্টসকে মারতে কসুর করলেন না। এই সময় তাঁর হাতের ব্যাটে বিকশিত হয়েছিল রাজকীয় আভিজাত্য-লাবণ্য ও সুষমা। তাঁর প্রাণোচ্ছল চিত্তাকর্ষক স্ট্রোকের মহিমাদ্যুতিকে বর্ণনা করে একজন ইংরেজ সাংবাদিক লিখলেন—"Viswanath playing that stroke could easily be compared to the cover drives of Hammond and May in the 1930's and 1950's respectively."

সত্যি তুলনা হয় না আত্মসচেতনদীপ্ত ভিশের ক্লাসিকাল স্ট্রোকগুলির। তার প্রতিটি স্ট্রোকের মধ্যে যেমন ফুটে উঠেছিল সৌন্দর্য

লাবণ্য, ধ্রুপদী শিল্পের অভিজাত্য, তেমনি প্রকাশ পেয়েছিল বীরোচিত গরিমার অহংকারিত দাপট। উদ্ধত ব্যাটের ঘায়ে স্পর্ধিত লালবল বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ার দহনযন্ত্রণায় আত্মগোপনের লজ্জায় ছুটে গিয়েছিল সীমানার বাইরে।

তার প্রভাব ও দাপট ভরা এই নিখুঁত শিল্পসুলভ ইনিংসটির বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রতাপ রামচাঁদ বলেছেন—"The strokes were made with all the artistry at his command. There has no desperate shot. Each stroke was properly chosen for the ball it had to meet. The urgency of the chase for runs did not mean that Viswanath was going to give up timing his strokes. His timing continued to be so perfect that there seemed no show of force."

গুছিয়ে খেলা সত্ত্বেও ভারত খুব একটা বড় রান সংগ্রহ করতে পারলো না। ভিশের ৪৬ ও অংশুমানের ৮০ রান ছাড়া আর কারো তেমন সঞ্চয় ছিল না। দুর্ভাগ্য অংশুমানের—সংযম ও ধৈর্যের সঙ্গে খেলেও তিনি পারলেন না শতরানের গৌরব অধিকার করতে। ৮০ রানের দুর্লভ ইনিংস গড়ে অংশুমান হলেন রান আউট। ভারত দিন শেষ করলো ২৫৬ রানে।

চীপকের মানুষ কিন্তু তখনও টের পায়নি পরিণতি কোন্ খাদে বয়ে চলেছে,খেলার মোড় ঘুরলো রিচার্ডের বিদায়ের পর। প্রসন্নর অফস্পিনে রিচার্ড ফিরে গেলেন। খানিক সময়ের মধ্যে প্রসন্ন আবার ফেরালেন লয়েডকে। ব্যাস,এর ফলে খেলা পুরোপুরিভাবে চলে এলো ভারতেরহাতে। মরিয়া হয়ে এবার চেপে ধরলেন পাতাউদী। শেষ দিকের উইকেটে কেউই দাঁড়াতে পারলেন না। ঘূর্ণিমান মাদ্রাজের উইকেটে প্রসন্ন-বেদীর প্রয়াসে অসাধ্য সাধন করলো ভারত। ১৫৪ রানের মাথায় রবার্টসকে আউট করে বেদী নিয়ে এলেন সেই মাহেন্দ্র মুহূর্ত। মাত্র

একশো রানে জিতলো ভারত। প্রথম দুটি ম্যাচে হেরে গিয়ে সিরিজ সমান সমান করায় শেষ ম্যাচের গুরুত্ব বেড়ে গেল অনেকখানি।

পাঠকদের জানিয়ে রাখি—শেষ ম্যাচে ওয়েস্টইণ্ডিজ জিতেছিল ২০১ রানে। বোম্বাইয়ের মাঠে শেষ টেস্টে অংশ নিয়েছিলেন সানি। এই ম্যাচে তিনি করেছিলেন ৮৬ রান। সোলকার পেলেন সেনচুরি। আর ভিশ—দুর্ভাগ্য সাধক শিল্পীর। এই টেস্টে মাত্র চার রানের জন্য সেনচুরি বঞ্চিত হলেন তিনি প্রথম ইনিংসে। দ্বিতীয় দফায় করলেন ১৭ রান।

মরশুম শেষে ভিশের ১০টি ইনিংস থেকে সংগৃহীত হলো ৫৬৮ রান, যার গড় ছিল ৬৩·১১।

এরপর নিউজিল্যাণ্ড সফর।

নিউজিল্যাণ্ড সফর

১৯৭৬ সাল। ভারতীয় দল চললো নিউজিল্যাণ্ড সফরে। এবার দলে নব নির্বাচিত অধিনায়ক। নবাব পাতাউদী আগেই বলেছিলেন ভারতের বাইরে তাঁর দল নিয়ে সফর করা সম্ভব নয়—কাজেই কর্তৃপক্ষ অগত্যা সমস্যা মেটাতে দলের দায়িত্ব তুলে দিলেন বাঁহাতি বোলার বেদীর ওপর। এই সফরে দলে নেওয়া হলো কতিপয় নবাগত খেলোয়াড়কে। গোটা ব্যাপারটাই ছিল পরীক্ষামূলক। এই পরীক্ষামূলক খেলায় ভারত জিতলো প্রথম ম্যাচে। সে খেলার কথায় পরে আসছি, তাঁর আগে বলে রাখি, অকল্যাণ্ডের ইডেনপার্কে প্রথম টেস্ট ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই দলনায়ক বেদী হলেন আহত। এর ফলে দল পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়লো সানির ওপর। নতুন আধিনায়ক সহ প্রথম ম্যাচে

নির্বাচিত হলেন তিন তিনজন নতুন খেলোয়াড়। এই তিনজন হলেন সৈয়দ কিরমানী, সুরিন্দর অমরনাথ ও দিলীপ বেঙ্কসারকার।

জানুয়ারীর ২৪ তারিখে ইডেনপার্কে শুরু হলো প্রথম দিনের খেলা। নিউজিল্যাণ্ড দলপতি টার্ণার টসে জিতে নিজেদের চেনা মাঠে নিলেন ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত। চমৎকার ভাবে খেলা শুরু করেছিলেন তাঁরা। রান উঠছিল বেশ। মদনলাল ও অমরনাথ লেংথ ও লাইন বজায় রেখে বল দেওয়া সত্ত্বেও নিউজিল্যাণ্ড ব্যাটধারীদের রানের প্রবণতা থেকে দাবিয়ে রাখতে পারলেন না। খেলার মোড় ঘুরলো স্পিন আক্রমণের কিছু পরেই। চমৎকার বোলিং করলেন চন্দ্রশেখর ও প্রসন্ন। বিশেষ করে এই দিন চন্দ্র মারাত্মক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর আকস্মিক গুগলির টানে একে একে ফিরলেন ছ'জন ব্যাটধারী। প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়ার মিনিট কুড়ি আগে গোটা নিউজিল্যাণ্ড দল চন্দ্রার গুগলীতে লটকে গেল ২৬৬ রানে। চন্দ্র পেলেন ৯৪ রানে ছ'টি ও প্রসন্ন ৬৪ রানে তিনটি উইকেট।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দল মারমুখী খেলা শুরু করলো। গাভাসকার সহ অমরনাথ করলেন সেনচুরি। এই ম্যাচে ভিশ ব্যাট হাতে দাঁড়াতেই পারলেন না। হেডলীর একটি সুন্দর বলে তিনি খোঁচা মেরে আউট হলেন শূন্য রানে। ভারতীয় দল করলো ৪১৪ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যাণ্ড দলকে কোমর সোজা রেখে দাঁড়াতে দিলেন না প্রসন্ন। তিনি ৭৬ রানে আটটি উইকেট দখল করে ভারতকে অতি সহজে জিতিয়ে দিলেন এই ম্যাচ।

পরের ম্যাচে বেদী দলে এলেন ভেঙ্কটরাঘবনের জায়গায়। ৫ই ফেব্রুরারী ল্যানচেস্টার পার্ক মাঠে বসলো দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ। এই ম্যাচে টসে জিতে বেদী নিলেন ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত। এই টেস্টে ভারতীয় ব্যাট-ধারীরা খুব একটা সুবিধে করতে পারলেন না। মাত্র ৫২ রানে তিন তিনজন ব্যাটসম্যান আউট হওয়ায় দলের দায়িত্ব এসে পড়লো বিশ্বনাথের ওপর। গোটা দল যেখানে বিপন্ন, সংকটগ্রস্ত, সেখানে মুক্ত কৃপণ হাতে

অর্জুন ভূমিকায় নিশ্চিন্তে দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে ভিশ তৈরী সব সময়। অতএব এই ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর সেই চিরাচরিত দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতে কসুর করলেন না। উইকেটের চারদিকে ব্যাট হাতে মুক্ত হস্তে রাজকীয় মার মারলেন ভিশ। মনোরম স্ট্রোকের মণিমাণিক্যে পরিচ্ছন্ন একটি সুন্দর রূপের ডালি সাজিয়ে ভিশ আবার প্রমাণ দিলেন নিজের শ্রেষ্ঠত্বের। তাঁর কাব্যিক রস বিন্যাসিত এই শৈল্পিক ইনিংসটি দেখে নিউজিল্যাণ্ডার সাংবাদিকদের দল হয়ে উঠলেন বিমোহিত। কলিংস, কংডন, হেডলীর মতো বোলারেরা কালঘাম ঝরিয়েও মুহূর্তের জন্য ক্লান্ত করতে পারলেন না ভিশকে। স্কোয়ার কাট, লেগকাট, অন-ড্রাইভ, ও গ্লাইডের মতো দুরূহ স্ট্রোকগুলিকে অবলীলায় যাদুমন্ত্রের স্পর্শে নিখুঁত চিত্রের মতো পত্রপাঠ সীমানার বাইরে পাঠিয়ে ভিশ সৃষ্টি করলেন একটি ধ্রুপদী সৌন্দর্যের অভিজাত চিত্রকলা। ৯৮ রানে প্যাটেল বিদায়ের পর পঞ্চম উইকেটে মহিন্দর অমরনাথকে সঙ্গী করে ভিশ যোগ করলেন প্রায় শতরান। নিজস্ব ৮৩ রানের মাথায় ভারতীয় ক্রিকেটের সার্থকশিল্পী তাঁর উদাসীন মনের বৈরাগ্যতার পরিচয় দিয়ে, নিজস্ব গৌরবের সহজ সুযোগকে হেলায় বিলিয়ে দিয়ে, হেডলীর নিখুঁত একটি আউট সুইংগারে ব্যাট ছুঁয়ে ফিরে এলেন প্যাভেলিয়ানে। শতরান বঞ্চিত হওয়ার দুঃখে গোটা মাঠ নৈরাশ্যে ফেটে পড়লেও, ভিশ কিন্তু সে কথা ঘৃণাক্ষরেও একবারের জন্যেও চিন্তা করলেন না। তাঁর কাছে রানের ব্যক্তিক গরিমার চেয়ে শিল্পের মাধুর্য অনেক বড়—তাই রানের অঙ্কের প্রতি তাঁর কোন মোহ কোনকালেই নেই।

শুধু প্রথম ইনিংসে নয়, দ্বিতীয় ইনিংসেও ভিশ রাখলেন তাঁর ঐশ্বর্যদীপ্ত রাজসিক মহিমার এক অনন্য নজির। সার্থক শিল্পী তাঁর রূপ সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ গরিমার স্তম্ভকে মনোরম বর্ণালী সাজে সুসজ্জিত করে দ্বিতীয় ইনিংসে গড়লেন ৭৯ রানের একটি হোমারিয় ক্লাসিকতায় মধুর ছন্দময় কাব্যিক ইনিংস।

ভিশের এই ম্যাচকে যাঁরা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁরা ভাগ্য-

বান। ক্রিকেটের বুকে যে কটি স্মরণীয় ইনিংস একাল পর্যন্ত রচিত হয়েছে, তাঁর মধ্যে একটি হলো ভিশের সেদিনের ইনিংসটি। সত্যি বলতে কি—সেদিনের ম্যাচে ভারতীয় ক্রিকেটের মানরক্ষা হয়েছিল একমাত্র ভিশের মহিমাদীপ্ত ব্যাটিংয়ের কল্যাণে। তাঁর সেদিনের খেলা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ব্রিটেনডেন উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখলেন—"একমাত্র বিশ্বনাথ (৮৩ ও ৭৯) যিনি অভাবনীয় ব্যাটিং করে ভারতবর্ষকে ক্রিসচার্চের দ্বিতীয় টেস্টে নিশ্চিত পরাজয় থেকে রক্ষা করেছেন।" পরে তিনি ভিশের ব্যাটিং গরিমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখলেন—"It was Viswanath, who played a vital role in taking India through early difficulties and then stroked his way to another fine innings on the last day of the Match···. He showed he has the grit and concentration to go with fine stroke equipment. He had to use all. These attributes in the first innings when India batted on a hard and grassy pitch.... But Viswanath, on a pitch of variable bounce, gave a great display. He came in with the score 41 for 2 and, at 52, lost Surindra Amarnath. But his stoic defence steered India through to 98 for 4 at lunch and then he shared a vital partnership of 98 with Mohinder Amarnath."

শুধু মাত্র দ্বিতীয় টেস্টে নয়। তৃতীয় টেস্টেও ভারতীয় ব্যাটধারীদের একই অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ফাস্ট উইকেটে ব্যাট করতে ভারতীয় ব্যাটধারীরা যে সত্যিই কত অনভিজ্ঞ তাঁর প্রমাণ মিলেছিল তৃতীয় টেস্টে।

ফেব্রুয়ারী মাসের ১৩ তারিখে বসলো তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ। এই ম্যাচে নিউজীল্যাণ্ড দল ভারতীয় ব্যাটধারীদের একরকম প্রায় দাঁড়াতেই দিলেন না। চমৎকার বোলিং করলেন হেডলী। তাঁর বলের ধার সেদিন

বিষাক্ত কেউটের ছোবলের মতো ভয়-ভয় হয়ে উঠেছিল ভারতীয় ব্যাট-ধারীদের কাছে। একমাত্র এই ম্যাচে ব্রিজেশ প্যাটেল ছাড়া কেউই পারলেন না সহজ ভাবে ব্যাট করতে। যদিও একথা ঠিক, এই ম্যাচে নিউজিল্যাণ্ড আম্পায়ারিংও খুব একটা উচ্চপর্যায়ের হয়ে উঠতে পারেনি। যাই হোক—হার হার'ই। ভারত হারলো। বিশেষ করে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ৮১ রানের সমাপ্তি ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক।

মাত্র তিনটি ম্যাচে ৬টি ইনিংস খেলে ভিশ করলেন সর্বসাকুল্যে ১৯৭ রান, যার গড় ছিল ৩৯·৪০ রান।

নিউজিল্যাণ্ড সফর শেষ। এই সফরের ফলাফল ভারতীয় ক্রিকেট রসিকদের খুব একটা আশাপ্রদ হলো না। সামনেই ক্যারিবিয়ান সফর। আবার নতুন করে বসলেন কর্তার দল আলোচনায়।

ক্যারিবিয়ান সফর

১০ই মার্চ।

বার্বাডোসে শুরু হলো প্রথম টেস্ট ম্যাচের আসর। ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচটি ছিল ৩৪ নম্বর এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ৭৭৩ নম্বর খেলা।

ব্রিজটাউন মাঠে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে টসে জেতা সত্ত্বেও ভারতীয় দল কোন রকম ফায়দা আদায় করতে পারলো না। চমৎকার বোলিং করলেন হলফোর্ড। তাঁর বোলিংয়ের টানে জড়িয়ে গেলেন পাঁচ পাঁচজন তাজা ব্যাটসম্যান। এই ইনিংসে গাভাসকার—খুব একটা সফল হতে পারলেন না। মাত্র ৩৭ রানে তিনি রবার্টসের বলে ফিরলেন লেগ বিফোর হয়ে। ভিশও প্রথম ইনিংসে সুবিধে করতে পারলেন না। হলফোর্ডের বলে স্কোয়ার কাট করতে গিয়ে নিজস্ব ১১ রানে হলেন

গালিতে রোর হাতে ক্যাচ আউট। একমাত্র মদনলাল ৪৫ রান ছাড়া আর কেউই পারলেন না ব্যাট সোজা রেখে দাঁড়াতে। মাত্র ১৭৭ রানে ভারতের ইনিংস শেষ।

ভারতের স্বল্পরানের বিরুদ্ধে মনের সুখে খেললেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়েরা। তাঁদের ক্যালিপসো সুরতারে লাগলো নব প্রাণের মন-মাতানো ঝংকার। রিচার্ড করলেন ১৪২ রান। লয়েড করলেন ১০২ ও কালীচরণ বঞ্চিত হলেন সেনচুরি থেকে মাত্র সাত রানের জন্য। দেখ দেখ করে রান উঠলো ৪৮৮।

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের চিত্রটি ছিল খুবই করুণ। দলের মাত্র ৪ রানে গাভাসকার হলেন নিজস্ব এক রানে ক্যাচ আউট। ৯ রানে পতন ঘটলো শর্মার। চল্লিশ রানে বিদায় নিলেন গাইকোয়াড়। দলের সমূহ বিপদ।

বিপদের মধ্যে আবার ভারতীয় দলকে রক্ষা করতে হাল ধরতে এলেন ত্রাণকর্তা 'অর্জুন বিশ্বনাথ'। খুদে মানুষটি তাঁর সাধনসিদ্ধ ঐশ্বরিক ইন্দ্রজাল বিস্তার করলেন বার্বাডোস উইকেটে। রচনা করলেন ভারতীয় শ্বাশত শিল্পবোধের এক অনুপম মাধুর্য। উইকেটের চারদিকে রসিক প্রতাপে ক্রিকেটের প্রতিটি দুরূহ মারকে অবলীলায় প্রয়োগ করে ভারতীয় ক্রিকেটের যোগসাধক শিল্পী সাজালেন একটি মনোরম মূল্যবান নবরত্নখচিত ইনিংস, যাঁর দীপ্তময় রূপচ্ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল ক্যারিবিয়ানদের। রোহান কানহাই, জর্জ হেডলী সংমিশ্রিত ভারতীয়ত্বের অনুপম শিল্পের অভিনবত্ব সেদিনের ক্রিকেটকে করে তুলেছিল রোমাঞ্চিত। স্পিন ও পেশ বোলিংকে সমান ভাবে খেলে ভিশ শুধু নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণই করলেন না সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করলেন সত্যিকার ভারতীয়ানাকে। পঞ্চম উইকেটে মদনলালের সঙ্গে জুটি বেঁধে ভিশ তাঁর ক্লাসিক ব্যাটের সুরমূর্ছনায় বাজালেন প্রাণমাতানো রাখালিয়া সুর। অবধারিত এই গতিময় ইনিংস সম্পর্কে যখন সকলেই প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তখনই ছন্দপতন ঘটলো যোগী তাপসের।

সাধনায় ছেদ পড়লো।

যোগভ্রষ্ট হলেন শিল্পী সাধক।

রবার্টসের বলে আম্পায়ারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তে আউট হয়ে ফিরে এলেন বিশ্বনাথ। পাকা অভিজ্ঞের দল ভিশের এই আউট সম্পর্কে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তবু আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত—ভিশ মাঠ ছেড়ে চলে এলেন উদাসীন বৈরাগ্যের একতারা বাজিয়ে। ২১৪ রানে শেষ হয়ে গেল দলের ইনিংস। ভারত এই ম্যাচে হারলো এক ইনিংস ৯৭ রানে।

২৪শে মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত কুইনপার্ক ওভাল মাঠের খেলার ফলাফল হলো অমীমাংসিত, এই ম্যাচে ভারতীয় ব্যাটধারীরা চমৎকার ক্রিকেট খেললেন। ওয়েস্টইণ্ডিজদলের গড়ে তোলা ১৪১ রানেরবিনিময়ে ভারত করলো ৫ উইকেটে ৪০২ রান। দারুণ ব্যাট করলেন সানি। তাঁর বীরদীপ্ত ব্যাটের পুরুষোচিত গরিমা ভারতকে বড় রানের ইনিংস রচনায় সাহায্য করেছিল সবচেয়ে বেশী। গাভাসকার এই ম্যাচে করলেন ১৫৬ রান, সঙ্গে ব্রিজেশ প্যাটেল ১১৫ রান। ভিশ এই ইনিংসে বড় রানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও তা গড়তে পারলেন না। সাদামাটা একটা দান খেলে তিনি সরে পড়লেন কোন রকমে। যেন অনেকটা স্বেচ্ছা মৃত্যুর সামিল।

* * *

তৃতীয় টেস্ট।

৭ই এপ্রিল। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসের কাছে এক স্মরণীয় অধ্যায়। এই ম্যাচে ভারত জিতলো। জিতলো চতুর্থ ইনিংসে ৪০৬ রানের ইনিংস গড়ে ছয় উইকেট। ভারতীয় ক্রিকেটের এই জয় নিসন্দেহে ছিল সেদিন ইতিহাস নির্ভরিত একটি শ্রেষ্ঠ নজির। এই জয়ের মুহূর্তে ভিশের অবদান অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ১৭৭ রানে গাভাসকার আউট হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে কোন ভারতবাসী স্বপ্নের ঘোরেও চিন্তায় সাহস পাননি এই ম্যাচ জয়ের কথা ভাবার।

ভিশ অসাধ্য সাধন করলেন।

তৃতীয় উইকেটে সঙ্গী নিলেন মহিন্দর অমরনাথকে। এবার এই দুই ব্যাটধারী ঐশ্বরিক মায়াময় ইন্দ্রজাল বিস্তারে চালাতে লাগলেন হাতের ব্যাট। মহিন্দর অমরনাথ প্রথম দিকটায় গুটিয়ে রেখেছিলেন নিজেকে। কিন্তু ভিশের আত্মপ্রত্যয় মুখরিত শিল্পীসুলভ দুরন্ত অভিব্যক্তি অচিরেই তাঁকে জাগ্রত করলো। উইকেটের চারদিকে যথোচ্ছচার ব্যাট চালাতে লাগলেন অমরনাথ। অন্যদিক নিভু্ল ক্রিকেটের পরিচয় দিলেন ভিশ। তাঁর দর্পিত ব্যাটে যেন ম্যাচ জয়ের সুগভীর প্রত্যাশা। শিল্পী যেন তাঁর সাধন শিল্পে সমাধিস্থ। দুরূহ একেকটি মার—অথচ কি নিভু্ল, নির্মল শুচিশুভ্র আন্তরিক সংবেদনশীল। ক্লান্তিহীন দুরন্ত সংযমী ব্যাটের প্রসাদ গুণে অচিরেই ভারতীয় দল দেখতে পেল জয়ের মুখ। সময় পার হয়ে যাচ্ছে। সময়কে পিছনে ফেলে সতত সংকল্পে এগিয়ে চলেছেন এক অহংকারী যোগী তাপস। হাতের ব্যাটে অগ্নিগর্ভ রানের মারমুখী প্রত্যাশায় ভিশ সেদিন যেন রানের নেশায় ক্ষেপে উঠেছিলেন। উইকেটের চারদিকে নির্মম চিত্তে ব্যাট চালিয়ে দ্রুত গতিতে ঘড়ির কাঁটাকে অনেকটা পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন বিশ্বনাথ। এই সময় তাঁর হাতের ব্যাট থেকে যে কটি নিখুঁত মার আপন দীপ্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল, তা ছিল ধ্রুপদী শিল্প-নৈপুণ্যমণ্ডিত অনুপম রূপগরিমায় ভরপুর। বিশেষ ভাবে হোল্ডিং—যিনি বাম্পারের নৃশংস আঘাতে ভীতির সঞ্চার করেছিলেন, সেই তাকেই ভিশ নিখুঁত সাবলীল ভঙ্গিমায় এমন রাজসিক শৌর্যে প্রহার করলেন যা প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়ে উঠেছিলেন সকলে। ভিশের সেদিনের ব্যাটিংএর রূপমহিমা প্রত্যক্ষ করে সানি বললেন—"There were two shots Vish played off Holding which I can never forget. Even as the ball rose outside the off-stamp, Vish got up on his toes and square cut them for four in a manner that will remain etched in memory."

শুধু এই পর্যন্ত বলেই সানি কিন্তু থমকে গেলেন না, দ্বিগুণ অনুভূতি বর্ষিত আবেগে বললেন—"If I could see those shots on film. I'd keep seeing them again and again."

সত্যি একথা ঠিক সেদিন ভিশ যে ব্যাটিংয়ের প্রমাণ দিয়েছিলেন তা ছিল একটি নিখুঁত ক্লাসিকাল কাব্যের অনুরূপ। জয়ের পথে ভারত এগিয়ে গেল দেখতে দেখতে। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানিয়ে রাখি, ঠিক এমনি একটি খেলায় ১৯৪৮ সালে লিডসের বুকে অনন্যসাধারণ ব্যাটিং-এর নজির রেখেছিলেন ডন ব্র্যাডম্যান, এই ম্যাচে ডন ও মরিসের দ্বৈত ক্রীড়া ধারায় অস্ট্রেলিয়া পেয়েছিল ৩০১ রান। ডন করলেন ১৭৩, মরিস ১৮২। শেষ পর্যন্ত ৩ উইকেটে ৪০৪ রান তুলে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল একটি গৌরবদীপ্ত জয়ের মহান গরিমা।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটলো আবার।

ভারত জিতলো।

জয় তখনও বেশ কিছুটা দূরে। জুমাদিনের বলে ব্যাট ছুঁয়ে দ্রুত টুকরো রান কুড়াতে গিয়ে অমরনাথের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির ফলে রান আউট হলেন ভিশ। তাঁর আউটের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি যে ভিশ উইকেট ছাড়তে পারেন। আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ে তখন তিনি ভরপুর। দলের সেই চরম মুহূর্তে ব্যাট করতে এলেন ব্রিজেস প্যাটেল। তাঁর ব্যাটও এই দিন কোন মুহূর্তের জন্য থেমে ছিল না। উইকেটের চারপাশে তিনিও ঠ্যাঙালেন বেপরোয়া। অমরনাথ তখন সেনচুরির জন্য অস্থির। এই অবস্থায় তাঁর ব্যাট কিছুটা থমকে গেল স্নায়ুর চাপে। তিনিও খানিক বাদে ফিরলেন রান আউট হয়ে। তাঁর বিদায়ের পর মদনলাল নামলেন ব্যাট করতে, এই সময় জয়ের ব্যবধান মাত্র ১৫ রানের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় ভারতকে ডাকছে।

এই রান উঠতে সময় নিলো না বেশীক্ষণ। প্যাটেল চমৎকার মারলেন জুমাদিন আর প্যাডমোরকে। রান বাড়লো। শেষ মুহূর্তে

ছোট্ট একটা রান সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে স্বুবর্ণ রঞ্জিত জয়ের গরিমা এনে ধরা দিল ভারতের হাতে।

ভারত জিতলো—জিতলো ছ উইকেটে। এই ম্যাচ জেতার পিছনে ছিল ভারতীয় ব্যাটধারীদের একান্ত দুর্দমনীয় আন্তরিক প্রচেষ্টা। বিগত জয়ের ক্ষেত্রে চন্দ্র ও প্রসন্নর বোলিং যে সম্মানকে দ্বিখণ্ডিত করে জয়-গৌরবকে নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, সেই খণ্ডিত জয়গৌরবের কোন আধা স্থর এবার ধ্বনিত হয়নি ভারতীয় ব্যাটধারীদের রমণীয় ব্যাটিং গরিমায়। বরং এই ঐতিহাসিক জয়ের সবটুকু নির্যাস গ্রহণ করলেন তাঁরাই এবং সেই সঙ্গে এই জয়ের পথিকৃত হিসাবে স্বীকৃত হলেন ভিশ। বিদেশী সাংবাদিকের দল একবাক্যে স্বীকার করে বললেন, ভারতীয়দের জয়ের মূল সোপান গড়ার মূলে ছিলেন খুদে শিল্পী বিশ্বনাথ। যদি তিনি তাঁর অত্মপ্রত্যয় এবং মানসিক দৃঢ়তাসম্পন্ন এমন একটি অনমনীয় ইনিংস রচনা করতে না পারতেন, তাহলে ভারতীয় ক্রিকেট কখনই জয়ের প্রত্যাশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতো না।

ভারতীয় ক্রিকেটের এই ঐতিহাসিক জয়ের দিনকয়েক বাদে সাবিনা পার্কে আবার অনুষ্ঠিত হলো এই মরশুমের শেষ ম্যাচের আসর। ২১শে এপ্রিল শুরু হলো চতুর্থ ও শেষ টেস্ট ম্যাচের খেলা।

এই ম্যাচে পরাজয়ের যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত লয়েড তাঁর বোমারু বাহিনী দিয়ে লাল বলের অবিরাম বাম্পার বর্ষণে ক্ষতবিক্ষত করে তুললেন সুন্দর ক্রিকেটকে। বাম্পারে বাম্পারে ছয়লাপ হয়ে উঠলো সাবিনা পার্কের ক্রিকেট। হোল্ডিং, ডানিয়েল, জুলিয়েনের সঙ্গে হোলডারের মিশ্রিত আক্রমণে ভারতীয়দের ব্যাট হাতে উইকেটে দাঁড়ানো হয়ে উঠলো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তবু এই লাল বলের অগ্নিগর্ভ আক্রমণের বিরুদ্ধে জীবন বিপন্ন করে শক্ত হাতে ব্যাট ধরলেন গাভাসকার ও অংশুমান। আঘাতে আঘাতে অংশুমান হলেন বিধ্বস্ত। গাভাসকার অভিজ্ঞ—তিনি ঠিক সময় ঠিক বলকে উপযুক্ত সাধন প্রয়াসে খেলতে লাগলেন। রান বাড়তে লাগলো। প্রথম উইকেটের জুটি, মারমুখী আক্রমণ সত্ত্বেও

সমস্ত প্রতিরোধকে অস্বীকার করেও রান টেনে নিয়ে গেলেন ১৩৬ পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত গাভাসকার আউট হলেন ৬৬ রান করে। অমরনাথ ভালই খেলছিলেন। অংশুমানের সঙ্গে ব্যাট হাতে নিয়ে মহীন্দর বেশ কয়েকটি চোখ জুড়ানো স্ট্রোক করলেন।

অংশুমান—ব্যাট ধরে রাখলেন সোজাভাবে। তাঁর স্ট্রোকের মধ্যে কোন ঝুঁকি নেই। এই অবস্থায় হোলডার বেশ কয়েক বার অবাধ স্বাধীনতায় বাম্পার ছুঁড়লেন অংশুমানের শরীর লক্ষ্য করে। ভারতীয় খেলোয়াড়েরা প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও আম্পায়ার গোসেন বা সাঙ্ হিউ কেউই মুখ খুললেন না। দর্শকেরাও আনন্দ পাচ্ছিলেন এই ধরনের পৈশাচিক নির্যাতন লক্ষ্য করে। নিজস্ব ৮১ রানের মাথায় আহত হলেন অংশুমান। খানিক বাদে হাতে চোট খেয়ে ক্যাচ আউট হয়ে ফিরলেন বিশ্বনাথ। প্যাটেলের মুখে এসে আঘাত করলো ডানিয়েলের ভয়াবহ বাম্পার। ছ' ফুট লম্বা বলবাজেরা এই সময় একযোগে যে আক্রমণ শুরু করেছিলেন, তা প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠলেন ভারতীয় অধিনায়ক বেদী। তিনি বেশ পরিষ্কার বুঝলেন এই ধরনের উইকেটে শরীর বাঁচিয়ে সত্যিকার ক্রিকেট খেলা সম্ভব নয়—তাই ছটি উইকেট পড়ে যাওয়া মাত্র দলের দান ছেড়ে দিলেন।

আঘাত জর্জরিত ভারতীয় তাঁবুতে সেদিন এমন একজনও খেলোয়াড় ছিলেন না যাদের বদলী হিসাবে মাঠে নামানো যায়। তবু ভারতীয় বোলারেরা চেষ্টা করলেন সাধ্যমতো। ফ্রেডরিক্স, রো, কালীচরণ, রিচার্ডের বিদায়ের পরই ক্যারিবিয়ান ইনিংসের দান গেল বদলে। ২১৭ রানে জুলিয়েনকে চন্দ্রশেখর বোল্ড করা মাত্র ভারতীয় দল গুছিয়ে ওঠার চেষ্টা করলো। কিন্তু এই অবস্থায় চমৎকার ভাবে দলের হাল ধরেন হোলডিং ও হোলডার। ভারতীয় স্পিন বোলারদের এই দুই ব্যাটধারী ভীমবিক্রমে যথেচ্ছাচার পেটাতে লাগলেন। বল মাঠের চার পাশে দপিতব্যাটের ঘা খেয়ে প্রাণবেগে ছুটতে লাগলো। রান যেখানে ছিল ৬ উইকেটে ২১৭, সেই রান উঠলো ৩২৪। শেষ পর্যন্ত বেদীর

ঝোলানো বলে লম্বা মার মারতে গিয়ে ক্যাচ আউট হলেন হোল্ডিং। এই আউটের কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যারিবিয়ান দল দান শেষ করলো ৩৯১ রানে। এই ইনিংসে চমকপ্রদ বোলিং করলেন চন্দ্রশেখর। তিনি ৪২ ওভারে ১৫৩ রানে পেলেন ৫টি উইকেট।

দ্বিতীয় দফায় ভারতীয় ব্যাটধারীরা কেউই শিরদাঁড়া সোজা রেখে উইকেটে দাঁড়াতে পারলেন না। একে দলের নির্ভরশীল খেলোয়াড়েরা আহত, তারওপর আবার শুরুর মুখেই বিদায়নিলেন সানি। হোল্ডিংয়ের পিচ ঠোকা বল মুখ সমান লাফালে, নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে ক্যাচ আউট হলেন গাভাসকার। একমাত্র এই ম্যাচে মহীন্দর অমরনাথ ও বেঙ্কসারকার ছাড়া আর কেউ দাঁড়াতে পারলেন না। ভিশ, প্যাটেল অংশুমান আহত। অতএব ভারতীয় দলপতি নিশ্চিত পরাজয় বুঝেই সহজভাবে পাঁচটি উইকেটের পতনের পর দান ছেড়ে দিলেন। মাত্র ৯৭ রানে পাঁচটি উইকেট পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বেদীর বদান্যতায় ম্যাচ জিতলেন লয়েড। শেষ ম্যাচে বাম্পার বিধ্বস্ত ভারতীয় দল দান অসম্পূর্ণ রাখার সুবাদে সিরিজ জিতে গেলেন লয়েডর দল।

এই মরশুমে চারটি ম্যাচে মোট ৬টি ইনিংস খেলে বিশ্বনাথ করলেন ২৫৫ রান, যার গড় ছিল ৪২·৫০।

* * *

ভারতীয় ক্রিকেটে বিশ্বনাথ এক অনন্য প্রতিভা। যে প্রতিভার রঞ্জিত বর্ণালী প্রভায় আজকের ক্রিকেট সমুজ্জ্বলিত। বিশ্বনাথ শিল্পী—সাধক-শিল্পী। তাঁর শিল্পিক ক্রিড়াবিন্যাসের মধ্যে নেই যেমন কোন জড়তা, তেমনি নেই আত্মগরিমার অহংকারিত দাপট। বৈরাগ্যের উদাসীনতা নিয়ে সার্থক শিল্পী তাঁর ক্রিকেটজীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তাই তাঁর ক্রিকেটের মধ্যে যেমন নেই মস্ত রান গড়ার স্পৃহা, তেমনি নেই আত্মপ্রচারের মহিমা মোহ। তাঁর হৃদয়গভীরের আন্তরিক একটা শিল্পীমন সকল সময় উন্মুখ হয়ে থাকে শিল্পসুলভ একটি ধ্রুপদী ইনিংস গড়ার বাসনায়—মোহহীন, যা ক্লাসিক শিল্পের কাছে নির্বিকল্প সাধনা।

সাধনসিদ্ধ ভিশের ব্যাট ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে সকল সময়ের জন্য কল্যাণধর্মী। উইকেটে ভিশ যতক্ষণ, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত ভারতীয় ক্রিকেট, ক্রিকেট মর্যাদা। ভিশ প্রসঙ্গে এহেন মন্তব্য যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ তিনি বহুবার দিয়েছেন। তাঁর হাতের ব্যাট ক্রিকেটের রণভূমে ঝলসে উঠেছে বহুবার। রাজসিক সেই দাপটে খানখান হয়ে গুড়িয়ে গেছে বাঘা-বাঘা বোলারদের কৌলিন্য।

ভিশের সঙ্গে সানির তুলনা অনেকেই করেছেন, অনেকেই অনেক-ভাবে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করে বোঝাতে চেয়েছেন একের চাইতে অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু সত্যি বলতে কি—এই ধরনের তুলনা-মূলক ক্রিকেট বৈশিষ্ট্য বিচার করা কখনই সম্ভব নয়। এর কারণ হলো, দুই ব্যাটধারী জাত বিচারে ভিন্নতর। একজনের সঙ্গে অন্যজনের বৈশিষ্ট্য অনেক আলাদা। এই প্রসঙ্গে একজন সাংবাদিক তাঁর এক ইংরিজি নিবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"For the truth is that, with Viswanath, batting is an art while, with Gavaskar it is a seience. The one is an artist, the other a craftman. The one remains an amateur at heart, other is a professional to the core. The one needs a challenge to drow the best out of him, the other has tempered his style to see that no such challenge develops if he can help it."

উপরোক্ত উক্তিটি মনে হয় উভয় ব্যাটধারীর পার্থক্য বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট।

ক্রিকেটের রান সংগ্রহের ব্যাপক গরিমা বিশ্বনাথের মধ্যে নেই। তাঁর সংগ্রহশালায় এমন কোন রান-অঙ্ক জমা পড়েনি, যা দিয়ে আমরা তাঁকে একজন দুরন্ত রানপিপাসু ব্যাটধারী বলতে পারি। ব্যারি রিচার্ড, ভিভ্ রিচার্ড বা সানি গাভাসকার প্রমুখ ব্যাধারীদের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি সচেতন রান গরিমা। তাই তাঁদের ব্যাটে যেমন আছে

প্রয়োজনে সর্তকতার সংকেত, তেমনি আছে ব্যক্তিগত রেকর্ড স্থষ্টির ঐকান্তিক প্রবণতা। এঁদের এই সচেতন উদ্যত গরিমাদীপ্ত রাজসিক দাপটের সঙ্গে তাই কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না ভিশের ব্যাটিং পদ্ধতির। ভিশ তাঁদের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ভিশ যেমন ব্যক্তিগত গরিমা রচনা ব্যাপারে উদাসীন, তেমনি দ্বিগুণ দরদী শিল্পস্থষ্টির ঐকান্তিক প্রয়াসে। তাঁর ব্যাটিংয়ের কাব্যময় রূপ-রেখার সঙ্গে প্রায়ই অমিল দেখা যায় অন্য ব্যাটধারীদের।

সাধক-শিল্পী ভিশ ক্রিকেটের দেবতার কাছে যেন বারংবার প্রার্থনা করেছেন তাঁর প্রসাদ মহিমার চিত্রকলা। ক্রিকেটের দেবতার আশীর্বাদে তাই তাঁর হাতের ব্যাট রূপান্তরিত হয়েছে জন্মশিল্পীর সার্থকতায়। ফুটে উঠেছে রঙ্-তুলির রূপকল্প। ব্যাটের মূর্ছনায় মূর্ছিত হয়েছে এক অনন্য শিল্পের ধ্রুপদী মুন্সীয়ানা। উইকেটের চার-দিকে ছড়িয়ে আছে ভিশের চিত্তাকর্ষক রূপগরিমার অনুপম সৌন্দর্য-দ্যুতি, যা প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছেন একালের ক্রিকেটপ্রিয় মানুষ।

১৯৭৬।

নিউজিল্যাণ্ড দল এলো ভারতে।

১০ই নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত বোম্বাই টেস্টে ভারতীয় দল বেদীর নেতৃত্বে জয়লাভ করলো এই ম্যাচ। ভারত জিতলো—জিতলো ১৬২ রানে। বোম্বাইয়ের এই টেস্টে ভিশ নিজেকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এই ম্যাচে সানি করলেন সেনচুরি। ভারতীয় দল করলো ৩৯৯ রান। ভারতেরএই রানের সামনে নিউজিল্যাণ্ড খুব একটা খারাপ খেললো না। বিশেষ করে পারকার ও টারনারের জুটিতে রান পেল নিউজিল্যাণ্ড দল। প্রথম উইকেট পড়েছিল ৩৭ রানে। এরপর টারনার আউট হলেন ১৪৩ রানের মাথায়। জে. এম. পারকার ধরলেন দলের হাল। ভারতীয় স্পিন বোলারদের দাপটকে হেলায় প্রত্যাখ্যান

করে পারকার পূরণ করলেন নিজস্ব ১০৪ রান। এই সময় টারনারের বিদায়ের পর বার্জেস ব্যাটিংয়ের ব্যাপারে কিছুটা মন দিয়েছিলেন। তিনি ফিরলেন শেষ অবধি ২২৮ রানের মাথায়। এই উইকেট পতনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গোটা দল একেবারে ধ্বস নামার মতো ভেঙে পড়লো। চন্দ্রশেখর তাঁর স্বভাব অনুযায়ী সহসা হয়ে উঠেছিলেন বিপদজনক। মাত্র ৭৭ রানের বিনিময়ে তাঁর সংগ্রহশালায় জমা পড়লো ৪টি উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দল জয়লাভের প্রত্যাশায় একটু বেপরোয়া খেলার চেষ্টা করলেন। দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা খুব একটা সুবিধেজনক হলো না। হেডলীর বলে ব্যাট ছুঁয়ে গাভাসকার নিজস্ব ১৪ রানে হলেন ক্যাচ আউট। ৬২ রানে ফিরলেন অমরনাথ। এই সময় ভারতীয় দলকে শক্ত হাতে নেতৃত্ব দিতে কসুর করলেন না ভিশ। অল্প সময়ের জন্য উইকেটে দাঁড়িয়ে ক্রিকেটের সচল দেবতা কাল্পনিক শিল্পসুষম রেখায় চালাতে লাগলেন হাতের ব্যাট। তাঁর ব্যাটের যাদুস্পর্শে মুহূর্তে ক্রিকেট হয়ে উঠেছিল রমণীয়। নিখুঁত একটি দর্শনীয় ছবির মতো ইনিংস পরিবেশন করে আউট হয়ে ফিরে গেলেন বিশ্বনাথ। এই আউটের পর ব্রিজেশ প্যাটেল বেশ কিছু স্ট্রোকে সতেজ শক্তির পরিচয় দিলেন। ২০২ রানে দান ছেড়ে দিলেন বেদী। শেষ দিকে উইকেট ছিল স্পিন বোলারদের অনুকূলে। অনুকূল উইকেটের বদান্যতায় ভারতীয় ধীরগতিসম্পন্ন বোলারেরা অচিরেই মাত্র ১৪১ রানে গুঁড়িয়ে দিলেন নিউজিল্যাণ্ড ইনিংসটিকে। বেদী চমৎকার বোলিং করে দখল করলেন ২৭ রানে পাঁচটি উইকেট। চন্দ্র ও ভেঙ্কট পেলেন দুটি করে উইকেট। প্রথম ম্যাচে ভারত জিতলো।

১৮ই নভেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচের আসর বসলো কানপুরের গ্রীনপার্কে। কানপুর—ভিশের সৌভাগ্য গরিমার এক অম্লানতীর্থ। এই কানপুরের বুকেই ভারতীয় ক্রিকেটে প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল সার্থক-শিল্পীর। প্রথম দর্শনেই তাঁর রূপলাবণ্যে বিমোহিত হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট

প্রেমিকের দল। আহা—কি রূপ, কি এই রূপমহিমার স্নিগ্ধ-দীপ্তি! দীর্ঘ ব্যবধানের পর আবার সেই রাজকুমার ব্যাট হাতে নামলেন কানপুরে।

টসে জিতে বেদী গ্রহণ করলেন ব্যাট করার প্রথম সুযোগ। শুরুতেই ক্রিকেট হয়ে উঠেছিল বেপরোয়া। গাভাসকার-অংশুমান জুটি শুরু করলেন দাপটের সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যাট চালাতে। সময়ের কাঁটাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল রানের গতি। রান সংগ্রহের ব্যাপারে এইদিন গাভাসকারের তুলনায় অংশুমানের চেষ্টা ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। ৮০ মিনিটে ৭৯ রান করে রান-পিপাসু অংশুমান হেডলির একটি বহির্গামী বলে ব্যাট ছুঁয়ে নিজেই নিজের বিপদকে ডেকে আনলেন।

এরপর মহীন্দর অমরনাথ সহ গাভাসকারের জুটি রানের প্লাবনে টেনে নিয়ে যেতে থাকলেন নিজেদের। বেশ কয়েকটা চিত্তাকর্ষক স্ট্রোক করলেন মহীন্দর। ১০৯ মিনিটে দুই ভারতীয় ব্যাটধারীর যৌথ মার-মুখী প্রচেষ্টায় অচিরেই সংগ্রহ হলো ১৯৩ রান। এরপর মহীন্দর নিজের ৭০ রানের মাথায় অতিরিক্ত মাত্রায় মারমুখী হতে গিয়ে ও' সুলিভানের একটা সোজা বল ফস্কে গিয়ে বোল্ড হয়ে ফিরে গেলেন। সামান্য ব্যবধানে ওই ও' সুলিভানের বলে আবার আউট হলেন গাভাসকার। এরপর জুটি বাঁধলেন ভিশের সঙ্গে অশোক মানকাদ। নিউজিল্যাণ্ড বোলারদের কোনরকম সমীহ না করে ভিশ এইদিন নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করলেন শুরুতেই। তাঁর অনবদ্য কাব্যিক রস মদিরতায় ভরপুর স্কোয়ার কাট ছিল দেখার মতো। ঘন ঘন বোলার বদল করেও ভিশ ও অশোক মানকাদকে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ করতে পারলেন না টারনার। শেষ অবধি ৫৯০ মিনিট ব্যাট করে ভারতীয় দল গড়ে তুললো ৯ উইকেটে ৫২৪ রানের একটি মস্ত ইনিংস। বিশ্বনাথের ছাঁচে ঢালা ইনিংসটির সমাপ্তি ঘটলো ৬৮ রানে। রবার্টসের একটা নিচু বলে লেগ বিফোর হয়ে ফিরে এলেন বিশ্বনাথ।

ভারতের এই মস্ত রানের সামনে নিউজিল্যাণ্ড ব্যাটধারীরা শক্ত হাতে ব্যাট ধরতে পারলেন না। একমাত্র টারনার তাঁর কৌলীন্য বজায় রেখে কিছুটা অনমনীয় মনের পরিচয় দিলেও তাঁকে সহযোগিতা করার মতো কেউই প্রায় ছিলেন না বলা যায়। একমাত্র তাঁর মানসিক দৃঢ়তার ফলে নিউজিল্যাণ্ড সংগ্রহ করলো ২৬৫ রান। টারনার করলেন ১১৩ রান। তাঁর এই অমর ইনিংসটি আরো দীর্ঘতর হতে পারতো, যদি না তাঁর নিচু ক্যাচটিকে শেষ মুহূর্তে নিজের হাতে ভিশ না তুলে নিতে পারতেন। ২১৮ মিনিটে ১৮৮টি বল খেলে টারনার তাঁর অধিনায়কোচিত ইনিংসটির সমাপ্তি টানতে বাধ্য হলেন।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসটি, অবশ্যই ভিশের তৈরী একটি দুর্লভ ইনিংসের মধ্যে অন্যতম বলতে আমাদের কোন বাধা নেই। এইদিন গ্রীনপার্ক কানপুরে ভিশ তাঁর সমস্ত ঐশ্বরিক শক্তিকে প্রকাশ করলেন একে একে। দরদী শিল্পীমনের ঐকান্তিক শিল্পনিষ্ঠার অনুপম স্নিগ্ধতা সমগ্র গ্রীনপার্ককে সেদিন মোহমুগ্ধ করে রেখেছিল। এর আগে এই মাঠেই, ভিশ রচনা করেছিলেন তাঁর ক্রিকেট শৈলীর এক সৌন্দর্য-দীপ্ত বীরোচিত কাহিনী—এবার হলো এই কাহিনীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ রচনা।

ভিশের এই ইনিংসটির সম্পর্কে একটা কথা বলা যায় যে শুরুতেই তাঁকে আমরা সহজ সাবলীল হয়ে উঠতে দেখেছি। তাঁর মধ্যে ছিল না কোন জড়তা, ছিল না কোন অস্বস্তির স্পর্শ। যেমন সহজভাবে তিনি শুরু করেছিলেন, ঠিক তেমনি সহজভাবে সমাপন করে গেলেন নিজের আরাধ্য কর্তব্য। কাল্পনিক পটভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে যেমন একটি নির্মল ইনিংস গড়ার চেষ্টা সকলে করেন, সেই সাধন-কল্পনাকে অতি সহজে অনুপম ব্যাটিংয়ের শুচিশুভ্রতায় প্রকাশ করে-ছিলেন ভিশ। উইকেটের চারপাশে 'লিট্‌ল মাস্টার' চক্রাকারে চালিয়ে ছিলেন তাঁর হাতের ব্যাট, যার বর্ণচ্ছটায় গ্রীনপার্কের বুকে রচিত হয়েছিল হোমার ক্লাসিকতায় একটি সুন্দর ইনিংস। দেখে মনে হয় না,

একজন ব্যাটধারীর হাতের ব্যাট এমন একটি সুন্দর ইনিংস গড়েছে। রূপে, গন্ধে, ঐশ্বর্যে, অনুভবে ভিশের এই ইনিংসটির মধ্যে ছিল কাব্য-সুলভ রসবিন্যাস। দিনের শেষ ওভারের পঞ্চম বলে ১৪৭ মিনিটে ভিশ পূরণ করলেন নিজস্ব শতরান।

ভিশের শতরান পূরণ হওয়া মাত্র পঞ্চম দিনের শুরুতেই ২০৮ রানে দান ছেড়ে দিলেন বেদী। ম্যাচ জেতার প্রত্যাশায় তখন ভারতীয় খেলোয়াড়েরা তৈরী। অসাধারণ বোলিং করলেন বেদী, ভেঙ্কটরাঘবন ও চন্দ্রশেখর। একের পর এক উইকেটের পতন ঘটিয়েও তাঁরা দুর্ভাগ্যবশত শেষ পর্যন্ত প্রচেষ্টা সফল করতে পারলেন না। চরম বিপদের মধ্যে লীস ও'সুলিভান দাঁতে দাঁত চেপে ব্যাট ধরে রাখলেন। তাঁদের অনমনীয় দৃঢ়তার ফলে হারের মুখ থেকে মান বাঁচালো নিউজিল্যাণ্ড।

এরপর তৃতীয় টেস্ট।

মাদ্রাজের চীপক মাঠে খেলা শুরু হওয়ার আগেই ক্রিকেটকে মোকাবিলা করতে হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে। বৃষ্টি আর বৃষ্টি।

বৃষ্টি শুরু হয়েছিল দুদিন আগে থেকেই। চীপকের ভিজে উইকেটে ক্রিকেট যে কোন্ পর্যায়ে পৌঁছবে তা বহু আগেই অনুমান করে নিয়েছিলেন পাকা ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের দল। এইদিন মোট ৪ ঘণ্টা ২০ মিনিট খেলা হওয়ার পর শেষ দিকে চল্লিশ মিনিট ক্রিকেট বাতিল হয়েছিল বৃষ্টির সুবাদে।

বেদী সৌভাগ্যবান।

টসে জিতলেন।

ভিজে উইকেটে ভারতীয় ব্যাটধারীরা পরিচয় দিলেন নিজেদের দক্ষতা। সানি—যাঁর ওপর ভারতীয় ক্রিকেট অনুরাগীদের আন্তরিক ভরসা, সেই তিনি বিদায় নিলেন মাত্র দু রান করে।

চরম এক বিপর্যয়ের চিত্র।

অংশুমান ফিরছেন শূন্য রানে।

গাভাসকার দুই। তৃতীয় উইকেটে মহীন্দর ফিরলেন ৬০ রানের

মাথায়। উইকেটের চরিত্র তখন হয়ে উঠেছে বিপদজনক। এই অবস্থায় দলীয় সংকটে ব্যাট হাতে বেরিয়ে এলেন খুদে ব্যাটধারী বিশ্বনাথ, ভারতীয় ক্রিকেটের চিরকালের ত্রাণকর্তা অর্জুন।

উইকেটে ভিশ প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বদলে গেল চীপকের দৃশ্যপট। কালো মেঘের আস্তারণ সরে গিয়ে ফুটে উঠলো আশার আলো। চমৎকার কায়দায় জাগ্রত-শিল্পী তাঁর হাতের অনুপম যন্ত্রের সুরবাহারে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন আন্তরিক হৃদয়-ঐশ্বর্য। যেন এমন ভাব ঃ "ওহে ভারতীয় ক্রিকেট-প্রেমিকের দল, তোমরা আশ্বস্ত হও—আমি এসেছি। আমি তোমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়ী ত্রাণকর্তা। তাকিয়ে দেখ আমাকে তোমরা চেন কিনা। আমি যে তোমাদের সেই মানুষ—সেই আপনার লোক।"

ক্রিকেটের সমস্ত ঐশ্বর্য ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে ভিজে উইকেটে কম্পাস মাপা ব্যাটিং শুরু করলেন বিশ্বনাথ। তাঁর রূপচর্চিত ব্যাটের রাজসিক ঝংকারে মুহূর্তে মুখরিত হয়ে উঠলো চীপক। ভিজে উইকেটে খানিক আগে যে হেডলী, কোয়ারনস, রবার্টস, পেথেরিক, ও'সুলিভান মারাত্মক রুদ্র মুক্তি ধারণ করেছিলেন, সেই রূপময় রুদ্রতার মুখোশ অচিরেই খসে গেল ভিশের অনমনীয় দাপটের মহিমায়। বিশ্বনাথ উইকেটে এসে একবারে কোণঠাসা করে দিলেন হেডলীকে। চমৎকার ভাবে করলেন অনড্রাইভ। রবার্টসের বল তাঁর ব্যাটের ঘা খেয়ে আছড়ে পড়লো বাউনডারি সীমানায়। এই দিন ভিশ ভিজে উইকেটে ক্রিকেটের প্রতিটি দুরূহ দুর্লভ শর্টকে অতি সহজে প্রয়োগ করে প্রমাণ করেছিলেন নিজের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য। তাঁর হাতের ব্যাট যেন কথা বলছিল সেদিন। সুললিত সেই ব্যাটিং-এর মধ্যে ছিল আপন মোহময় গরিমার শিল্পবিন্যাস। আমায় দেখ, আমায় চেন, আমায় লক্ষ্য কর—এই মনোভাব নিয়েই যেন সেদিন বিশ্বনাথ নিজেকে মুহুর্মুহু রঙ বদলের নেশায় আত্মস্থ হয়েছিলেন।

এই রূপ যাঁরা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা ভাগ্যবান—ভাগ্যবান

এই কারণেই বলছি, একজন ব্যাটধারীর মধ্যে যে এত সুসজ্জিত রূপকল্পনা থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। দিনের শেষে ৮২ রান করে বৃষ্টির তাড়নায় ক্রিকেট ভণ্ডুল হওয়ায় তিনি প্যাভেলিয়ানে ফিরে এলেন। পরের দিন সকালে উদাসী শিল্পী আপন একতারায় বৈরাগ্যের সুর তুলে, সেনচুরির প্রলুব্ধ মোহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ৮৭ রানে ফিরে এলেন প্যাভেলিয়ানে।

গোটা মাঠ শিউরে উঠেছিল।

সবাই আশা করেছিলেন এই ইনিংসে ভিশ অবলীলায় পূরণ করবেন নিজস্ব শত রান। কিন্তু প্রত্যাশা সফল হলো না। শিল্পী তাঁর শিল্পমনের উদাসীনতায়, মোহলব্ধ গরিমার প্রত্যাশা না করে আপন হৃদয়ের ছন্দপতন ঘটিয়ে স্বইচ্ছায় ছেড়ে গেলেন প্রত্যাশিত সাজানো শিল্পভূমি। মাত্র ১৩ রানের জন্য সেনচুরি বঞ্চিত বিশ্বনাথ ফিরছেন প্যাভেলিয়ানে। এই ফিরে যাওয়ায় কোন শোক নেই, মায়া নেই, দুঃখ নেই, বেদনা নেই—যা আছে তা হলো শিল্পীমনের শাশ্বত-হৃদয় পরশ। ভিশের প্রাণশক্তির ছোঁয়ায় ভারতীয় দল শেষ মুহূর্তে বিপর্যয় কাটিয়ে ভিজে উইকেটে রান তুললো ২৯৮। এরপর নিউজিল্যাণ্ড দলের পালা। মাদ্রাজের ভিজে উইকেটে ভারতীয় বোলারেরা বল ঘোরাতে লাগলেন লাট্টুর মতো। এই ঘূর্ণিমান বলের বিরুদ্ধে ব্যাট করা হয়ে উঠলো কষ্টসাধ্য। তবু টারনার লড়লেন। লড়াই করলেন বার্জেস। ভারতীয় স্পিন বোলিংয়ের আনন্দ সুন্দর রূপগরিমায় শেষ পর্যন্ত ১৪০ রানে ইনিংস ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন নিউজিল্যাণ্ড দল। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটধারীরা সহজ ভাবে খেললেন। রান এলো ৫ উইকেটের বিনিময়ে ২০৫। শেষ দিনে মাত্র কিছুক্ষণ ব্যাট করে ভারতীয় দলনায়ক ২০৯ রানে দান ছেড়ে দিলেন টারনারের হাতে।

শুরু হলো ব্যাট বলের দুরন্ত লড়াই।

চীপকের উইকেটে ভারতীয় স্পিন বোলারদের ঘূর্ণিমান বলের সামনে নিউজিল্যাণ্ড ব্যাটধারীরা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

বিশেষ করে এই ধরনের স্যাঁত সেঁতে উইকেটে চন্দ্রশেখর হয়ে উঠলেন বিপদজনক, সেই সঙ্গে বেদীর লেংথ মাপা বল খেলা হয়ে উঠলো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রাণপণ লড়াই করেও মাদ্রাজের উইকেটে মান বাঁচাতে পারলেন না টারনার। ১৪৩ রানে ভেঙ্কটরাঘবন শেষ উইকেটটি দখল করা মাত্র ভারত ম্যাচ জিতে গেল।

ইংল্যাণ্ড আবার এলো

নিউজিল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল মোটের ওপর খারাপ খেললো না। সিরিজ জিতলেন বেদী। এবার ইংল্যাণ্ড। মাত্র কয়েক সপ্তাহের পালা চুকিয়ে ভারতীয় দলকে এবার মোকাবিলা করতে হলো ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে। টনি গ্রেগের নেতৃত্বে এবার যে দলটি ভারতে এসেছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন তরুণ খেলোয়াড়। তারুণ্যে ভরপুর এই ইংল্যাণ্ড দলটি শুরুতেই আরম্ভ করলো চমকপ্রদ ক্রিকেট। বিশেষ করে এই দলটির বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের গুণগত প্রাধান্য ছিল অনেক বেশী। এই সফরে ভারতীয় দল কোমর সোজা রেখে লড়াই করতে পারলো না। বিশেষ করে এই সফরে ব্যর্থতার চূড়ান্ত নজির রচনা করলেন ভারতীয় ব্যাটধারীর দল। গোটা সিরিজে সেনচুরি এলো একমাত্র শেষ ম্যাচে গাভাসকারের ব্যাট থেকে। ভিশ পাঁচটি টেস্টে দশটি ইনিংস খেলে সর্বসাকুল্যে রান সংগ্রহ করলো ১৭৫টি। এই রানগুলিও যেন সেদিন ছিল কষ্টার্জিত। একমাত্র একটি ইনিংসে ৭৯ রান ছাড়া ভিশের ব্যাট থেকে বড় ধরনের কোন রান এলো না। এই সফরে ইংল্যাণ্ডের পেশম্যানেরা আবার নতুন করে প্রমাণ করলেন লাল বলের গতির কাছে ভারতীয় ব্যাটধারীদের ঐতিহ্যময় দুর্বলতা। নতুন বোলার হিসাবে সাফল্য লাভ করলেন

উইলিস ও লিভার। বিশেষ করে লিভার-ভীতি ভারতীয় ব্যাটধারীদের যথেষ্ট বিপাকে ফেলেছিল। দিল্লীর ম্যাচে লিভার সংগ্রহ করলেন ৪৬ রানে ৬টি উইকেট। পরে মাদ্রাজ ও কলকাতায় পেলেন যথাক্রমে ৫ উইকেট ৫৯ রানে এবং ৬ উইকেট ৬৩ রানে। ভারতীয় দল এই সফরে পরিচিত মাদ্রাজ উইকেটে ব্যর্থ হলো সব চেয়ে বেশী। মোট ৮১ রানে দান শেষ হয়ে গেল বৃটিশ বলবাজদের অগ্নিগর্ভ দাপটে। এর আগে এত কম রানে নিজেদের মাঠে ভারতীয় দলকে আউট হতে দেখা যায়নি। ভারতীয় ক্রিকেটের এই নির্মম ব্যর্থতার মধ্যে এই মরশুমে একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো যজুবেন্দ্র সিংয়ের ক্যাচ ধরার রেকর্ড। জীবনের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে তিনি ভিকটর রিচার্ডসনের মতো এক ইনিংসে ধরলেন পাঁচ পাঁচটি ক্যাচ। ব্যাঙ্গালোর ম্যাচে যজুবেন্দ্র মোট সাতটি ক্যাচ ধরে নিজেকে যুক্ত করলেন গ্রেগ চ্যাপলের সঙ্গে।

টনি গ্রেগ সিরিজ জিতলেন।

নিউজিল্যাণ্ড দলকে হারিয়ে ভারতীয় দল যে আত্মতুষ্টির মোহে নিজেদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন, তা এবার কাটলো। ভারতীয় কর্মকর্তার দল নতুন করে চিন্তায় বসলেন। প্রশ্ন এলো অনেকের মনে বিশ্বনাথ প্রসঙ্গে। এই সফরে ভিশ ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি যেন কিছুতেই নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন না। সাধকশিল্পী তাঁর সাধনায় বারবার হচ্ছেন তপোভঙ্গ। তবে কি ভিশ ফুরিয়ে গেছেন ?

প্রশ্ন আর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর এলো পরবর্তী পর্যায়ে।

ইংল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে ভাল রান না পাওয়ায়, আমার আত্মবিশ্বাস কমে গিয়েছিল। বারবার প্রশ্ন করেছি নিজেকে—"ভিশ তুমি কি সত্যিই ফুরিয়ে গেছ ?"

বুকের গভীর থেকে ভেসে আসা উত্তর আমাকে বলেছে ; 'ঠিক নয়—তুমি আজও আছ—আছ সেই ভিশ হয়েই।'

মাঝে মাঝে জীবনের কাছে এই ধরনের নৈরাশ্য আসে। এই নৈরাশ্যের প্রয়োজনও আছে। নিজেকে চেনার জন্য, জানার জন্য, বোঝার জন্য দরকার হয় এই সাময়িক নৈরাশ্যের—এই হৃদয়দৈন্যতার মধ্যে নিজেকে যে ধরে রাখতে পারে, সেই খুঁজে পায় আবার নিজেকে নতুন করে—এর নামই পুনরুত্থান।

ভিশের ক্রিকেট জীবনের পুনরুত্থানের কথায় ফিরে আসি। ১৯৭৭ সাল।

ভারত চললো অস্ট্রেলিয়া সফরে। এই সফর শুরু হওয়ার আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে ঘিরে দেখা গেল এক মহা-সমস্যা। ক্রিকেটের নির্মল আকাশে উদিত হলো 'প্যাকার' নামক এক ভয়াবহ ধূমকেতু। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সঙ্গে 'প্যাকার-ক্রিকেটে'র সম্মুখ সমরের ফল হলো সুদূরপ্রসারী। অস্ট্রেলিয়ার ধনকুবের প্যাকার পৃথিবীর প্রায় সব কটি দেশ থেকে নামীদামী ক্রিকেটারদের কিনে নিলেন চড়া দামে। তাঁদের নিয়ে ক্রিকেট ভূমিতে গড়ে উঠলো 'ওয়ার্লড ক্রিকেট সিরিজ'। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কর্তার দল প্যাকারের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে হুমকি দিয়ে বললেন, যাঁরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বিরোধিতা করবেন, তাঁদের সঙ্গে জাতীয় মর্যাদা রক্ষায় কোন সম্পর্ক রাখা হবে না। ক্রিকেটের এই আন্তর্জলী যাত্রায় একথা ঠিক, এক রকম প্রায় নিঃস্ব হয়েপড়েছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। অস্ট্রেলিয়া দল থেকে একে একে সরে গেলেন নামী খেলোয়াড়েরা। একমাত্র টমসন ছাড়া বিশ্বজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলে আর কোন ক্রিকেটারের ছায়াপাত ঘটলো না। ভারত সফরকে কেন্দ্র করে অস্ট্রেলিয় ক্রিকেট এক নয়া চ্যালেঞ্জের ভূমিকায় আবার নতুন করে ডাক দিলেন বর্ষীয়ান ববি সিমসনকে। বিয়াল্লিশ বছর বয়স্ক সিমসন দীর্ঘদিন সরে ছিলেন ক্রিকেট থেকে, তবু তিনি

জাতীয় মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না। অভিজ্ঞ হাতে ধরলেন অস্ট্রেলিয়া দলের হাল। একমাত্র সিমসন ও টমসন ছাড়া এই সফরে অস্ট্রেলিয়া প্রায় একরকম নতুন দল নিয়ে ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলো।

প্যাকার দৌরাত্ম্যের কালো ছায়া তখনও ভারতীয় ক্রিকেটের ভিতকে নাড়া দিতে পারেনি। কাজেই ভারত চললো তাঁদের অভিজ্ঞ দল নিয়ে।

ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কাছে ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ বছর। এই চ্যালেঞ্জ সফরের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অস্ট্রেলিয়া কর্তাব্যক্তিদের সার্বিক সম্মান।

২রা ডিসেম্বর ঐতিহাসিক ব্রিসবেন মাঠে বসলো ভারত অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্টের আসর।

অস্ট্রেলিয়া সফর।

ব্রিসবেনের উইকেটে প্রথম দিন টসে জিতে ববি সিমসন নিলেন ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত।

ব্রিসবেনের উইকেটে প্রথম ব্যাট করে বড় রান তোলার ইচ্ছে সিমসনের থাকলেও, তাঁর সেই মানসিক ইচ্ছা কার্যকারী করা সম্ভব হলো না। চমৎকার বোলিং করলেন ভাবতীয় দলের অধিনায়ক বেদী। মাত্র ২৪ রানে মহীন্দরের বলে হিবারট ১৩ রানে প্যাভেলিয়ানে ফিরে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অস্ট্রেলিয়ার অবস্থা হয়ে উঠলো দুর্বিষহ। বেদীর চমৎকার লেংথ মাপা বলের সামনে কোমর সোজা রেখে কেতাবী ঢঙে ব্যাট ধরে রাখতে পারলেন না অস্ট্রেলিয়া ব্যাটধারীরা। ওগিলভি, সারজেণ্ট, সিমসন, কোজিয়ারের মতো ব্যাটধারীরা প্যাভেলিয়নে ফিরলেন মাত্র ১৯ রানে। দলের এই বিপর্যয়ের মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে ব্যাট ধরলেন পিটার টুহী ও টনিম্যান। উইকেটের চার দিকে এই দুই ব্যাটধারী বেপরোয়া ব্যাট করে দলকে পৌঁছে দিলেন ৯০-

রানের মাথায়। এরপর টনিম্যান মদনলালের বলে আউট হয়ে ফিরে যাওয়া মাত্র গোটা দলটা তাসের ঘরের মতো চোখের পলকে ধসে গেল। ১৬৬ রানে অস্ট্রেলিয়া দলের দান শেষ হওয়া মাত্র ভারতীয় দল কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। এই ম্যাচে বেদীর বোলিং ছিল প্রশংসা করার মতো। তিনি এই ইনিংসে প্রথম বল করতে এসেই প্যাভেলিয়ানে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ওগিলভিকে। মোট ১৩ ওভার বোলিং করে মাত্র ৫৫ রানের বিনিময়ে তিনি পেলেন পাঁচটি উইকেট। বেদীর এই সাফল্যের সুযোগ কিন্তু ভারতীয় ব্যাটধারীরা চূড়ান্ত ভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। শুরুর মুখেই ভারতের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান সানি মাত্র তিন রান করে আউট হলেন ক্লার্কের বলে। সৌভাগ্য ভারতীয় ক্রিকেটের ওই অল্প রানের মধ্যেই হয়ত দিলীপ বেঙ্কসারকারকে তাদের হারাতে হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত টমসনের বলে খোঁচা লাগা গরম ক্যাচটি বয়সের ভারে শ্লথ হয়ে পড়া সিমসনের হাতে লেগে মাটিতে পড়ে যাওয়ার সুবাদে তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। দিলীপ প্রাণে বাঁচলেও পরের দিন সকালে উইকেটে এসেই শূন্য রানে বিদায় নিলেন মহীন্দর অমরনাথ। মাত্র ১৫ রানে দুটি উইকেট পড়ে যাওয়ার পর ব্যাট হাতে মাঠে নামলেন খুদে বিশ্বনাথ। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এই প্রথম ব্যাট করতে নেমে ভিশ প্রমাণ দিলেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে তিনি প্রতিকূল অবস্থায় ব্যাট ধরে রেখে রান সংগ্রহ করতে লাগলেন। টমসনের গতিশীল বলের মোকাবিলায় বেশ কয়েকটি চোস্ত রকমারী মার মারলেন ভিশ। তাঁর ঝলসানো স্কোয়ার কাটের তারিফ করলেন অভিজ্ঞ অস্ট্রেলীয় সাংবাদিকেরা। টমসন, ক্লার্ক, হার্স্ট, টনিম্যানের বলের সামনে ১৬৫ মিনিট দিলীপকে সঙ্গী করে ভিশ দাপটের সঙ্গে দলকে টেনে নিয়ে গেলেন। মধ্যাহ্নভোজনের শেষ বেলায় ভিশের এই বর্ণালী রমণীয় ইনিংসটির পতন ঘটলো। ভিশের বিদায়ের খানিক পরেই ভারতীয় তাঁবুতে শুরু হয়ে গেল শবযাত্রার পর্ব। অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে টমসনের বলে হুক সট নেওয়ার অপরাধে আত্মঘাতী

হয়ে প্যাভেলিয়ানে ফিরলেন দিলীপ। ১৫৩ রানে শেষ হয়ে গেল ভারতীয় ইনিংস।

দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ানদের গোড়াপত্তন খুব একটা সুবিধের হলো না। স্কোরবোর্ডে কোন রান ওঠার আগেই মদনলালের নিচু বল মারতে গিয়ে ক্যাচ আউট হলেন কোজিয়ার। ছ রানের মাথায় আবার মদনলালের একটা নিচু বল আঘাত হানলো। এবার এল. বি. ডাবলু. হয়ে ফিরলেন হিবারট। এরপর একটি রান যোগ করে মহীন্দরের বলে শূন্য হাতে ফিরলেন সারজেন্ট। দলের বিপর্যয়ের মধ্যে শক্ত হাতে ব্যাট ধরলেন বর্ষীয়ান দলপতি ববি সিমসন। ভারতীয় বোলারদের তিনি অভিজ্ঞতায় দেখেশুনে খেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন দলকে একেকটা টুকরো রান সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে। এই ম্যাচে অসাধারণ ব্যাটিং করলেন সিমসন। সত্যি তার তুলনা হয় না। দীর্ঘদিন ক্রিকেটের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ না থাকলেও, তিনি যেভাবে সেদিন ভারতীয় বোলারদের খেলে গেলেন, তা বহুকাল মনে রাখবে সকলে। শেষ অবধি ওই অভিজ্ঞ সিমসনকে নিজস্ব ৮৯ রানে ফিরিয়ে দিলেন মদনলাল। এই ইনিংসে মদনলাল নিশানা ঠিক রেখে যেভাবে বোলিং করেছিলেন তা ছিল তারিফ করার মতো। মাত্র উনিশ ওভার হাত ঘুরিয়ে মদনলাল পেয়েছিলেন ৫টি উইকেট। অস্ট্রেলিয়া ৩২৭ রান সেদিন গড়েছিল একমাত্র সিমসনের সচেষ্ট সংগ্রাম কৌশলে। হাত খুলে মেরে তিনি দেখিয়েছেন ক্রিকেটের সৌন্দর্য, দায়িত্ব ও সংগ্রামের প্রকৃত চেহারা।

ভারতের সামনে তখন জেতার জন্য ৩৪১ রানের কঠিন দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সেদিন নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন গাভাসকার। তাঁর রুদ্রময় দীপ্তির ঐশ্বরিক ঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল ব্রিসবেনের উইকেট। দাপটের সঙ্গে তিনি ক্রিকেটের প্রতিটি কেতাবী স্ট্রোককে অবলীলায় প্রদর্শিত করে গড়ে তুললেন নিজস্ব সেনচুরি গরিমা। মহীন্দর এই ইনিংসে বেশ কয়েকবার চোস্ত হাতে লাল

বলকে প্রহার করেছিলেন। ভিশ—এক কথায় ছিলেন অনবদ্য। শিল্পীর মানসিক উদাসীনতার বৈশিষ্ট্যে গড়া তাঁর ৩৯ রানের ইনিংসটি ছিল মিলটন সনেটের সমতুল্য। এই ইনিংসে চূড়ান্ত লড়াই করেছিলেন ভারতীয় ব্যাটধারীরা। লড়াই চলেছিল শেষ পর্যন্ত। কিরমানি, বেদী এমন কি চন্দ্রশেখর পর্যন্ত ব্যাট হাতে লড়েছিলেন জয়ের প্রত্যাশায়। এত করেও ভারতীয় ব্যাটধারীরা শেষরক্ষা করতে পারলেন না। 'টাই' টেস্টের তুঙ্গ আবহাওয়ায় পৌঁছেও ভারতীয় দলকে হারতে হলো মাত্র কয়েক রানের জন্য। প্রথম টেস্টে ভারতীয় দলের এই পরাজয় মোটেই অগৌরবের ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের এই পরাজয় তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল, তেমনি নিশ্চিন্ত করেছিল অস্ট্রেলীয় কর্তৃপক্ষকে।

পার্থের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচও ছিল উত্তেজনাময়। এই ম্যাচেও চূড়ান্ত লড়াই চলেছিল জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন নিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। এই ম্যাচে ভারতের পক্ষে চমৎকার ব্যাটিংয়ের পরিচয় দিলেন সানি। ২৭১ মিনিটে তাঁর বীরদীপ্ত ব্যাটের রকমারি দাপটে বেরিয়ে এসেছিল ১২৭ রানের একটি গৌরবময় সৌন্দর্যে-ভরা কুশলী ইনিংস।

এই টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে জোড়া সেনচুরি পেলেন ভারতীয় ক্রিকেট। সানির পাশে ব্যাট হাতে মহীন্দর পূরণ করলো শতরান। মহীন্দর-গাভাসকারের জুটিতে রান উঠলো ১৯৩টি, যা ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আর কোন ভারতীয় জুড়ির পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। ভারতীয় দল দু-দুটো সেনচুরি পেয়েও বড় রান তুলতে পারলো না খুব একটা। ৩৩০ রানে শেষ হয়ে গেল ভারতীয় ইনিংস।

প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দলের হয়ে অসাধ্য সাধন করেছিলেন মহীন্দর ও চৌহান। মাত্র ১৪ রানে সানির বিদায়ের পর মহীন্দর-চৌহান দলকে টেনে নিয়ে গেল ১৬৩ রানে। এই ইনিংসে মহীন্দর ও চৌহানের অবশ্যই সেনচুরি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু স্নায়ুর চাপে তাঁরা পারলেন না এই সুযোগ গ্রহণ করতে। ভিশ তাঁর

নিজস্ব ঢঙে একটি চিত্তাকর্ষক মাঝারি ইনিংস খেলে বিদায় নিলেন। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে আবার অগণ্য ভূমিকা নিতে দেখা গেল বর্ষীয়ান দলপতি ববি সিমসনকে। তাঁর মহিমা-দীপ্ত সাধনালব্ধ ব্যাটের গরিমাময় তুলির টানে বিকশিত হয়ে উঠেছিল ১৭৬ রানের একটি কাব্যিক ইনিংস, যার সুবাদে অস্ট্রেলিয়ানরা ভারতের ৪০২ রানের তৈরী মস্ত রান ইমারতের পাশে গড়তে পেরেছিল ৩৯৪ রান। দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারত লড়াই করেছিল চূড়ান্ত। সানি-মহীন্দরের সেনচুরি। নাভিশ্বাস উঠেছিল পার্থ ক্রিকেটের। চূড়ান্ত লড়াই করা সত্ত্বেও ভারতীয় দল এই ম্যাচেও পেলো না জয়ের স্বাদ। শেষ মুহূর্তে দুই উইকেটে প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে ম্যাচ জিতে গেলেন সিমসন।

পর পর দুটি টেস্টে হেরে গেলেও, ভারতীয় ক্রিকেটের আকাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা অবশেষে সফল হলো মেলবোর্ন উইকেটে। চন্দ্রালোক উদ্ভাসিত মেলবোর্নে উড্ডীন হলো ভারতীয় ক্রিকেটের গৌরবদীপ্ত বিজয় পতাকা। এই ম্যাচে অসাধারণ বোলিং করলেন চন্দ্রশেখর। চন্দ্রের এই কল্যাণেই ভারত আবার দেখতে পেল জয়ের মুখ। এই ম্যাচে ভারতীয় ব্যাটিং খুব একটা মন্দ ছিল না। সানি তৃতীয় টেস্টে আবার করলেন সেনচুরি। একদিকে তাঁর বীরদীপ্ত ব্যাটের রাজসিক ঝলক, আর একদিকে বিশ্বনাথের কাব্যিক শিল্পীখচিত ছন্দোময় ইনিংস ছিল দেখার মতো। উভয় ইনিংসে ভিশ করলেন অর্ধশত রান। তাঁর শিল্পোজ্জ্বল ব্যাটিং-গরিমা মেলবোর্ন উদ্যানকে করে তুললো উদ্ভাসিত। শেষ মুহূর্তে চন্দ্রের স্পিন বোলিংয়ের দাপট জয় এনে দিল ভারতীয় ক্রিকেটকে।

ভারতের এই জয়কে প্রশংসা করলেন অস্ট্রেলীয় সাংবাদিকেরা। তাঁরা প্রকাশ্যে চন্দ্র সহ ভিশ ও সানির প্রশংসা করে বললেন, "তৃতীয় টেস্ট জয়ের মূলে এই ত্রিশক্তির কাছে ভারতীয়দের ঋণী থাকা উচিত। তাঁরা ভারতবর্ষের মর্যাদাবৃদ্ধি করেছে।"

চতুর্থ টেস্টে ভিশ খেললেন তাঁর ক্রিকেট জীবনের আর একটি

সেরা খেলা। সংকটের মুখে ভিশ দিলেন দলের নেতৃত্ব। এই ম্যাচের প্রথম দিনটি ছিল ভারতীয় বোলারদের হাতে। বেদী ও চন্দ্রশেখরের নিখুঁত স্পিনের টানে অস্ট্রেলিয়া দল গুঁড়িয়ে গেল মাত্র ১৩১ রানে। দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় ব্যাটধারীরা দাপটের সঙ্গে খেললেন। এই ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটিং পর্বে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেন বিশ্বনাথ। তাঁর হাতের ব্যাট থেকে ঝর্ণা বেগে রকমারি মার অবলীলায় ঝরে পড়েছিল সেদিন। ছবির মতো একেকটি নিখুঁত মারকে ভিশ সচল দেবতার মতো তাঁর হাতের সাধনসিদ্ধ তুলির টানে করে তুলে-ছিলেন দর্শনীয়। টমসন-ক্লার্কের গতির সামনে একবারের জন্যও ভিশকে পরাজয়-উন্মুখ চিত্তের অস্থিরতায় অস্বস্তিবোধ করতে দেখা যায়নি। কবিতার মতো একটা ছন্দময় সৌন্দর্যদীপ্ত ইনিংস খেলে উদাসীন শিল্পী মায়াহীন ভাবে সেনচুরির প্রলোভিত মোহ থেকে নিজেকে বিমুক্ত করে বিদায় নিলেন। ভিশের বিদায়ে সেদিনের উপস্থিত দর্শকমাত্র ব্যথিত হয়েছিলেন। শেষ অবধি ভারতের পক্ষে রান উঠেছিল ৩৯৬। দ্বিতীয় ইনিংসে অনবদ্য বোলিং করলেন ভারতীয় বোলারেরা। প্রসন্ন, বেদী, চন্দ্রর ত্রৈয়ী আক্রমণের বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে গোটা অস্ট্রেলিয়া দল গুঁড়িয়ে গেল ২৬৩ রানে। প্রথম ছুটি টেস্টে পিছিয়ে থেকেও ভারত আপন বীর্যতা প্রমাণ করে ম্যাচের ফলাফল আনলো সমান সমান। শেষ দিন ম্যাচ জিততে ভারতকে ব্যয় করতে হয়েছিল ২১ মিনিটে মাত্র ২৭টি বল। ভারত এই প্রথম বিদেশে ম্যাচ জিতলো ইংনিসে। এই জয় ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ।

শেষ টেস্টে ভারত পারেনি তাদের মর্যাদা রক্ষা করতে। এই ম্যাচে ভারতীয় স্পিনের ভীতি ভেঙে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটধারীরা গড়লেন এক মস্ত রানের ইনিংস। সিমসন ও ইয়ালোপ করলেন সেনচুরি। মোট ৫০৫ রানের এই ইনিংসটির মোকাবিলা করা ভারতীয় ব্যাটধারীদের পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তবু ২৩ রানে

সানিসহ তিনটি মূল্যবান উইকেটপতনের পর ভিশ নিজেকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে ভুল করলেন না। হাত খুলে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে স্বভাবশিল্পী গড়ে তুললেন একটি নিপুণ ভাস্কর্যের সৌন্দর্যদীপ্ত রূপশ্রী, যার বর্ণালী রূপচ্ছটায় ক্রিকেট হয়েছিল ঐশ্বর্যময়। ৮৯ রানের একটি সোনালী রূপকথার স্বপ্নমাধুর্যময় ইনিংস সৃষ্টি করে উইকেট থেকে বিদায় নিলেন বিশ্বনাথ। ২৬৯ রানে ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে গেল। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া যোগ করলো আরো ২৫৬ রান। বিরাট একটা রানের বোঝা কাঁধে নিয়ে ভারত নামলো দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটে করতে। এই ইনিংসে আবার বিশ্বনাথ খেললেন সুন্দর একটি ইনিংস। নিখুঁত কাব্যিক ঢঙে গড়ে তোলা ভিশের এই ইনিংসটি ছিল অনন্যসাধারণ। অমরনাথের সঙ্গে জুটি বেঁধে ভিশ গড়ে তুললেন আমরণ যুদ্ধ-প্রতিজ্ঞার প্রতিরোধ প্রাচীর। খেলার গতি এই সময় বদলে গিয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছিল না কোন্ দল শেষ অবধি ম্যাচ জিতবে।

উইকেটের চারদিকে রাজসিক গরিমায় ক্রিকেটের সমস্ত অলংকারকে ছড়িয়ে দিয়ে ভিশ গড়ে তুললেন ৭৩ রানের একটি নিখুঁত ইনিংস। ক্রিকেট কেতাবের প্রায় সবকটি মারকে ভিশ তাঁর এই ইনিংসের মধ্যে প্রয়োগ করে প্রমাণ করে দিলেন নিজস্ব শিল্পশৈলীর আভিজাত্য যার অহংকারিত দাপটে নিষ্প্রভ হয়ে উঠেছিল টমসনের অগ্নিগর্ভ লাল বলের দাপট।

এত করেও ভারত ম্যাচে জিততে পারলো না। দুর্ভাগ্যবশত ম্যাচ হারতে বাধ্য হলো। তবু এই পরাজয়ের মধ্যে কোন গ্লানি ছিল না—বরং প্রকাশিত হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেটের আত্মনির্ভর মহিমা।

প্রতিপ্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে শেষ হলো ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফর। এই সফরে সানি ভারতের পক্ষে তিনটি সেনচুরি করে নিজের গরিমাকে বৃদ্ধি করলেও রান সংগ্রহের হিসাবে সেনচুরি সংগ্রহ না করেও বিশ্বনাথ পেলেন প্রথম স্থান। পাচটি ম্যাচের নটি ইনিংসে বিশ্বনাথের

শালায় জমা পড়লো ৪৭৩ রান, সানির-৪৫০ রান-। গড় হিসাবে ভিশের এলো ৫২·৫৫ ও সানির ৫০·০০। এই মরশুমে ভিশ পূরণ করলেন নিজস্ব তিন হাজার রান। এডিলেডের ৪৩ নম্বর টেস্ট ম্যাচের মধ্যে দিয়েই ভিশের এই স্মরণীয় নজির সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভিশের সৌন্দর্যময় ক্রিকেট সেদিন বিমুগ্ধ করেছিল অনেককে। বিশেষ করে ভিশের খেলা দেখে অষ্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক লিণ্ডসে হ্যাসেট বললেন ভিশের খেলা আমাকে মুগ্ধ করেছে। পরে তিনি আরো পরিষ্কার ভাষায় বললেন : 'Vishwanath looks a classy player. He could walk into any international side as a batsman.'

শুধু হ্যাসেট নয়, তাঁর সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একইভাবে প্রশংসার বাদ্যযন্ত্র বাজালেন বিশ্বের অন্যতম অলরাউণ্ডার কিথ মিলার। তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে খালেদ আনসারির সঙ্গে এক কথপোকথন পর্বে বললেন —"Little Vish is my favourite. He has such treemendous talent and is always good value. Your top batsman are all small in size but they hit the ball hard and their timing is superb like that of the West Indies."

নতুন আলোয় দেখা

ভিশ—আমাদের ভিশ।

জীবনের কাছে এক শ্রেষ্ঠ সময় এলো ১৯৭৮ সালে। ভিশ অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন জাতীয় দলে। এই সুযোগের প্রত্যাশায় তিনিও যেন বসেছিলেন, 'তিনিও যেন চাইছিলেন এমন একটা দায়িত্বের মধ্যে প্রকাশিত করতে নিজেকে।

আহা—এক অঙ্গে এত রূপ—যত দেখি ততই যেন তৃষ্ণা বেড়ে যায়। রূপের মণিময় ঐশ্বর্যের মধ্যে বারংবার ঘটেছে তার রূপান্তর। সে রূপ দেখে বিমোহিত হয়েছেন দর্শককুল।

ভিশ শিল্পী—ভিশ কবি—তাঁর নৈসর্গ সৌন্দর্য চেতনার মধ্যে তিনি সকল সময়ের জন্য সমাধিস্থ। কি সে রূপ বিন্যাস—কি সে লালিত্য, চোখে দেখেও সুখ, তৃপ্তি।

দলের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বিশ্বনাথ প্রমাণ দিলেন নতুন করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। এ যেন নতুন করে, নতুন আলোয় বহু পুরাতনকে দেখা।

বিশ্বনাথ তাঁর জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যদীপ্ত ইনিংস খেললেন দিল্লীর বিরুদ্ধে। রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে। দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলায় অনুষ্ঠিত হলো এক খেলা। দল হিসাবে দিল্লী কমজোরী নয়। তাদের দলেও ছিলেন বেদী, অমরনাথ, মদনলালের মতো খেলোয়াড়েরা। বিশেষ করে এই ম্যাচে এক অনন্য ক্রিকেট প্রতিভার পরিচয় দিলেন মদনলাল। ক্রিকেটের মস্ত দুই বিভাগের (ব্যাটিং ও বোলিং) সমান মুনশীয়ানার পরিচয় দিলেন তিনি দলের জন্য। দলের বিপর্যয়ের মধ্যে শক্ত হাতে ব্যাট ধরে মদনলাল এই ম্যাচে রাখলেন সংগ্রামী ভূমিকার নজির। তার হাতের ব্যাট সেদিন উন্মুক্ত কৃপানের মতো ঝলমলিয়ে উঠেছিল ফিরোজ শা কোটলার বুকে। উইকেটের চারদিকে রকমারী মারের সৌন্দর্য ছড়িয়ে মদনলাল দলের দুঃসহ অবস্থার মধ্যে গ্রহণ করলেন এক দুর্দমনীয় চ্যালেঞ্জ। চন্দ্রশেখর ও প্রসন্নর ফনাতোলা বিষাক্ত স্পিনের সামনে মদনলাল রাকেশ শুকলাকে সঙ্গে নিয়ে দলকে ২০৮ রান থেকে টেনে নিয়ে গেলেন ২৩১ রানের ইনিংসে। সেনচুরি এলো মদনলালের ব্যাট থেকে।

এবার এলো কর্ণাটক দলের পালা। দিল্লীর ইনিংস শেষ হওয়ার পর তারা সারাদিনে খেলে গড়লো এক উইকেটে আশি রান। খেলা জমলো তৃতীয় দিনের সকালে। বিশ্বনাথ খেললেন এক অসাধারণ খেলা। দলের প্রয়োজনে এই দিন বিশ্বনাথ নিজেকে উজাড় করে

দিলেন ফিরোজশা কোটলায়। তাঁর ব্যাট থেকে নির্গত হলো ক্রিকেট কেতাবের অমর সৌন্দর্য ও শিল্পবিশ্যাস। উইকেটের চারদিকে হাত খুলে ক্রিকেটের প্রতিটি স্ট্রোককে সেদিন প্রয়োগ করলেন বিশ্বনাথ। কাব্যিক ঢঙে গড়ে তোলা ভিশের এই ইনিংসটিকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁদের অনেকের ধারণায় এইটি ছিল ভিশের ক্রিকেট অধ্যায়ের একটি শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছেদ। রূপে, গন্ধে, সৌন্দর্যে এবং সার্বিক বিচারে ভিশ খেললেন একটি অমর ইনিংস। মদনলাল, বেদী অমরনাথ, শুকলাকে অবলীলায় প্রহারিত করে বিশ্বনাথ প্রমাণ করলেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। দলের প্রয়োজনে, দলের কর্তব্যে একজন সেনাপতির যে কি ভূমিকা হওয়া উচিত, এটি হলো সেই অর্থে শিক্ষণীয়। ক্রিকেট কেতাবের প্রায় প্রতিটি রকমারি মারকে বিশ্বনাথ সাধনসিদ্ধ প্রণালীতে প্রদর্শন করলেন অভিজ্ঞ বেদীর শূন্যে মোচড় মারা ঘূর্ণিমান লাল বলের অগ্নিগর্ভ ছোবলের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে বেদীর বলে উইকেট থেকে সদর্পে বেরিয়ে এসে খুদে বিশ্বনাথ যেভাবে বলকে ব্যাটের ডগায় চামচের মতো তুলে নিয়ে লঙ অন সীমানার বাইরে নিক্ষিপ্ত করেছিলেন, তা বহুকাল মনে রাখবে একালের দর্শকরা। দুশো চল্লিশ মিনিট ঝড়ের বেগে ভিশ ১১৮ রানে পৌঁছবার পর রাকেশ শুকলার বলে সুইপ সট করতে গিয়ে আউট হলেন। ছন্দপতন ঘটলো এক সাধন-শিল্পীর। ভিশের এই সেনচুরি তাঁর রনজি ট্রফির খাতায় পূরণ করলো তিন হাজার রান। পঞ্চাশটি জাতীয় পর্যায়ের ম্যাচে ৭২টি ইনিংস ব্যাট করে ভিশ করলেন তিন হাজারের ওপর রান। এই ম্যাচের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত ছিল উত্তেজনাময়। ২৪০ রানে দ্বিতীয় উইকেট পড়ার পর মাত্র ছ রানের মধ্যে আউট হলো আরো দুজন ব্যাটধারী। ২৪৬ রানে চার উইকেট, যখন কর্ণাটক দলের প্রকৃত চিত্র, তখন রান সংগ্রহের জন্য দলের বাকি আরো ৮৭ রান। এই রান সংগ্রহ করা সেই মুহূর্তে ছিল খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এক কথায় তখন ব্যাট বলের প্রকৃত চেহারা দাঁড়িয়েছিল লড়াই করার মনোবৃত্তিতে। দস্তুর মতো একেকটা

রান সংগ্রহ করতে বল পিছু লড়তে হয়েছিল কর্ণাটক দলকে। শেষ পর্যন্ত এই উত্তেজনাময় নাটকের অবসান ঘটলো। কর্ণাটক দুরন্ত লড়াই করে অনমনীয় ব্যাটিংয়ের দৃঢ়তায় নিজেদের পৌঁছে নিয়ে গেল নির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে। দল উঠলো ফাইনালে।

উত্তর প্রদেশ দলের সঙ্গে ফাইনালে মিলিত হলো কর্ণাটক দল। দল হিসাবে উত্তর প্রদেশের তুলনায় কর্ণাটক শক্তিশালী, ফলে এই ম্যাচে যে কর্ণাটক জিতবে এই প্রত্যাশাই ছিল সকলের। হলোও ঠিক তাই। কিছুটা একচেটিয়া ক্রিকেটের পরিচয় দিলো কর্ণাটক। তবু বলবো এই ম্যাচে বিশ্বনাথ নিজেকে উজাড় করে দিলেন। তার ছন্দময় কেতাবী ক্রিকেট যে প্রয়োজনে কত গতিময় হতে পারে তার প্রমাণ মিললো নতুন করে।

চন্দ্র ও প্রসন্নর বুদ্ধিদীপ্ত শিল্পচাতুর্যে উত্তর প্রদেশ দল গুটিয়ে গেল ১৯৩ রানে। মোহন নগরের সুন্দর উইকেটে শুরু হয়েছিল সেদিন খেলা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এমন ব্যাটিং নির্ভর পিচের সুযোগ পেয়েও উত্তর প্রদেশ দল কোন ফায়দা তুলতে পারলো না। একমাত্র বিজয় চোপরা ও আনন্দ শুক্লা ছাড়া ব্যাটিংয়ের দিকে কারোরই নজর ছিল না। শেষ দিকে আবদুল হাই কিছুটা শক্ত হাতে ব্যাট ধরার চেষ্টা করেছিলেন বলা যায় মাত্র। তবে এটা ঠিক চন্দ্র ও প্রসন্নর বোলিং দাপট এই ম্যাচে উঠেছিল চরমে। নিখুঁত লেংথ ও নিশানা ঠিক রেখে প্রসন্ন যেমন একদিকে প্রতিপক্ষ ব্যাটধারীদের বেঁধে রেখেছিলেন, তেমনি অন্যপ্রান্ত থেকে চন্দ্রশেখরের চাতুর্য নিক্ষিপ্ত গুগলীর ঘায়ে বিধ্বস্ত হয়ে উঠেছিল উত্তর প্রদেশ দল। এই ম্যাচে চন্দ্রশেখরের দখলে এসেছিল ৫৭ রানে ৬টি উইকেট এবং প্রসন্নর সংগ্রহশালায় জমা পড়েছিল ৪৩ রানে ৩টি উইকেট।

অল্প রানে গুটিয়ে যাওয়া উত্তর প্রদেশ দলের বিরুদ্ধে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক স্বস্তি নিয়ে ব্যাটিং শুরু করলো কর্ণাটকের ব্যাটধারীরা। শুরুতেই তারা মুক্তহস্তে উত্তর প্রদেশের বোলারদের পিটিয়ে রান তুলে

নেওয়ার চেষ্টা করলেন। তাঁদের এই বাড়তি রান সংগ্রহ পিপাসা অচিরেই দলের বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। তুরন্ত মারমুখী ব্যাটের সামনে সুন্দর বোলিং করলেন রাজেন্দ্র সিং হান্স। তাঁর বোলিংয়ের সামনে আকস্মিক বিপর্যয় ঘটলো কর্ণাটক দলের। ২৭৪ রানে তিন উইকেট থেকে সহসা চিত্র দাঁড়ালো ছয় উইকেটে ২৭৬ রান। এই বিপর্যয়ের মধ্যে নায়কোচিত বিক্রমে দলের পতন রোধ করতে শক্ত হাতে ব্যাট ধরলেন বিশ্বনাথ। সঙ্গী হিসাবে তাঁকে সংগত করতে এলেন দক্ষিণ ভারতীয় তনয় ব্রিজেশ প্যাটেল। তপ্ত ব্যাটের মোহিনী ঝঙ্কারে মুহূর্তে মুখরিত হয়ে উঠলো মোহন নগর। ভিশের রমণীয় ব্যাটিংয়ের চিত্রিত রূপ বিন্যাসে ক্রিকেটের চেহারা বদলে গেল। ১৭২ মিনিট ভিশ-ব্রিজেশের যৌথ প্রয়াসে গড়ে উঠলো দুশ কুড়ি রানের ইমারত। রাজেন্দ্র সিং হান্সের বলে চমৎকার একটা কাট মেরে ভিশ পোঁছে গেলেন তাঁর নিজস্ব দ্বিশত রানে। ভিশের ক্রিকেট জীবনে এই ইনিংসটি অবশ্যই গরিমাদীপ্ত। এই দিন তাঁর হাতের সুললিত বীণা যন্ত্রের মতো ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল প্রাণোচ্ছল হৃদয়াবেগে। ব্রিজেশ প্যাটেলও কম গেলেন না। ১৭২ মিনিটে সংগৃহীত ২২০ রানের মধ্যে ছিল নিজস্ব শত রান। এই রান সংগ্রহের মধ্যে তিনি ১২টি চার ও একটি ছক্কা মেরেছিলেন মন মাতানো রাজসিক ভঙ্গিমায়। নিজস্ব শতরানে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজেন্দ্র সিং হান্সের বলে লং অনে আউট হলেন রফিউল্লার হাতে। এই সময় রাজেন্দ্র সিং হান্সের বোলিংয়ের হিসাব ছিল এগারোটি বলের বিনিময়ে মাত্র এক রানে তিনটি উইকেট। জয়প্রকাশের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, তাই তিনি প্রথম বলে ক্যাচ তোলা সত্ত্বেও প্রাণ ফিরে পেলেন। সহজ ক্যাচ নিজের বোলিংয়ের ফলো থ্রু শেষ করে হাতের মধ্যে ধরে রাখতে পারলেন না হান্স। তাঁর এই ভুলের মাশুল তাঁকে অচিরেই দিতে হলো। জয়প্রকাশ ওই ক্যাচটি দেওয়ার পর শক্ত হাতে খেলতে লাগলেন দলনায়ক ভিশের সঙ্গে। জয়প্রকাশের শান্ত সংযত পরবর্তী

পর্যায়ের ব্যাটিং ভিশের মনের ওপর পরিপূর্ণ আস্থার প্রভাব গড়ে তুললো। হাত খুলে খেলতে লাগলেন কর্ণাটক দলপতি। প্রথম সেনচুরি থেকে নিজস্ব দ্বিশতরানে প্রবেশ করলেন অল্প সময়ের মধ্যে। এই দ্বিশত রান তুলতে বিশ্বনাথের সময় লেগেছিল মাত্র ৩৩২ মিনিট। এই সময় তিনি খেলেছিলেন মাত্র ৩০৮টি বল। সপ্তসুরে বাঁধা ভিশের ধ্রুপদ রাগিনীর লাস্যময় বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত হয়ে উঠলো ক্রিকেট উদ্যান। রাজসিক উদাসীনতায় ক্রিকেটের সাধক শিল্পী আপন বাদ্যযন্ত্রের ঝংকারিত প্রভায় বিস্তৃত প্রাঙ্গণকে উদ্ভাসিত করে বিগত গরিমাকে ভেঙেচুরে এগিয়ে চললেন মহাপ্রস্থানের পথে। মাঠের চৌদিকে প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত রেখেও এই দিন ভিশকে মুহূর্তের জন্যেও দমিয়ে রাখতে পারলো না উত্তর প্রদেশ দল। উইকেটের চারপাশে তপ্ত ব্যাটের শানিত ঘায়ে ক্রিকেট কেতাবের প্রতিটি স্ট্রোককে চালিত করে ৩৯৮ মিনিটে ৪৫১টি বলের মাধ্যমে পূরণ করলেন ২৪৭ রান—যা ভিশের ক্রিকেট জীবনের সর্বোচ্চ রানের একটি গরিমা। সপ্তম উইকেটে জয়প্রকাশের সঙ্গে ভিশ গড়লেন ১৩৭ মিনিটে ১৫২ রান। এরপর চিত্র পরিবর্তন ঘটলো হান্সের বলে। বিশ্বনাথ হান্সের বলে অগ্নিগর্ভ মেজাজে ব্যাট চালাতে গিয়ে স্বইচ্ছায় ডেকে আনলেন নিজের বিপদ। ৪২৮ রানে ষষ্ঠ উইকেট পতনের পরই হান্স তাঁর ১৯টি বলে মাত্র দুটি রানের বিনিময়ে মুড়িয়ে দিলেন কর্ণাটক দলের বীর্যদীপ্ত ইনিংসটিকে। ৪২৮ রানে ৬ উইকেটের চিত্র বদল করে গোটা কর্ণাটক দলের সমাপ্তি ঘটলো ৪৩৪ রানে। ১৫২ রানে একটি মাত্র ইনিংসে নটি উইকেট দখল করে রাজেন্দ্র সিং হান্স রনজি ট্রফির ফাইনালে গড়লেন এক নয়া নজির। বিপরীত দিকে চন্দ্রশেখর করলেন এক অসাধারণ বোলিং। তাঁর একক বোলিংয়ের চাতুর্যে উত্তর প্রদেশ দল দ্বিতীয় ইনিংসে গুটিয়ে গেল মাত্র ১২২ রানে—চন্দ্রশেখর এই ম্যাচে সংগ্রহ করলেন সর্বসাকুল্যে ১২টি উইকেট। রনজি ট্রফি ঘরে তুললো কর্ণাটক দল।

ভিশের জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। এই ম্যাচে তিনি পেলেন ম্যান-অফ-দ্য ম্যাচের শ্রেষ্ঠ সম্মান।

পাকিস্তান সফর

ভারতীয় রাজনৈতিক পটভূমিকায় ১৯৭৮ সালের পাকিস্তান সফর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ ১৭ বছর বাদে রমণীয় ক্রিকেটকে ঘিরে উভয় দেশের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক বলিষ্ঠ মৈত্রীর সেতুবন্ধন।

বেদীর নেতৃত্বে পাকিস্তান সফরে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দল যে কি রকম খেলবে এই প্রত্যাশায় দিন গুনছিলেন ভারতবাসী। হকির মাধ্যমে ভারতীয় ক্রীড়াধারার বিপর্যয় আমরা আগেই টের পেয়েছি ; এবার ক্রিকেট।

১৬ অক্টোবর তারিখে ফৈজলাবাদে শুরু হলো প্রথম টেষ্ট ম্যাচের আসর। সহজ, নিষ্প্রাণ, মন্থর উইকেটে টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ নিলো পাকিস্তান দল। দিনভোর রান সর্বস্ব উইকেটে ব্যাট করে পাকিস্তানী ব্যাটধারীরা বড় একটা সুযোগ আদায় করতে পারলেন না। বেদী-প্রসন্ন মোটামুটিভাবে নিখুঁত লেংথ ও নিশানা রেখে বল করায় পাকিস্তানী ব্যাটধারীরা নিজেদের সংযত রাখতে বাধ্য হলেন। বরং বলা যায়, প্রথম দিনে ভারতীয় বোলাররা যথেষ্ট নিপুণ হাতে ব্যাট করার ফলে পাকিস্তানী ব্যাটধারীরা ভাল রান করতে সক্ষম হননি। ৩ উইকেটে ২৪৩ রান তুলে প্রথম দিনে পাকিস্তানী ব্যাট-ধারীরা দিন শেষ করেন। মজিদ খান ও সাদিক এই ম্যাচে দারুণ ব্যাট করলেন। বিশেষ করে মজিদ খানের ব্যাটিং ছিল উন্নত মানের। উইকেটের দুদিকে হাত খুলে যেভাবে বেদীকে পিটিয়েছিলেন তা ছিল দেখার মতো। মজিদ খাঁন ও সাদিক এবং পরে মুস্তাক আউট হলে পাকিস্তানী ব্যাটধারীদের বিপর্যয়ের মধ্যে মানসিক দৃঢ়তা ফিরিয়ে

আনলেন জাহির আব্বাস। চশমা পরিহিত ছিপছিপে চেহারার খেলোয়াড়টি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজে শুরু করলেন ব্যাট করতে। তাঁর হাতের চালিত ব্যাটের ঘায়ে লাল বল বিধ্বস্ত আর্তনাদে ছুটে যাচ্ছিল সীমানার বাইরে। এই দিন আর একজনের উচ্চাঙ্গ ক্রীড়া বিন্যাসের প্রশংসা না করলে সত্যের অপলাপ হয়। তিনি হলেন জাবেদ মিঁয়াদাদ। বেদী ও চন্দ্রশেখরকে যথেচ্ছা পিটিয়ে রান তুলতে কুণ্ঠিত হতে দেখা যায়নি তাঁকে। ৯৯ রানে দ্বিতীয় উইকেট পতনের পর উইকেটে আসেন জাহির আব্বাস। তাঁর ব্যাটিং ভঙ্গিমার মধ্যে তারুণ্যের প্রখরতা যেমন ছিল তীব্র, তেমনি ছিল অভিজ্ঞ পেশাদারী মেজাজ। মাত্র ৫ রান যোগ করে অধিনায়ক মুস্তাক মহম্মদ ফিরে গেলে মিঁয়াদাদ উইকেটে এসে জাহিরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে খেলার চেহারা বদলে দিলেন। এই দুই ব্যাটধারীর দাপট সম্ভারিত ব্যাটিংয়ের জলুসে অল্প সময়ের মধ্যেই মতিচ্ছন্ন অবস্থায় পড়লেন ভারতীয় দল। বেদীর বোলিংয়ের চেহারা দেখে মনেই হচ্ছিল না কোনকালে তিনি বড় খেলায় অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে বোলিং করেছেন। তাঁর হাত থেকে পিছলানো বল থেকে জাহির সামান্যতম প্রচেষ্টায় ছক্কা মারলেন। এই ম্যাচে ভারতীয় দলে প্রসন্ন নামক যে একজন দিকপাল অফ স্পিনার আছেন মনে হয় সেই কথা অধিনায়ক বেদী ভুলেই গিয়েছিলেন মারমুখী পাকিস্তানী ব্যাটধারীদের সংহার ভাবমূর্তি লক্ষ্য করে। প্রথম দিনের খেলা শেষ হয় মূলত রক্ষণাত্মক ক্রীড়ারীতির কৌশলে ২৪৩ রানে। পাকিস্তানী ব্যাটধারীরা যে চেষ্টা করলে রান সর্বস্ব পিচ থেকে ব্যাট করার আরো যে কিছুটা সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন, সে কথা বলতে কোন দ্বিধা নেই। তবু তাঁরা রানের প্রলোভনে না ভুলে সময়ের দিকে তাকিয়ে নিষ্প্রাণ উইকেটে রান সংগ্রহের কথা ঘুণাক্ষরে চিন্তা না করে কিছুটা জমিদারী মেজাজে ব্যাট করার চেষ্টা করলেন। দ্বিতীয় দিনের খেলার রীতি ছিল প্রথম দিনের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই দিন রান তোলার নেশায় দিনের প্রথম বলটি থেকে তাঁরা চেষ্টা করতে শুরু করলেন। কপিল,

ঘাউড়ি সহ দ্বিতীয় দিনে বেশী ব্যবহার করলেন প্রথম দিনে ঘর সাজাতে তুলে রাখা প্রসন্নকে। উইকেটের চারপাশে জাহির ও মিঁয়াদাদ নির্দয়ভাবে প্রহার করলেন ভারতীয় বোলারদের। জাহির তাঁর গতদিনের ১২৮ রান টপকে হাজির হলেন ১৫০ রানের সীমানায়, মিঁয়াদাদ ৫৩ থেকে রানের বিমানে চড়ে পাড়ি দিলেন সেনচুরি নামক লক্ষ্যপথে অবতরণ করতে। দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় ফিল্ডিংয়ের মান নিম্নগামী না হলেও প্রচণ্ড মারের সামনে কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়ে ছিল। শেষ অবধি প্রসন্নর শূন্যে পাক খাওয়া বলের গতি আন্দাজ করতে না পারায় জাহির বিশ্বনাথের হাতে শক্ত ক্যাচ তুলে বিদায় নিলেন নিজস্ব ১৭৬ রানে। জাহিরের এই ইনিংসটি তাঁর ক্রিকেট জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য প্রদর্শন না হলেও রসোত্তীর্ণ যে ছিল একথা স্বীকার করতে বাধা নেই। ১৬৫ রানে জাহির আব্বাস আউট হয়ে ফিরে যাওয়ার পরেই শুরু হয় পাকিস্তানী ব্যাটিংয়ের বিপর্যয়ের পালা। আসিফ ইকবাল, ইমরান, ওয়াসিম বারীর মতো ব্যাটধারীরা যেন সখের ক্রিকেট খেলতে এসে বিদায় নিলেন অল্প সময়ের মধ্যে। তবু একাই মিঁয়াদাদ করতে লাগলেন বেদীর দলবলকে ছিন্নভিন্ন। শেষ অবধি ৫০৩ রানে ৮টি উইকেট পতনের পর মুস্তাক তার দলের দান ছেড়ে দিলেন। দেড় দিনের বেশী সময় ব্যাটের তাড়া সামলাতে হাঁপিয়ে ওঠা ভারতীয় দলের গোড়াপত্তন দ্বিতীয় দিনে খুব একটা খারাপ হলো না। এই ইনিংসে চৌহান শুরুতেই বেশ দেখেশুনেই খেলা আরম্ভ করলেন।

যদিও ইমরান, সরফরাজের বোলিংয়ের সামনে বড় বেশী অস্বস্তি-বোধ করতে দেখা যাচ্ছিল চৌহানকে। সরফরাজের তুলনায় ইমরান ভীতি ছিল ভারতীয়দের কাছে অনেক বেশী। বাতাস ভাঙা বলের গতিতে ইমরান তাঁদের বিব্রত করতে লাগলেন। শেষ অবধি সরফরাজের একটা মাটি ঠোকা বলে মুখ বাঁচাতে গিয়ে উইকেটের পিছনে চামচের মতো বল তুললেন চৌহান। বলটি তাঁর মুখ রক্ষা

করলেও ক্রিকেট মর্যাদা রক্ষা করতে পারলো না। উইকেটের পিছনে দস্তানা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াসিম বারী অন্তত দশ গজ আরো পিছনে ছুটে গিয়ে সেই বলটি নিজের কোলে তুলে নিয়ে চৌহানকে মাঠের বাইরে প্যাভেলিয়ানে নির্গমনের পথ সুগম করে দিলেন। নিজস্ব ৪৬ রানে চৌহানের ইনিংস শেষ হওয়ার পর অমরনাথ উইকেটে এসে গাঁটছড়া বাঁধলেন গাভাসকারের সঙ্গে। গাভাসকার তাঁর নিজস্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্যে শুরু করেছিলেন খেলতে। উইকেটের সামনে চমৎকার ভঙ্গিমায় ইমরান-সরফরাজকে বেশ কয়েকবার বাউণ্ডারীতে চালিত করলেন সানি। অনেকের ধারণা ছিল এই ম্যাচে সানি হয়ত নির্ঘাত সেনচুরি করবেন। কিন্তু কার্যত তা হলো না—৮৯ রানে গাভাসকার সেনচুরি বঞ্চিত হয়ে ফিরে গেলেন। অমরনাথ অবশ্য ফিরে গিয়েছিলেন আরো আগে। মহিন্দর অমরনাথ উইকেটের চারপাশে বেশ কিছুটা হুমকি প্রদর্শনের চেষ্টা করে অবশেষে নিষ্ফল ক্রোধে ফিরে গেলেন সান্ত্বনা নির্ভর ৩৫ রানের স্বল্প সংগ্রহ পুঁজি নিয়ে। তিন তিনটি উইকেট ২৪৮ রানে পতনের পর বিশ্বনাথের সঙ্গে হাল ধরলেন তরুণ দিলীপ। চতুর্থ উইকেটে দিলীপ-ভিশের যৌথ প্রচেষ্টায় রানের পরিধি চড় চড় করে বেড়ে গেলো। এই ইনিংসে চোখ ঝলসানো রকমারি মার মারলেন ভিশ। তাঁর সৌন্দর্য প্রচারিত ব্যাটের রাজসিক চমকে ফৈজলবাদের ক্রিকেট উদ্যান মুহূর্তে হয়ে উঠলো বর্ণালী দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। ভিশের লালিত্য সম্ভারিত ব্যাটিং গরিমার মাধুর্যমণ্ডিত নান্দনিক প্রসাদগুণে দীর্ঘদিন বাদে রানের মুক্তধারা বর্ষিত হলো। অনবদ্য ছবির মত স্কোয়ার কাট। কব্জির চাতুর্য স্পর্শে কেতাবী ক্রিকেট এই দিন যেন ভিশের মধ্যে প্রত্যক্ষ হলো। এই দিন যেন রকমারি মারণাস্ত্রে ক্রিকেট দেবতা বিচিত্র অলংকারে সুসজ্জিত করেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট-অর্জুন বিশ্বনাথকে। অপ্রতিরোধ্য হৃদয় চেতনায় ভিশ তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পী স্বভাবে মারমুখী ক্রিকেটে ভারতীয় ইনিংসকে শুধু যে চিত্তাকর্ষক রূপ বিন্যাসে মুখরিত করলেন না, সেই

সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করলেন দীর্ঘদিন বাদে নিজের আত্মজ শৈল্পিক ভাবমূর্তি। চতুর্থ উইকেটে দিলীপ ও বিশ্বনাথের সক্রিয় ব্যাটিং দৌরাত্ম্যে রান উঠলো ১৬৬। কব্জির মোচড়ে ক্রিকেটের দেবাশীর্বাদপুষ্ট বিশ্বনাথ পাকিস্তানী বোলারদের হেলায় পদানত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন কাব্যিক রসধারায়।

সতর্কতামূলক খেলার প্রচণ্ডতায় রানের গতি কিছুটা মন্থর হলেও, গতির অভাবে সৌন্দর্য নষ্ট হলো না। ইমরান, সরফরাজ, সিকন্দর বকৃত, মুস্তাক ও ইকবাল কাসিম প্রাণপণ বোলিং করা সত্ত্বেও পারলেন না মুহূর্তের জন্য বিশ্বনাথ বা দিলীপ বেঙ্গসরকারের মতো ব্যাটধারীদের ঠেকিয়ে রাখতে। বিশ্বনাথের আত্মবিশ্বাস বিজড়িত মহিমাময় প্রতিষ্ঠা দিলীপের মনে অনেকখানি সাহস জাগিয়ে তুলেছিল। ইমরান ও সরফরাজের মতো গতিশীল চতুর বোলারদের সাহস ভরে পেটাতে কসুর করলেন না দিলীপ। যুক্ত প্রচেষ্টায় রান এলো ২৪৮ থেকে ৪১৪ রানে। দীর্ঘ ছয় ঘণ্টার ইনিংস খেলে মুস্তাকের উইকেট সোজা একটি বলে ১৬টি বাউণ্ডারী খচিত ভিশের রমণীয় সৌন্দর্যদীপ্ত ইনিংসটির পতন ঘটলো। বিশ্বনাথের নির্গমনের আটচল্লিশ মিনিটের মধ্যেই ভারতীয় তাঁবুতে দেখা গেল শোকযাত্রার চিত্র। ৪১৪ রানে চতুর্থ উইকেট বিশ্বনাথের বিদায়ের পর ৪৬২ রানে পতন ঘটলো নটি উইকেটের। দিলীপ সেনচুরি বঞ্চিত হয়ে ব্যর্থ মনে ফিরে গেলেন নিজস্ব ৮৫ রানে। মুস্তাক পেলেন ৫৫ রানে ৪টি উইকেট ও সরফরাজ ১০৫ রানে ২টি উইকেট।

খেলার গতি যে ফলশূন্য ভাবে শেষ হবে একথা সবাই বুঝেছিলেন। দ্বিতীয় দফায় পাকিস্তানের ব্যাটধারীরা বিপরীত চিত্রে আক্রমণাত্মক খেলা শুরু করলেন। জাহির আব্বাস এই ম্যাচে আবার শুরু করেছিলেন দ্বিতীয় সেনচুরির প্রত্যাশায় মারমুখী ব্যাটিং করতে। আসিক ইকবাল ও জাহির দুজনেই যেন রানের ঘোড়ায় চড়ে মুক্ত কৃপান হস্তে নেমেছিলেন ক্রিকেটের দিগ্বিজয়ে। জাহিরের দুর্ভাগ্য—সুন্দর, সংযত

সৌন্দর্যদীপ্ত ব্যাটিং করা সত্বেও এই ইনিংসে মাত্র ৪ রানের জন্য তিনি সেনচুরি করতে পারলেন না। আসিফ ইকবাল শতরান পূরণ করে ফেললেন। মোট ৪ উইকেটে ২৬৪ রান তোলার পর মুস্তাক নিষ্প্রাণ মৃত ক্রিকেটের সৌজন্য রক্ষায় দান ছেড়ে দিলেন বেদীর হাতে। অবশিষ্ট সময় এক ঘণ্টা কাল ব্যাট করে ভারত রান তুললো বিনা উইকেটে ৪৩।

প্রথম টেস্টের পর ভিশ যে অসাধারণ ক্রীড়া বিন্যাসের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার তুলনা হয় না। দিন কয়েক বাদে লাহোরের গদাদি স্টেডিয়ামে বসলো দ্বিতীয় টেস্ট পর্যায়ের আসর। ঘাস বিছানো গদাদি উইকেটে ভারতীয় দলপতি বেদী টসে জয়লাভ করে ব্যাট করার সুযোগ গ্রহণ করেও ভারতীয় ব্যাটধারীদের পেশ ভীতির দুর্বলতায়বড়-সড় রান গড়তে পারলেন না। শুরুতেই ব্যর্থ হলেন সানি ও চৌহান। অমরনাথ ও ভিশ কিছুটা সতর্কতামূলক ইনিংস খেলা সত্ত্বেও ভারতীয় ব্যাটিং বিন্যাসে কোনরকম গুণগত পরিবর্তন ঘটলো না। এই ম্যাচে ভিশ তাঁর বিগত ইনিংসের গৌরবদীপ্ত মহিমার কোনরকম ছিটে ফোঁটা সৌরভও বজায় রাখতে পারলেন না। মাত্র ২০ রানের একটি নিখুঁত ক্লাসিকাল ঢঙে ছোটগল্পের আঁচড় টেনে ভিশ বিদায় নিলেন উইকেট থেকে। মাত্র ১৯৯ রানে পতন ঘটলো ভারতীয় দলের। একমাত্র বেঙ্গসরকার ছাড়া এই ইনিংসে আর কেউই পাকিস্তানী বোমারু আক্রমণের সামনে পিঠ সোজা রেখে দাঁড়াতে পারলেন না। নিজস্ব ৭৬ রানে সরফরাজের সর্টপিচ বলে অকেতাবী ঢঙে হুকশট করতে গিয়ে পা পিছলে মুখ থুবড়ে উইকেটের ওপর পড়লেন দিলীপ বেঙ্গসরকার। এই ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটধারীদের মনে দুর্বল ও আতঙ্কের ছাপফেলেছিলেন সরফরাজ ওইমরান। ভারতীয় ব্যাটধারীদের পেশ আতঙ্কিত স্নায়বিক দুর্বলতার বিপরীত চিত্র খানিক সময়ের মধ্যে বদলে গেল গদাদি স্টেডিয়ামে। স্পিন-নির্ভর ভারতীয় আক্রমণের সামনে পাকিস্তানী ব্যাটধারীরা হাত খুলে দেদার চিত্তে পেটাতে

লাগলেন। এই ম্যাচে ভারতীয় দলনেতা স্পিন সম্রাট হিসাবে খ্যাত বেদী ও তুরুপের তাস চন্দ্রশেখরকে যথেচ্ছাচার পেটালেন জাহির আব্বাস। এই ম্যাচে ভারতীয় বোলারদের স্থূল স্পিনের মোচড়কে ছেলেমানুষি ভঙ্গিমায় ছত্রাখান করে দিয়ে জাহির আব্বাস প্রতিষ্ঠা করলেন নিজের ভাবমূর্তিকে। মুস্তাক ৬৭, মজিদ খান ৪৫, ওয়াসিম বারীর ৮৫ রান সহ জাহির এই ইনিংসে মুখরিত রাজসিক ভঙ্গিমায় নিজস্ব দ্বিশত রান পূরণ করলেন। ৩৮৮ মিনিট উইকেটে দাঁড়িয়ে জাহির ২৯টি বাউণ্ডারীসহ ২টি ছক্কা মেরে ২৩৫ রানের এক মস্ত ইমারত গড়ে তুললেন। তাঁর এই গৌরবদীপ্ত ইনিংসটি পাক-ভারত টেস্ট পর্যায়ের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান। ১৯৬০ সালে মাদ্রাজ উইকেটে বোরদের সৃষ্ট ১৭৭ রানের ব্যক্তিগত রানের গরিমাকে ভঙ্গ করে জাহির ক্রিকেটের বুকে রচনা করলেন এক নয়া নজির। শুধু তাই নয়—এটি ছিল জাহিরের ২৮ টেস্টের তৃতীয় ডাবল সেনচুরি। ৬ উইকেটে ৫৩৯ রানের ইনিংসটির দিকে তাকিয়ে অতি সহজে বোঝা যায় ভারতীয় বোলারদের দৈন্যতা। বেদী-প্রসন্ন-চন্দ্রশেখর এই ত্রয়ী স্পিনারদের অকেজো প্রমাণ করে পাকিস্তানের ব্যাটধারীরা স্বমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটধারীরা নিষ্প্রাণ উইকেটে স্বমর্যাদায় নিজেদের প্রকাশ করতে হয়ে উঠলেন বদ্ধপরিকর। ইমরান, সরফরাজ ও মুস্তাককে উইকেটের চারদিকে পিটিয়ে ভারতের দুই ব্যাটধারী গোড়াপত্তন বেশ ভালই করলেন। এই ইনিংসে সানি ও চৌহানের যৌথ সক্রিয় ব্যাট চালনায় রান উঠলো দ্রুতগতিতে। উইকেটের সামনে সানি পা বাড়িয়ে সেদিন যেভাবে হাতের ব্যাটকে নিরহংকার ভঙ্গিতে চালিত করেছিলেন, তা দেখে তাবৎ পাকিস্তানী ক্রিকেট যোদ্ধার দল তাঁকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান বলতে বাধ্য হলেন। এই ইনিংসে সানি ও চৌহান দুই ব্যাটধারী পাকিস্তানী আম্পায়ারের ভুল সিদ্ধান্তে আউট হয়ে ফিরে এলেন। গাভাসকার তিন রানের জন্য, চৌহান সাত রানের জন্য সেনচুরি বঞ্চিত হয়ে ব্যর্থ

মনোরথে প্যাভেলিয়ানে ফিরে এলেন। এরপর বিশ্বনাথ ও অমরনাথ খেললেন দুর্ধর্ষ ইনিংস। এই ইনিংসে আবার নতুন করে দেখা গেল বিশ্বনাথকে। তাঁর রাজসিক শিল্পসুধা মিশ্রিত ব্যাটিং গরিমার বর্ণোজ্জ্বল দাপটে রান উঠলো দ্রুতগতিতে। মনোরম মণিমুক্তা খচিত ভিশের কাব্যময় ইনিংসটি ছিল দেখার মতো। লেটকাট, স্কোয়ারকাট, পুল, সুইপ ও ড্রাইভ সট মিশ্রিত কব্জির মোচড় সম্বলিত ভিশের ব্যাটিং চিত্রটি উপভোগ্য ছিল ক্রিকেট রসবিশেষজ্ঞদের কাছে। তাঁরা শুধু প্রেস বক্সে বসে দু চোখ ভরে এই অনুপম চিত্রের রূপকল্প আস্বাদনই করলেন না, সেই সঙ্গে অনুভব করলেন সত্যিকার ক্রিকেটকে। মুস্তাক প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও ইমরান ও সরফরাজকে দিয়ে পারলেন না লাল বলের দাপটে ভারতীয় এই ক্রিকেট অর্জুনকে ভয় দেখাতে। বরং বিশ্বনাথ তাঁর হাতের ব্যাট সুদর্শন চক্রের মহিমার প্রসাদ বিন্যাসে চালিত করে গতিশীল লালবলকে প্রহারের উত্তপ্ত আঘাতে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। তাঁর বীরোচিত ব্যাটের উদ্ধত চুম্বনে লাল বলের অগ্নিবান প্রভাবমুক্ত ক্রিকেট পাকিস্তানীদের জয়ের প্রত্যাশা মুছে লাঞ্চের পর প্রায় একরকম খালি হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানী সমর্থক আসন। এই সময় পাকিস্তানীদের ফিল্ডিংয়ের মান হয়ে উঠেছিল খুবই নিম্নগতি। ক্যাচ ফসকালেন ইমরান খান। ক্যাচ পড়লো জাভেদ মিঁয়াদাদের হাত থেকে।

খেলার গতি যে ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল, তা দেখে ভারতের অতি বড় শত্রুও ভাবতে পারেননি যে এই ম্যাচ কখনও পাকিস্তানীদের ক্ষুধার্থ গহ্বরে প্রবেশ করতে পারে। ঘটনা বদল হলো মুদাসসর নজর বোলিং করতে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। মুস্তাক হাল ছেড়ে দিয়ে যখন বোলারদের বিশ্রামের কথা মনে করে অপারগ চিত্তে বল তুলে দিলেন মুদাসসর নজরের হাতে, তখনই অন্তরীক্ষে হাসি ফুটে ছিল ক্রিকেট দেবতার দাম্ভিক অধরে। হায় রে তখন কে ভেবেছিল এই নবাগত ক্রিকেটারটি মাত্র কয়েকটি বার হাত ঘুরিয়ে আল্লাকে সন্তুষ্ট

করতে পারবেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠবেন গোটা পাকিস্তানে এক আলোচ্য ব্যক্তিত্ব। মুদাস্‌সারের ঝোলানো আলতো বলে প্রথমে শিকড় গেড়ে থাকা ভিশ এবং পরে আউট হলেন দিলীপ বেঙ্গসরকার। ভিশ ২৬২ মিনিট চোখ ঝলসানো ব্যাট করার পর মুদাস্‌সর নজরের আলতো বলে বড় মার মারতে গিয়ে হলেন সরাসরি বোল্ড আউট। মুহূর্তে গোটা মাঠ আবার গরম হয়ে উঠলো। এতক্ষণ যে যুগল ব্যাটধারী মোহিনী বাঁশির সুরে গোটা ক্রিকেটকে ভারতীয় অনুকূলে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন, সেই খেলার সুর সহসা বদলে দিলেন মুদাস্‌সর নজর। ইমরান, সরফরাজ, মুস্তাক প্রমুখ শক্তিমান বোলাররা যে কাজ করতে কালঘাম ঝরিয়ে ছিলেন, সেই অসাধ্য সাধন করে পাকিস্তানীদের মনে এক নতুন প্রেরণা আনলেন মুদাস্‌সর নজর। মাত্র ৪ ওভার বোলিং করে ৪টি রানের বিনিময়ে তিনি সংগ্রহ করলেন দুটি মূল্যবান উইকেট। এই আউটের পরই ভারতীয় তাঁবুতে বিপদ দেখা গেল। লাঞ্চ থেকে চা পানের বিরতির মিনিট পাঁচেক আগে গুটিয়ে গেল ভারতীয় দলের ইনিংস। শেষদিকে চমৎকারভাবে রানের জন্য লড়াই করলেন কিরমানি। তাঁর সংগৃহীত ৩৯ রান ছিল রীতিমতো সংগ্রামী মেজাজের।

দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানী ব্যাটধারীরা যখন ব্যাট হাতে মাঠে খেলতে নামলেন, তখনও ফলাফল সম্পর্কে কারো মনে কোন স্থির ধারণা ছিল না। হাতে সময় ছিল সাদামাটা পাক্কা ৪০ মিনিট সহ কুড়িটি বাধ্যতামূলক ওভার। অর্থাৎ গড়পড়তায় দু'ঘণ্টার মত সময়ে পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল ঘণ্টায় ৬৪ রান, যা একরকম অসাধ্য সাধন বলে মনে করেছিলেন সাংবাদিকের দল। কিন্তু খানিক সময়ের মধ্যে ভারতীয় দলপতির রক্ষণাত্মক মনোভাবের পরিচয় গোটা মাঠকে বিস্মিত করে তুললো। তিনি কপিলদেব, ঘাউড়ি, মহিন্দর অমরনাথকে সরিয়ে বল করতে এলেন নিজস্ব স্পিনবাহিনী নিয়ে। মারমুখী পাকিস্তানী ব্যাটিংয়ের সামনে ভারতীয় পেশম্যানেরা দুর্বল হলেও বেদী

পরিকল্পিত স্পিন বোলিং অপেক্ষা নিসন্দেহে কার্যকরী ছিলেন। তা ছাড়া এই ম্যাচে প্রথম দেখা গেল ক্রিকেট রীতিনীতিকে অস্বীকার করে ভারতীয় দলপতি পেশ বলে অস্ত্র প্রয়োগে উইকেটের সামনে পিছনে ক্লোজ ফিল্ডসম্যান না রেখে খেলোয়াড়দের প্রাচীর ন্যায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন সীমানার ধার ঘেঁষে। ক্রিকেট ইতিহাসে এমন ঘটনা বড় একটা দেখা যায় না। পেশম্যানেরা স্লিপ, সিলি অঞ্চলের ভূমি ফাঁকা রেখে বল করার সুবাদে ব্যাটধারীরা রান কুড়োতে লাগলেন। শেষে অবস্থা এমন একটা মারমুখী পরিস্থিতির মধ্যে এসে দাঁড়ালো যে স্পষ্টই বোঝা গেল বেদীর ম্যাচ অতি সহজে মুস্তাকের হাতের মুঠোয় চলে গেছে। দ্রুত গতিতে রান তুলে ভারতীয় স্পিন বোলারদের অকেজো প্রমাণ করে, পাকিস্তানী ব্যাটধারীর দল ব্যাটের রাজসিক গরিমায়·আট ওভার দু বল বাকি থাকার আগেই ঘড়ির কাঁটাকে পিছনে ফেলে রানের ঘোড়া ছুটিয়ে পৌঁছে গেলেন নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্যে। জাহির আব্বাস ২৮ ও আসিফ ইকবাল ২১ রানে অপরাজিত থেকে পাকিস্তানকে দীর্ঘ অমীমাংসিত ক্রিকেট থেকে মুক্ত করে আট উইকেট হাতে রেখে ম্যাচ জিতিয়ে দিলেন অপ্রত্যাশিতভাবে।

দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তানীদের এই জয়ের পিছনে যেমন ছিল তাঁদের মারমুখী ব্যাটিংয়ের দুরন্ত দম্ভিপনা, তেমনি ছিল ভারতীয় দলপতি বেদীর নির্বোধ বোলিং পদ্ধতি। এই ম্যাচ শেষে তাই বেদীর সমালোচনা করে ভারতীয় ক্রিকেট বিপন্নতায় সমস্ত দোষ তার কাঁধে চাপিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী বোদ্ধার দল ক্ষিপ্ত মনে কলমের তীক্ষ্ণ ফলায় কালো কালির কলঙ্ক বিতরণ করে লিখলেন ·একমাত্র বেদীর অজ্ঞতার জন্যই ভারত হারলো। দ্বিতীয় টেস্টে ভারতকে হারতে বাধ্য করলেন অনভিজ্ঞ অধিনায়ক স্বয়ং বেদী।

দিন কয়েক ব্যবধানে লাহোরের ম্যাচ শেষ হওয়ার পর শেষ পর্যায়ের খেলাটি শুরু হলো করাচীতে। এই ম্যাচে ভারতীয় দুর্বল

বোলারদের বিধ্বস্ত করে ম্যাচ জেতার এক দুর্লভ নজির রাখলেন পাকিস্তানী ব্যাটধারীরা। মাত্র শেষ দিনে ৯৫ মিনিট সময় হাতে পেয়ে তারা তুলে নিলেন ১৬৫ রান, যা দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন প্রেসবক্সে বসে থাকা পাকা মাথাওয়ালা সাংবাদিকের দল।

করাচীর উইকেটে রান ওঠার প্রত্যাশা ছিল সকলের। এই উইকেটে ভারতীয় দল নিলো প্রথম ব্যাট করার সুযোগ। অথচ আশ্চর্য এমন একটা রান সর্বস্ব নিষ্প্রাণ উইকেটে প্রথম জুটিতে মাঝারি গোছের রান ওঠা সত্ত্বেও, ভারতীয় ব্যাটধারীরা নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারলেন না। শুরুতে সরফরাজ, ইমরাণের দুরন্ত বোলিং-এর সামনে মোকাবিলা করে চমৎকার একটি বীর দীপ্ত ইনিংস খেললেন গাভাসকার। উইকেটের চারদিকে তিনি পাকিস্তানী বলবাজদের পেটালেন যত্রতত্র। তাঁর খেলার মধ্যে ছিল সাবলীল শ্রম ভঙ্গিমা। এই ম্যাচে সানি করলেন সুন্দর একটা সেনচুরি। চৌহান করলেন ৩৩ রান। এছাড়া মধ্য-দিককার আর কোন ব্যাটধারীর ব্যাট থেকে রান উঠতে দেখা গেল না। প্রথম দুটি টেস্টে যে বিশ্বনাথ সৌন্দর্যদীপ্ত ব্যাটিং-এর পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই তিনি এই ম্যাচে দুটি ইনিংসে ফিরে গেলেন বিফল মনোরথে। প্রথম ইনিংসে ভিশ করলেন এক রান, দ্বিতীয় ইনিংসে শূন্য রান। অথচ ব্যাটিং-এর দিকে এই ম্যাচে সানি উভয় ইনিংসে সেনচুরি করে বিশ্ব ক্রিকেটে সৃষ্টি করলেন এক নয়া নজির। শেষ দিকে তরুণ কপিলদেব রাখলেন এক সাহসী খেলার পরিচয়। ইমরান, মুস্তাক সরফরাজ, মুদাসসর নজরকে বেধড়ক ঠেঙিয়ে কপিল-দেব পুরণ করলেন নিজস্ব অর্ধশত রান। প্রথম ইনিংস ভারতের শেষ হলো ৩৪৪ রানে। সরফরাজ পেলেন ৩১ ওভার বোলিং করে একাশি রানে চারটি উইকেট। ইমরান খান পেলেন ৩২ ওভার বোলিং করে পচাত্তর রানে তিনটি উইকেট। ভারতীয় ব্যাটিং-এর প্রকাশ্যে পেশ বোলিং-এর দুর্বলতার বিরুদ্ধে পাকিস্তানীরা গড়লেন ৯

উইকেটে ৪৮১ রানের ইনিংস। মজিদ খান ও জাভেদ মিঁয়াদাদ অস্তত সুন্দর ইনিংস গড়লেন। জাহির আব্বাস ৪২ রানের ইনিংস গড়লেও তাঁর খেলার মধ্যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল না। তবে তাঁর এই অতৃপ্ত ক্রিকেটকে ষোলোআনা পুষিয়ে দিয়েছিলেন জাভেদ মিঁয়াদাদ ও মুস্তাক। জাভেদ শতরান পূরণ করলেও, মুস্তাক পারলেন না। কিছুটা যেন সেনচুরির প্রতি ইচ্ছাকৃত উদাসীনতা দেখিয়ে মুস্তাক তাঁর উইকেটটিকে দান করে গেলেন ভারতীয় বোলারদের নির্মম করুণ শ্রমচিত্র প্রদর্শন করে। এই ইনিংসে মুদাসসর নজর ৫৭টি তাজা রান পেলেও, তার ব্যাটিং-এর মধ্যে কোন জলুস বা রকমারী রূপ চাতুর্য ছিল না। শান্ত মাঝারি ক্রিকেটের মাধ্যমে মুদাসসর নজরের সাদামাঠা ইনিংসটি দর্শকেরা মনে রাখলেও, দলের রান সংগ্রহের সঙ্গে এই ৫৭টি রান যুক্ত হওয়ায় পাকিস্তানের রান পৌঁছলো ৪৮১ রানেতে। কপিলদেব ও চন্দ্র এই ইনিংসে পেলেন তিনটি করে উইকেট। ঘাউড়ি তুটি উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দলের ব্যাটিং চেহারা খুব একটা পরিবর্তন হলো না। সেই এক সবেধন নীলমণি সানি ছিলেন ভরসা। এই ইনিংসে সানি আবার করলেন শতরান। কপিল-ঘাউড়ি ব্যাটিং করলেন চমৎকার। বিপর্যয়ের মধ্যে সানি—ঘাউড়ির জুটি রান তুললো ১৪৬টি। একসময় ভারতীয় দলের রান ছিল ৬ উইকেটে ১৭৩ রান। এই রান সানি-ঘাউড়ির যৌথ প্রচেষ্টায় এসে পৌঁছলো ২৪৬ রানে। এই ইনিংসে ঘাউড়ি ব্যাট করলেন তু ঘণ্টা কুড়ি মিনিট সময়। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সংগ্রহ করলেন ৩২ রান। মাত্র ৩০০ রানে শেষ হয়ে যাওয়ায় ভারতীয় দলের সংগৃহীত রানের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের ওপর রান ছিল সানির ব্যক্তিগত সংগ্রহ। সানি করেছিলেন ১৩৭ রান।

জেতার জন্য পাকিস্তানীরা যখন ব্যাট হাতে খেলতে নামলেন তখন তাঁদের প্রয়োজন ছিল ৯৫ মিনিটে ১৬৪ রান—এই রান যে

কোনমতে সংগ্রহ করা পাকিস্তানীদের পক্ষে সম্ভব নয় এই ধারণাই ছিল সকলের। কিন্তু পাকিস্তানীদের ব্যাটিং চিত্রটি সেদিন যারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁরাই দেখেছেন ঝড়ো ক্রিকেট কাকে বলে। সামুদ্রিক ঝড়ো গতিতে ভারতীয় স্পিন বোলিংকে তছনছ করে দিয়ে এই ম্যাচে জাবেদ মিঁয়াদাদ ও ইমরান যে খেলার নজির রাখলেন, তা ছিল অতুলনীয়। এই অবস্থাকে আরো কিছুটা সক্রিয় ভূমিকায় এগিয়ে আনতে সাহায্য করলেন ভারতীয় অধিনায়ক বেদী। শেষ প্রান্তে বল হাতে নিয়ে মাত্র চার ওভারে বেদী ইমরানকে পুরস্কার দিলেন কষ্টহীন চারটি বাউণ্ডারী সহ দুটি ছক্কা। মোট চার ওভারে বেদীর বলে রান উঠেছিল তেত্রিশটি। শেষ ওভারের সাতটি বল বাকি থাকা অবস্থায় আট উইকেটে এক সংগ্রামী মারমুখী ঝড়ো ক্রিকেটের নজির স্থাপন করে ম্যাচ জিতে গেলেন মুস্তাক বাহিনী। মোট সফরে ২-০ ম্যাচে পাকিস্তানী ব্যাটধারীদের গৌরবদীপ্ত অবর্ণনীয় দাপটে, ভারতীয় স্পিন বোলারেরা মুষিক অবস্থায় পর্যবতিত হয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের সম্মান ও ঐতিহ্যকে পথ বসিয়ে নিলর্জ্জের মতো ফিরে এলেন স্বদেশে। পাকিস্তান সফর তাই সব মিলিয়ে ছিল কলঙ্কের বছর। শুধু তাই নয়, এই সফরে বেদী একটি এক দিনের খেলায় সরফরাজের বাউনসারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ম্যাচ ছেড়ে দিয়ে দল নিয়ে রাগকরে মাঠের বাইরে চলে যান। বেদীর এই প্রতিবাদের ধরনটি পাকিস্তানী বিশেষজ্ঞদের চোখে ভাল লাগেনি। শুধু তাদের নয়, বেদীর এই অখেলোয়াড়োচিত মনোভাবের বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন আমাদের দেশের কিছুস্থানীয় কলম চোয্যের দল। আর সেই সুবাদে 'যারে দেখতে নারি, তার চলন বেঁকা' প্রবাদে দলের নেতৃত্বের পদ থেকে খারিজ হয়ে গেলেন বেদী সাহেব।

বেদী যে এককালে বড় বোলার ছিলেন, বা তাঁর বোলিং-এর ধার ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে যে গর্বের বিষয় ছিল মনে হয় কর্তৃপক্ষ

সে সব কথা ভুলে গিয়েছিলেন পাকিস্তানের কাছে হার মানার পর। আর সেই কারণে তাঁকে দল থেকে হেয় প্রতিপন্ন করে নেতৃত্বের পদ বাতিল করে দিয়ে দলের দায়িত্ব সকলে মিলে চাপিয়ে দিলেন সানির ওপর। তাই বলাযায় ওই এক পাকিস্তান সফর ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

পাকিস্তান সফর শেষ হলো।

এবার আসন্ন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে দেখা।

দলের দায়িত্ব নিলেন সানি। অন্যপ্রান্তে ক্যারি প্যাকারের আঁচ সামলাতে দামী খেলোয়াড়হীন ক্যারিবিয়ান দলের দায়িত্ব নিয়ে ভারতে এলেন কালীচরণ। দল হিসাবে কালীচরণের দল খুব একটা বেশী জোরী নয়। সবাই প্রায় নতুন খেলোয়াড়—তা সত্ত্বেও ক্রিকেট জমে ওঠার প্রত্যাশায় উভয় দলই নামলো কোমর বেঁধে।

কালীচরণ এলেন

পাকিস্তান সফরে শোচনীয় বিপর্যয় দেখে ভারতীয় ক্রিকেট সম্পর্কে কর্তাব্যক্তিদের বড়াই করার মতো কিছুই থাকলো না। হকির পর পাকিস্তানীদের হাতে ক্রিকেট সম্মান বিনষ্ট হওয়ায়, বোদ্ধা কলমবাজেরা শুরু করে দিলেন দল গঠনের পূর্ণবিন্যাসের দাবী দিয়ে জোরদার আন্দোলন। কর্মকর্তার দল পীঠ বাঁচাতে দলীয় ব্যর্থতার সমস্ত দোষ তুলে দিলেন বর্তমান দলনায়ক বেদীর ওপর। একেই বেদীর বোলিং বিষয়ে বিভিন্ন মহলে বহু রকমের সন্দেহসূচক কানাঘুষো বহু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, এবার সেই সন্দেহ পাকাপাকি ভাবে দানা বাধলো পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে তাঁর অসাফল্যের চেহারা দেখে।

"যত দোষ নন্দ ঘোষ"—এই চলতি বাংলা প্রবাদ বিদ্ধ বেদী সাহেব নিজের সপক্ষে একটিও যুক্তি খাড়া করতে পারলেন না। বহুদিন আগে কোথায় যেন পড়েছিলাম একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাহেবের ভারতীয়দের চরিত্র সম্পর্কে একটি মন্তব্য। তিনি বক্তা হিসাবে ভারতীয় চরিত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন—"আমার বিগত অভিজ্ঞতায় আমি ভারতীয়দের চরিত্র বিষয়ে যাহা বুঝিয়াছি, তাহা পর্যালোচনা করিলে আমার সহজ মন্তব্যটি ভারতীয়দের কর্ণে আদৌ শ্রুতিমধুর হইয়া প্রবেশ করিবে না। ভারতীয়রা আদপে যতটা সরল, ঠিক ততটাই বোকা। তাহা বাহ্য চটকের মোহে পড়িয়া এত বেশী অনুভূতিপ্রবণ হইয়া উঠে যে নিজেদের ধারণায় তাহারা কোন যুক্তি মানিতে চাহে না। কেহ একবার কোন অপরাধে দোষী সাবস্ত হইলে, পূর্ণবিবেচনা করিবার মতো যুক্তি গুণ তাঁহাদের মনে থাকে না। যাহাকে তাহারা অপছন্দ করে তাহাকে তাহারা সমাজ বর্জন করিতে ভালোবাসে। কোনরূপ বিচার বিবেচনা না করিয়া লঘু পাপে গুরু দণ্ড পর্যন্ত দিতেও কসুর করে না।"

বিদেশী সেই বক্তা সাহেবটির সঙ্গে আমার কোন সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটা এখন আর সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হতো তাহলে তাঁকে সাধুবাদ জানিয়ে বলতাম—"আহা মশাই, আপনাকে স্পষ্ট কথা বলার জন্য ধন্যবাদ। আমি নিজে একজন ভারতীয় হয়ে আপনার এই উক্তিটিকে সমর্থন করার মতো মানসিক জোর আমার আছে। সত্যি আপনি ভারতীয় চরিত্রকে যথার্থভাবে চিনিয়েছেন!"

হয়ত আমার কথায় অনেকেই চটবেন। তবু বলি দয়া করে চটাচটি না করে একবার বলুন তো, এক পাকিস্তান সফরে অকৃতকার্য হওয়ায় বেদী চরিত্রের এমন কি দোষ দেখা দিল, যে তাঁকে রাতারাতি অধিনায়ক পদ থেকে সরিয়ে ফেলেও কর্মকর্তারা সুখী হলেন না, দস্তুরমত বাদ দিয়ে বসলেন দল থেকে! বেদী কি ভারতীয় ক্রিকেটের যা মান, সে তুলনায় কি তিনি খুব নিচুমানের একজন বোলার?

যদি তাই হয়তো তাহলে গোটা ভারতবাসী এতদিন তাঁকে কোন প্রত্যাশায় বুকের রক্তে লালন করছিলেন একটি বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টির আশায়? আসলে কি জানেন, বেদী ছেড়ে কর্মকর্তাদের জিহ্বায় এখন 'সানি গাভাসকর' নামক একটি উপাদেয় নামে লালসার ঝোল গড়িয়ে পড়ছে, অতএব এই রসালো রসনার পরিতৃপ্তির জন্যই বেদীর প্রতি সহসা এহেন বীতরাগ জন্মেছে আমাদের কর্তাদের।

এমন ঘটনা অবশ্য ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে নতুন নয়, বহুবার এ হেন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার নজির আমাদের জানা আছে। তাই বেদী সাহেব দুঃখিত হলেও জনা কয়েক আমার মতো ভেতো ক্রিকেট দর্শক কর্মকর্তদের কাণ্ডকারখানা দেখে মুখ টিপে দেবতার মতো হেসে বলেছিলেন—"অহ্ এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি, পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি।" অর্থাৎ কিনা, ওহে সানি গাভাসকার, 'মুরগীপোষা ক্রিকেট কর্তাদের প্রেম, তোমার বরাতে টিকলে হয়।

সেদিনের ওই গুটি কয়েক বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য যে হাড়ে হাড়ে সঠিক হয়েছে তার প্রমাণ মিলেছে একটি বছর কাটতে না কাটতেই। ল্যাজে পা পড়ায় সানির ওপর ফুঁসে উঠেছিলেন কুলপানা চক্র বিশিষ্ট একদল স্বার্থপর ক্রিকেট-অনভিজ্ঞ ক্রিকেট কর্মকর্তার দল। বলতে বাধা নেই, তাঁরা যে একেকজন ক্রিকেটের নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ এই কথাটা এখন প্রায় সবাই জেনে গেছেন। সানিকে খারিজ করার পিছনে তাঁরা বেদীর ব্যর্থতার মতো কোন দায়সারা যুক্তি খাড়া করতে পারেননি। প্যাকার সাহেবকে ধন্যবাদ, একমাত্র তার সার্কাসে যোগ দেওয়ার হুমকি প্রদর্শনেই সানির প্রতি কর্তা ব্যক্তিদের ক্রিকেট উন্নতি না চাওয়া মনোভাবের পরিচয় বড় তাড়াতাড়ি পেয়ে গেছেন ভারতবাসী। বহুকালের দিবাস্বপ্নে নিমগ্ন ভেঙ্কট তার দীর্ঘ ক্রিকেট জীবনের আনুগত্যের পুরস্কার হিসাবে সানির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন অধিনায়কের সম্মান।

থাক অধিনায়ক বদল প্রসঙ্গ, এবার আমরা ফিরে আসি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের কথায়। বলা বাহুল্য কালীচরণের দল, শক্তি বিচারে অন্য বছরের তুলনায় খুব একটা শক্তিশালী ছিল না। লয়েড, রিচার্ড, গ্রিনিজ, হোল্ডিং, গার্ডার্নার, ক্রফটের মতো খেলোয়াড় ছাড়াই ক্যারিবিয়ান দল এলো এক নতুন চেহারায় ভারত সফরে। দলের অধিকাংশ খেলোয়াড় যেমন ছিলেন বয়সে তরুণ, তেমনি ছিলেন অনভিজ্ঞ। তবু সত্যি বলতে কি এই সফর ছিল খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক।

বোম্বাইয়ের রান সর্বস্ব উইকেটে টসে জেতা কালীচরণ ভিজে উইকেটে সানিকে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ দিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলায় ভারতীয়দের নিয়ে গেলেন একটা স্বস্তিকর জায়গায়। দিন শেষে ছ ঘণ্টায় রান উঠলো ৫ উইকেটে ৩৫১ রান। এই ম্যাচটিতে অসাধারণ ব্যাটিংয়ের পরিচয় দিলেন গাভাসকার। উইকেটের চারিদিকে ব্যাট চালিয়ে ক্যারিবিয়ান ঐতিহ্যশালী বোলিংয়ের সমস্ত অহমিকাকে বিপর্যস্ত করে পূরণ করলেন নিজস্ব দ্বিশত রান। তাঁর এই গরিমাদীপ্ত ইনিংসটির নজির যেন আগের সমস্ত মণিমাণিক্যখচিত ইনিংসকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় দলের সংগৃহীত ৩৫১ রানের মধ্যে সানির সংগ্রহ ছিল ২০৫ রান। একথা ঠিক—এই দিন সানিকে বাদ দিলে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের ছিল ভঙ্গুর দশা প্রাপ্ত। এই ইনিংসে ভিশ একটি সুন্দর ছবি আঁকলেন। বর্ণের চিত্রালী রূপ বিন্যাসে ভিশের ব্যাটিং চিত্রটিকে তুলনা করা যায় প্রখ্যাত চিত্রকর মাতিশের তুলির সঙ্গে। উচ্চাঙ্গের মাধুর্য নিয়ে ভিশ গড়লেন তার ক্রিকেট জীবনের অর্ধশত রানের নজির। শেষ অবধি ভারতীয় দল গড়লো ৪২৪ রানের একটা বিশাল ইনিংস। বড় রানের কাঠামোয় তৈরী ভারতীয় ইনিংসের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তরুণ খেলোয়াড়েরা অনেকেই দাঁড়াতে পারলেন না।

মাত্র ১৩ রানে দুই উইকেট পতনের পর দলের হাল ধরলেন অভিজ্ঞ বাঁ হাতি ব্যাটধারী অধিনায়ক কালীচরণ। উইকেটের চার

দিকে দর্শনীয় মার মেরে খেললেন কালীচরণ। তবে একথা ঠিক এই ম্যাচে কালীচরণ আপন আত্মপ্রত্যয়ের জন্য সেনচুরি পাওয়ার অধিকারী হলেও এর পিছনে ভারতীয় ফিল্ডসম্যানদের কৃতিত্বও কম ছিল না। নিদেনপক্ষে তিন তিনটি ক্যাচ ফেলে দিয়ে ভারতীয় ফিল্ডসম্যানেরা যেন স্বেচ্ছায় একটি শতরান উপহার দিলেন দলপতি কালীচরণকে। ৪৭ রান থেকে ৫৪ রানের মধ্যে অন্তত দু'দুবার নিজের সৌভাগ্যের দোহাইতে ক্রিকেটের মতো একটা অনিশ্চিত খেলায় নিশ্চিন্ত হয়ে ব্যাট করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। নির্দিষ্ট রানের নিয়তি পার হওয়ার পর কালীচরণ আবার তাঁর সহজ ভঙ্গিমায় নতুন উদ্যমে খেলা শুরু করলেন। দিনের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান উঠল ১৮৪। এই রানের মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগ রান এলো কালীচরণেরব্যাট থেকেতিনি দিনশেষে অপরাজিত হয়ে ফিরে এলেন ১০৩ রানে। পরের দিন বোম্বাইয়ের উইকেটে প্রাথমিক বিপর্যয় টপকে নিজেদের আস্থা সম্পন্ন চরিত্র প্রকাশ করতে দ্বিধা করলেন না ক্যারিবিয়ান ব্যাট-ধারীরা। তাঁর অনবদ্য ইনিংসটি কোন অংশেই সানির ইনিংসের চাইতে কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। সবাই প্রত্যাশা করেছিলেন কালীচরণ যেভাবে খেলা শুরু করেছেন, তাতে তিনি অবশ্যই একটি দ্বিশত রানের ইনিংস গড়বেন। কিন্তু ক্রিকেট বিধাতার মনে হয় এহেন মানসিক ইচ্ছা ছিল না, তাই তিনি সদপিত ১৮৭ রানের একটি সুন্দর ইনিংস গড়ে কপিলদেবের বলে লেগ বিফোর আউট হয়ে বিদায় নিলেন উইকেট থেকে। এই অপ্রত্যাশিত আউটের জন্য ভারতীয়াদর মনে আনন্দের বন্যা এনে দিলেও কালীচরণ কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে খুশী হলেন না। আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করে ফিরে এলেন তিনি প্যাভেলিয়ানে। শেষ অবধি ৪৯৩ রানের ইনিংস গড়ে ক্যারিবিয়ান দল তাঁদের দান শেষ করলো। চতুর্থ দিনে খেলার বহর দেখে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল খেলার গতি কোনদিকে ধাবিত হবে। শেষ অবধি হলোও তাই—প্রথম টেস্ট ম্যাচ লিখিত ফলাফলের পথ ধরে শেষ

হলো অমীমাংসিতভাবে। দ্বিতীয় ইনিংসে গাভাসকার আউট হলেন ৭৩ রানে। মোট ২ উইকেটে ২২৪ রান ওঠার সুবাদে শেষ হলো প্রথম টেস্টের শেষ দিনের খেলা।

বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্ট দুর্ভাগ্যভাবে হাতছাড়া হলো। জয় হাতের মুঠোয় নিয়েও ধরে রাখতে পারলেন না অধিনায়ক স্নীল গাভাসকার। রাজনৈতিক কুঠারঘাতে ক্রিকেটের বুকে লেপন হলো এক চরম কলঙ্ক। চতুর্থ দিনের শেষে ঘাউড়ির বোলিং চাতুর্যে ক্রিকেটের চেহারা এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল যে ভারতের জয় কোন মতেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না কালীচরণের পক্ষে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে গড়ে তুলেছিল ৪৩৭ রান। শুরুতেই ভারতীয় দল হয়ে পড়েছিল বিপর্যয়-গ্রস্ত। দিনের প্রথম বলে ক্লার্কের দেরীতে ভাঙা সুইং বলে ব্যাট ছুঁয়ে সানি শূন্য রানে আউট হয়ে ফিরে এলেন। গালিতে দাঁড়িয়ে শিব-নারায়ণ সেদিন যে উত্তপ্ত নিচু ক্যাচটি মাটি থেকে খামচি মেরে তুলে নিয়েছিলেন, তা সত্যিই ছিল প্রশংসনীয়। এরপর বিপর্যয় ঠেকাতে প্রথমে অংশুমান-বেঙ্গসরকার ও পরে ভিশ তাঁর ক্রীড়া জীবনের এক অনবদ্য ইনিংস খেল:লন।

উইকেটের চারদিকে কাব্যিক রস বিন্যাসে দরদী ব্যাটের দরবারি মূর্ছনায় সেদিন ভিশ যে ক্রিকেট বুকে সঙ্গীত সুর সৃষ্টি করেছিলনে তা ছিল দর্শনীয়। অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে ব্যাট ধরে ভিশ এই ইনিংসে করলেন ৭৩ রান, সেই সঙ্গে সেনচুরির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তরুণ অংশুমানকে। দুর্ভাগ্য অংশুমানের—এত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি সেনচুরি করতে পারলেন না। নিজস্ব ৮৭ রানে শেষ পর্যন্ত বোল্ড হলেন প্যারীর বলে। ভিশের সেনচুরি এই ইনিংসে হওয়া উচিত ছিল। এই ম্যাচে সত্যি তিনি সানির অবর্তমানের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে খেলেছিলেন ছবির মতো কেতাবী খেলা। ৭৩ রানের পর সাধক শিল্পীর রূপ সাধনায় ঘটেছিল ছন্দপতন। দেখে মনে হলো তিনি যেন প্যাভেলিয়ানে ফিরে বিশ্রামের

তাগিদায় চকিতে আত্মঘাতী হয়ে ক্লার্কের একটি সাধারণ বলে ক্যাচ তুলে দিয়ে অতি সহজভাবে একটি ইনিংসকে অপ্রত্যাশিত ভাবেই গুটিয়ে নিলেন। ভারতীয় দলের ইনিংস শেষ হলো ৩৭১ রানে। প্রথম ইনিংসে ৬৬ রানে এগিয়ে থাকা কালীচরণের দল কিন্তু দ্বিতীয় দফায় অগ্রগতির অনুকূল পরিবেশকে ধরে রাখতে পারলো না। বাঁ হাতি ঘাউড়ির চকিত ধাক্কায় তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল ক্যারিবিয়ান ইনিংস। মাত্র ২০০ রানে তাদের পড়ে গেল আট আটটি উইকেট। ভারতের জয় তখন এক প্রকার নিশ্চিত ছিল, গতি বদল হলো ক্রিকেটের। দুর্ভাগ্য সানির—অধিনায়ক হিসাবে জয়ের স্বাদ হাতের মুঠোয় এসেও তা ধরা দিল না।

আবার অপেক্ষা।

এবার ইডেন।

ইডেন, স্বপ্নের ইডেন। ভিশের শিল্প সাধনার অমরভূমি এই নন্দন কানন। এই উদ্যানে ভিশ তাঁর আগের গৌরবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না। এবার ভিশের পরিবর্তে ইডেনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন অধিনায়ক সানি। তাঁর ব্যাট থেকে নির্ঝরিণী ধারায় বর্ষিত হলো উভয় ইনিংসে সেনচুরির মহাগরিমা। দ্বিতীয় দিনে দাপটের সঙ্গে ব্যাট করে শেষ পর্যন্ত কপিলদেবের সহযোগিতায় ভারতের রান উঠলো ৩০০। গাভাসকার ১০৭, ভিশ ৩২, কপিলদেবের রান নিয়ে মনমাতানো ৩০০ রান। ভারতীয় ফিল্ডসম্যানদের বদান্যতায় উইলিয়ামস পেলেন সেনচুরি। তৃতীয় দিনে কালীচরণ ৫৫ রানে ও শিবনারায়ণ ৪৮ রানে ঘাউড়ির বলে বিদায় নেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আউট হলো ৩২৭ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত জয়ের প্রত্যাশায় খেললো মারমুখী ক্রিকেট। ক্যারিবিয়ান পেশম্যানদের বিধ্বস্ত করে গাভাসকার ও দিলীপ বেঙ্কসরকারের সহযোগিতায় রান উঠলো এক উইকেটে ৩৬১ রান। সানি করলেন ১৮২ ও দিলীপ ১৫৭ রান। এই ইনিংসে সানি চেষ্টা করলে হয়ত দ্বিশত রান তুলতে পারতেন, কিন্তু

অধিনায়কোচিত দায়িত্ববোধ কাঁধে থাকায় ব্যক্তিগত গরিমাকে বিসর্জন দিয়ে দলের প্রয়োজনে দান ছেড়ে দিলেন। সানির এই প্রত্যাশা সফল হয়েছিল। পঞ্চম দিনে দিনভোর ছিল জমাটি নাটকীয় আসর। চমৎকার বোলিং করলেন ঘাউড়ি। ভারতের অনুকূলে ম্যাচ এসেছিল নরসীমা রাওয়ের বলে কালীচরণের বিদায়ের পর। ১৩৩ রানে কালীচরণ ফিরলেন নিজস্ব ৪৬ রান করে। এরপর একে একে বিদায় নিলেন মারে, প্যারী, উইলিয়ামস, ফিলিপ, হোলডার। ১৯৭ রানে ৯ উইকেট পতনের মুখে শিবনারায়ণ অসম্ভব দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন। ভারতের জয় তখন হাতের মুঠোয়। আর একটা মাত্র উইকেট। ওই অবস্থায় শিবনারায়ণ আলোর প্রতিবাদে খেলতে না চাওয়ায় গোটা মাঠ উষ্ণ হয়ে উঠলেও মান বেঁচেছিল ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের। শেষ অবধি আম্পায়ারদ্বয় শিবনারায়ণের প্রতিবাদে মত দিয়ে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের নাটকীয় উত্তেজনার পর্ব শেষ করলেন। জয় হাতের মুঠোয় পাওয়া সত্ত্বেও তা আবার পিছলে গেল ভাগ্যাহত অধিনায়ক সানির হাত থেকে।

মাদ্রাজের চতুর্থ টেস্টের প্রথম দিনে ভারতীয় বোলারেরা নিরেট শক্ত পীচে ক্যারিবিয়ানদের টুঁটি চিপে ধরা সত্ত্বেও, শেষ মুহূর্তে তা হয়ে গেল হাতছাড়া। ৬ উইকেটে ৬৮ রানের একটি করুণ ইনিংসকে তারা টেনে নিয়ে গেল ২২৮ রানে। চার বছর আগে এই উইকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১৫৪ রানে আউট হয়ে ছিল প্রসন্ন ও বেদীর কল্যাণে। এবার উইকেটে এই স্পিন যুগলের অনুপস্থিতি ছিল। অল্প রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে কাবু করলেও ভারতীয় ব্যাটধারীরা লাফানো শক্ত পীচে সাহস দেখিয়ে ব্যাট ধরতে পারলেন না। মাত্র দশরানে গাভাসকারের মতো একজন রান সংগ্রহকারী ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যাওয়ায় ভারতীয় দল প্রথমটায় অসম্ভব দমে গেল। তবে এই প্রতিকূল অবস্থাকে অনু-কূলে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টার ত্রুটি করলেন না বিশ্বনাথ। নিজের

স্বশিল্প মেজাজে আপন ঘরানায় করলেন দাপটের সঙ্গে ব্যাটিং। তাঁর ব্যাটিং-এর মধ্যে যেমন ছিল শিল্পের ধ্রুপদী মহিমা ও বৈভব, তেমনি ছিল সাহসী মনের বীর্যদীপ্ত উষ্মা। উইকেটের চার পাশে ব্যাট চালিয়ে এইদিন তিনি যেন লালবলকে প্রহার করার মনোবৃত্তি নিয়েই হাজির হয়েছিলেন। চীপকের বুকে 'বাম্পার' বৃষ্টিতে ভারতীয় ব্যাটধারীদের বিধ্বস্ত করার চেষ্টা করলেও, তাঁরা ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না বিশ্বনাথের স্বমহিমা নির্যাসিত শিল্প চেতনাকে। ভারতীয় ক্রিকেট অর্জুন আপন গাণ্ডীবের ইন্দ্রজাল বিস্তারে গোটা চীপকের চেহারাকে বদলে দিলেন নিজস্ব ১২৪ রানের মহিমায়। ২৫৫ রানে শেষ হয়ে যায় ভারতীয় দলের ইনিংস। নাটক বদল হলো ক্যারিবিয়ানদের দ্বিতীয় দফায়। ঘাউড়ি ও ভেঙ্কট রাঘবনের যৌথ চেষ্টায় কালীচরণের দল স্পিনের ইন্দ্রজালের মোহে বাধা পড়ে ইনিংস উৎসর্গ করলো মাত্র ১৫১ রানে।

জয় তখন হাতের মুঠোয়। নব উন্মাদনায় ভারতীয় দল শুরু করলো দ্বিতীয় দফার ব্যাটিং পর্ব। বাম্পারে চীপক তখন বিধ্বস্ত। ওই অবস্থায় সানি আবার ব্যর্থ হলেন। শুধু একা তিনি নন, এবার তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উইকেট থেকে বিদায় নিলেন চৌহান ও বেঙ্কসরকার। তিরিশ রানে তিনটি উইকেটের পতনের পর ত্রাণকর্তা ভিশ ধরলেন দলের হাল। দেখেশুনে খেলে অশুংমানের সঙ্গে তিনি দলকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে। চতুর্থ উইকেটের পতন ঘটলো ৭৪ রানে। নিজস্ব উনত্রিশ রানে বিদায় নিলেন অশুংমান। এরপর ক্রিকেটের চরম সন্ধিক্ষণে বিদায় নিলেন ভিশ, নরসিমা রাও ও ঘাউড়ি। দল তখন জয়ের খুব কাছে এসে পৌঁচেছে। শেষ মুহূর্তে কিরমানির সঙ্গে সাহস দেখিয়ে ব্যাট করে কপিল বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে তিন উইকেটে জিতিয়ে দিলেন ভারতকে।

ভারত জিতলো।

অধিনায়ক হিসাবে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলেন সানি। সেই

সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটে আবার প্রমাণিত হলো বিশ্বনাথের প্রয়োজনীয়তা। বিশ্বনাথ যে ম্যাচ মন দিয়ে খেলেছেন, সেই ম্যাচেই জয়ের মুখ দেখেছে ভারতীয় দল—কথাটা যে মিথ্যে নয় তার পূর্ণবিচার মাদ্রাজে নতুন করে প্রমাণিত হলো।

দিল্লীর চতুর্থ টেস্ট চরম উত্তেজনার মধ্যে যেখানে শেষ হওয়ার কথা ছিল, সেই ম্যাচ শেষ হলো অমীমাংসিত ভাবে। বৃষ্টি বাদ সাধায় ভারত অনুকূল অবস্থার মধ্যে পা দিয়েও, দুর্ভাগ্যবশতঃ সুযোগ গ্রহণ করতে পারলো না। অতিসাধারণ ভাবে শেষ হয়েছিল চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ।

এই ম্যাচে ভারত গড়েছিল প্রথম দিনের প্রথম ইনিংসে ছ উইকেটে ৫২৩ রান, যা একটি বড় রানের অনন্য নজির। দিলীপ বেঙ্কসরকার এই ইনিংসে তাঁর ক্রিকেট জীবনের দ্বিতীয় সেনচুরিটি পুরস্কার পেলেন। দ্বিতীয় দিনে ঝড়ো বাতাস ব্যাটের ডগায় কপিলদেব পূরণ করলেন তাঁর ক্রিকেট জীবনের প্রথম সেনচুরি। মুগ্ধ এই তেজস্বী রানের জন্য কপিলের প্রয়োজন হয় মাত্র ১১০টি বল খেলার। মোট ৫৬৬ রানের একটা বড় ইনিংস গড়ে ভারত দান ছেড়ে দেয় কালীচরণের হাতে। দিল্লীর উইকেটে ক্যারিবিয়ান ক্যালিপসো তাঁদের পুরনো ঐতিহ্যের মুর্ছনায় মোহিত করতে পারেনি। বরং ভারতীয় আক্রমণের সামনে ব্যাটিং উইকেটের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা দিয়েছিল দৈন্যতার পরিচয়। মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে আস্ত একটা সতেজ ইনিংস তাসের ঘরের মতো গুঁড়িয়ে গেল ভারতীয় পেশম্যানদের হাল্কা ধাক্কায়। কপিল তার কলজে নিক্ষিপ্ত তাজা লাল বলের অগ্নি দংশনে ছিনিয়ে নিলেন তিন তিনটি সতেজ ব্যাটধারীকে। চমৎকার বোলিং করেছিলেন ঘাউড়ি। মাত্র ৫৪ রানে তিনি দখল করেছিলেন তিনটী উইকেট। এই ঘাউড়ি চলতি মরশুমে সত্যি ভারি চমৎকার বোলিং করেছেন। তাঁর প্রতি আত্মবিশ্বাস ছিল অধিনায়ক সানি। তিনি সাংবাদিকদের

প্রকাশ্যে বলেওছিলেন, ম্যাচ যদি কেউ জেতাতে পারে তো ঘাউড়ি পারবে। সানির এই প্রত্যাশা হয়ত এই ম্যাচে কার্যকরী অবশ্যই হতো, যদি না ক্রিকেট নাটকের শেষ অঙ্ক বৃষ্টির আতিশয্যে পণ্ড হয়ে যেত। শেষ দিনে আকাশ ঝাঁপানো বৃষ্টি সানির সৌভাগ্যের সামনে দাঁড়ালো দুর্ভাগ্যের অচলায়তন গড়ে। শেষ দুটি দিনের খেলা বৃষ্টির হাতে কয়েদ জীবন ভোগ করেছিল ৪৬০ মিনিট। মূল্যবান এই সময়টুকু ক্রিকেট থেকে বাদ না পড়লে, হয়ত কালীচরণ ও তাঁর দলের খেলোয়াড়দের পক্ষে সম্ভব হতো না মাত্র তিন ঘণ্টায় ১৭৯ রান তুলে সাত উইকেট হাতে নিয়ে ম্যাচ বাঁচানো। তবু সময় ভারত পেয়েছিল, উচিত ছিল ভিজে পিচে তিন ঘণ্টায় ক্যারিবিয়ানদের হলুদ উইকেট আগলানো প্রাণ ধসিয়ে দেওয়া, কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি কেবল মাত্র ভারতীয় বোলারদের অনচ্ছাসম্পন্ন বাজে বোলিং-এর জন্য। অথচ একথা ঠিক বৃষ্টিতে ভিজে শেষ দিকে পিচের যা চেহারা হয়েছিল, তা ছিল ভারতীয় স্পিন ঐতিহ্যের পক্ষে আশাপ্রদ। বেদী, প্রসন্ন, চন্দ্র যদি তাঁদের যৌবনকালে এই ধরনের উইকেটে সাহায্য পেতেন তাহলে ম্যাচ জেতার পক্ষে তিন ঘণ্টার বাজে শ্রম তাঁরা নষ্ট হতে দিতেন না। অথচ সেই সুযোগ হাতের মুঠোয় পেয়েও ভারতীয় বোলার, যাঁদের ওপর কর্মকর্তাদের বিশাল আশা—সেই পারসানা বা ঘাউড়ি পারলেন না স্পিনের কৌশলে সুযোগ আদায় করতে। চন্দ্র এই ম্যাচে খেলেছিলেন বটে, তবে তাঁর বোলিং চেহারা ছিল যৌবনস্বর্গভ্রষ্টের দেবতার মতো। নিদেনপক্ষে এই ম্যাচে যদি প্রসন্ন, বেদীর একজন বর্তমান থাকতেন, তাহলে হয়ত এই ম্যাচ ভারতের হাতছাড়া হতো না।

তবু বলি—যা হয়নি, তা হয়নি।

৩রা ফেব্রুয়ারী—কানপুরের গ্রীন পার্কে অনুষ্ঠিত হলো চলতি সফরের শেষ পর্যায়ের খেলা। এই সফর ছিল ছটি টেস্ট ম্যাচের।

কানপুরের উদ্যান বিশ্বনাথ ক্রিকেটের মাতৃভূমি। গ্রীনপার্কের এই ঐতিহ্যপূর্ণ উদ্যানেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম আবির্ভাবে ভিশের ক্রিকেট জীবনের সৌভাগ্য দুয়ার খুলেছিল। কানপুর যে বিশ্বনাথকে ব্যর্থ করবে না, এই প্রত্যাশাই ছিল। ধারণা ছিল তাঁর ব্যাটিং সাধনা সার্বিকরূপে নিঃসন্দেহে ঐশ্বর্যবান হবেন গ্রীনপার্কের মনোরম উদ্যানে। মন্থর উইকেটে সফরের শেষ পর্যায়ের খেলায় ভারত প্রথম ব্যাট হাতে নিয়ে গড়লো এক মস্ত রানের ইমারত। ৬৪৪ রানের একটা প্রকাণ্ড ইমারত তুলে ভারতীয় অধিনায়ক গাভাসকার পরম নিশ্চিন্তে দান ছেড়ে দিলেন ক্যারিবিয়ানদের হাতে। এই ইনিংসে ভারতীয় দলে এলো তিনটি সেনচুরি। ভিশ তাঁর রাজসিক শিল্পগরিমার স্ফটিক সৌদ্ধ রচনা করলেন ৩১০ মিনিটের শ্রম বিনিময়ে। কানপুর ক্রিকেট উদ্যানে এটি নিয়ে ভিশ চারটি টেস্টে পেলেন তিনটি শতরান। ১৯৭২-৭৩ সালের ইনিংসটিতে তিনি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সেনচুরি বঞ্চিত হন ৮৪ রানে আউট হওয়ার জন্য। গাভাসকার ৪০ রানের মারমুখী ইনিংস শেষ করার খানিক সময়ের মধ্যেই আউট হলেন চৌহান ও বেঙ্কসরকার। ২২১ রানে তৃতীয় উইকেট পড়ার পর গায়কোয়াড় ও ভিশের জুটি কানপুরকে সৌন্দর্যের বর্ণালী প্রভায় সজ্জিত করে তুললো। ৩৩৯ মিনিট উইকেটে থেকে গায়কোয়াড় করলেন ১০২ রান। এই ইনিংসে আর একটি সেনচুরি পেলেন মহীন্দর। তাঁর সংগৃহীত রান ছিল ১০১। তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্ন ভোজনের কিছু পরে সানি তাঁর দলের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন ৬৪৪ রানে। ভিশের এই রান প্রাচুর্যভরা ইনিংসটি সত্যিই ছিল উন্নত শিল্পসুষমা সমৃদ্ধ। তাঁর ব্যাট নির্গত প্রতিটি স্ট্রোকের মধ্যে যেমন পাওয়া গেছে জাত শিল্পীর একাগ্র শিল্পমানস অন্যদিকে ফুটে উঠেছিল তাঁর সূক্ষ্ম তুলির দুর্লভ রমণীয় আঁচড়। লাল বলকে এইদিন তিনি যেন মন্ত্রসিদ্ধ ভঙ্গিমায় স্বইচ্ছায় চালিত করছেন সাধনার ইন্দ্রজালে। তাঁর ব্যাটের রাগিণীতে বেজেছে উচ্চাঙ্গ

রাগের সুর ঝংকার। কেতাবী ঢঙের সঙ্গে নির্দ্বিধায় ক্রিকেটের কবি সংমিশ্রিত করেছেন তাঁর কাব্যের মৌলিকত্ব। সুসংযত, ব্যাটের টানে ফুটে উঠেছিল এককেটি অভিনব হৃদয় নির্গত অভিনব শিল্প-গরিমা। সুর-ছন্দ-তালের সংমিশ্রিত ঐকতানের লহরী গোটা কানপুরকে যেন আপ্লুত করেছিল। মনে হচ্ছিল না ব্যাট হাতে কোন ক্রিকেটার খেলছেন। দেখে মনে হয় বহুকালের চেনা কোন সুর সাগর নব উন্মাদনায় কানপুর উইকেটে ভূমিষ্ঠ হয়ে হাতের ব্যাটে বাজিয়ে চলেছেন চেনা সুরে বীণাযন্ত্র। বুকের রক্তে মাতন লেগেছিল যেন, ব্যাট বলের স্পর্শে সৃষ্টি হচ্ছিল মাতিশেব দক্ষ তুলির এককেটি অনুপম বর্ণালী আঁচড়। ১৭৯ রান করলেন ভিশ—ছবির মতো ছিল এই রান। চোখের তৃপ্তি, মনের সুখের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হেঁটেছিল সময়ের কাঁটা। তাঁর ক্রিকেটের মধ্যে ছিল না কোন ক্লান্তির স্পর্শ, ছিল না একঘেয়ে বিরক্তির অস্বস্তিময় প্রভাব। দর্শকেরা যেন প্যারিসের আর্ট গ্যালারীতে বসে সময় কাটাচ্ছিলেন এতক্ষণ।

ক্রিকেট আবার ক্রিকেট হয়ে ফিরে এলো ১৭৯ রানের এই গরিমা-দীপ্ত ইনিংসটি শেষ হওয়ার পর।

ভারতীয় ব্যাটধারীরা যে চড়া সুরে ক্রিকেটের তার বেঁধে ছিলেন, সেই চড়া সুরে তাল মিলিয়ে সুর তুলতে পারলেন না কালীচরণ। ক্যালিপসোর ছেঁড়া তারে বারবার বাজলো ছন্দ পতনের সুর। তবু ওই ছেড়া তারে বৃষ্টি ভেজা পিচে আপন দক্ষতায় ব্যাট হাতে লড়লেন একমত্র ব্যাকাস। লড়াই-এর মন নিয়ে এই বীর্যবান তরুণ যুবাটি করলেন অসাধ্য সাধন। বিপর্যয়ের মধ্যে বৃষ্টি ভেজা পিচে পতন রুখে দিলেন তিনি—একমাত্র তাঁর একক প্রচেষ্টায়। একদিকে বৃষ্টি আর দিকে ব্যাকাশ—সব মিলিয়ে ষষ্ঠ টেস্ট ম্যাচ শেষ হলো ফলহীন ভাবে। ব্যাকাস তাঁর টেস্ট জীবনে প্রথম সেনচুরি পেলেন একটি ডাবল সেনচুরি করে। মান বাঁচলো কালীচরণের। শেষদিনে বৃষ্টি ক্রিকেটকে বানচাল করে দিল।

শেষ অবধি সফর শেষ হলো ১-০ ম্যাচে। ভারত জিতলো। জিতলো সানি।

বিশ্বকাপ ও ইংল্যাণ্ড সফর

১৯৭৮।

প্রুডেনসিয়াল বিশ্বকাপের খেলা। ভারত চললো ইংলণ্ড সফরে। বিশ্বকাপের পর ইংল্যাণ্ড দলের সঙ্গে টেস্ট পর্যায়ের খেলা বসবে। এই সফর শুরুর মুখেই ভারতীয় ক্রিকেটে আবার ঘটলো আর এক পালা বদলের পালা। বিগত টেস্ট সিরিজের অধিনায়ক সানির হাত থেকে অধিনায়কের খেতাব ছিনিয়ে নিয়ে অক্রিকেটীয় কর্মকর্তার দল ভেঙ্কট-রাঘবনের মাথায়উক্ত সম্মান খেতাব চাপিয়ে দিয়ে এক নিমেষে কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন গোটা ভারতবাসীর। আনুগত্যের পুরস্কার দিতে বহুবার বহু জনকে বহু রকম কায়দায় আমরা দেখেছি, তবে এবারের নজির ছিল অভিনব। বেদীর হাত থেকে অধিনায়কের সম্মান কেড়ে নেওয়ার সময় কর্মকর্তারা বেদীর বিরুদ্ধে অবিবেচনার বহু অভিযোগ এনে-ছিলেন। সেই সঙ্গে বেদীর বিরুদ্ধে মস্ত অভিযোগ ছিল যে তাঁর নিজস্ব খেলার মান পড়ে গিয়েছে অনেকখানি। কিন্তু সানি? তাঁর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ?

অভিযোগ সানির বিরুদ্ধে ছিল 'প্যাকার সার্কাসে, যোগ দেওয়ার হুমকি। এরই জন্য কর্মকর্তার দল সফরের আগে একটি চুক্তিপত্রে খেলোয়াড়দের দিয়ে দাসত্বের মুচলেখা লিখিয়ে নিতে চেয়েছিলেন তাঁদের বশে আনতে। সানি নিজে খেলোয়াড় সংস্থার একজন উচ্চ-পদস্থ কর্মী হওয়ায় এই মুচলেখার বিরুদ্ধে তিনি পাল্টা অভিযোগ তুলে খেলোয়াড়দের স্বাক্ষর দিতে নিষেধ করেছিলেন। প্রথমটায় বোঝা যায়নি কি ঘটবে। তবে আমাদের মতো বুদ্ধিহীন কিছু সাংবাদিকের

দল, তাই আগেভাগে প্রচার চালিয়ে অভিমত প্রকাশ করে বলেছিলেন সানিপ্যাকারের দলে যে যোগ দিচ্ছেন এটা একরকম প্রায় স্থির। তিনি হয়ত ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় দলে থাকছেন না। এমনকি শোনা গেল, সানি নাকি বলেছেন, তিনি দলের নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী নন। এই ঘটনার দিন কয়েকের মধ্যেই বাবু ভেঙ্কটরাঘবন অপ্রত্যাশিতভাবে সর্বাগ্রে মুচলেখায় স্বাক্ষর দিয়ে কর্মকর্তাদের সাগ্রহে প্রমাণ দিলেন তিনি কর্মকর্তাদের একান্ত অনুগত।

নিন্দুকদের ধারণায়—ভেঙ্কটের নেতা নির্বাচন নাকি অনেকটা সেই জন্যই—অর্থাৎ তাঁর আনুগত্যের পুরস্কার। খেলোয়াড়োচিত মান নির্ণয়ে যোগ্যতাধর্মী সম্মান নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে প্যাকার হুমকিতে কর্মকর্তা ভয় পেয়ে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে সানিকে নেতৃত্ব দিতে পারলেন না, সেই 'প্যাকার সার্কাস' বন্ধ হয়ে গেল ক্রিকেট আঙিনা থেকে। যে ন-নম্বর চ্যানেলের জন্য এত অর্থ ব্যয় সেই টি. ভি. চ্যানেলটি শেষ অবধি লড়িয়ে ভাবাপন্ন অস্ট্রেলীয় কর্মকর্তার দল বৃটিশ কর্তাদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনা করে নিজেদের মান বাঁচাতে তুলে দিলেন প্যাকারের হাতে। 'প্যাকার সার্কাস' বন্ধ হয়ে গেল ক্রিকেট থেকে, অথচ সেই লঘু পাপের গুরু দণ্ড ভোগ করতে হলো সানিকে। কথায় আছে না—কারো ভাদ্র মাস, কারো সর্বনাশ। তাই বলি, সানির যেমন কপাল পুড়লো, তেমনি এক ধাক্কায় কপাল খুলে গেল ভেঙ্কটের। ভদ্রলোক বহুকাল ধরেই এমন একটি দায়িত্বসূচক সম্মান পাওয়ার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছিলেন। এতদিনে তিনি মন জয় করলেন কর্মকর্তাদের। দক্ষিণ ভারতীয় কর্মকর্তাদের সাধুবাদ জানাই যে তাঁরা শ্রীযুক্তবাবু ভেঙ্কটরাঘবনের মানসিক ইচ্ছাকে সফল করতে কার্যকরী হয়েছেন। এর জন্য পরোক্ষভাবে ভেঙ্কটের আর একজনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তিনি হলেন অস্ট্রেলীয় ধনকুবের ক্যারী প্যাকার—যাঁর কল্যাণে ভেঙ্কট এত তাড়াতাড়ি আনুগত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি পেলেন।

থাক অধিনায়ক নির্বাচনের কথা, ফিরে আসি দল নির্বাচন প্রসঙ্গে। প্রুডেনসিয়াল বিশ্বকাপ ক্রিকেট ও ইংল্যাণ্ড সফরের জন্য ভারতীয় কর্তাব্যক্তির দল যে খেলোয়াড় নির্বাচিত করলেন, তা যে কতটা অনভিজ্ঞ চিন্তার ফসল, তা টের পাওয়া গেল বিশ্বকাপ খেলা শেষ হওয়ার পর।

বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার গ্রুপ লীগের প্রতিটা খেলায় ভারত হারলো। হারলো প্রথমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের কাছে এবং পরে শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে। প্রথমটিতে হারার ব্যাপারে ভারতবাসীর মনে কোন ক্ষোভ নেই। কারণ এই ম্যাচে যে ভারত হারবে এটা প্রায় একরকম স্থির বিশ্বাস ছিল সকলের। গত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় ভারত হেরেছিলো। হেরেছিলো ইংলণ্ডের কাছে ২০২ রানে এবং নিউজিল্যাণ্ডের কাছে ৪ উইকেটে। কিন্তু তুলনামুলক বিচারে এবারের চিত্রটি ছিল বড়ই করুণ। তিনটি খেলাতেই হার হয়েছে ভারতের। বিশেষ করে দ্বিতীয় খেলায় ৮ উইকেটে নিউজিল্যাণ্ড দলের কাছে হেরে গিয়ে ভারতীয়ত্ব যতটা না ম্লান হয়েছিল, তার চেয়েও দুঃখজনকগ্লানিময় হয়ে ভারতবাসীর মর্মে বিঁধেছে শ্রীলঙ্কার কাছে ৪৭ রানে হারার অমর্যাদাটি। সত্যি বলতে কি—শ্রীলঙ্কা এখনও বিশ্ব ক্রিকেটে কল্কে পায়নি—তার কাছে হেরে যাওয়ায় ভারতের কৌলিন্য কি আর ক্রিকেট প্রাঙ্গণে অবশিষ্ট আছে? মনে হয় নেই, তবে জানি না আমার উক্তিতে কর্মকর্তার দল ক্ষুব্ধ হবেন কি না। তবে ক্রিকেট আমাদের মতো মুখ্য লোকেরা যা বুঝি তা দিয়ে একটা কথা বলতে পারি, দল হিসাবে ভারতের যা প্রচার এবং ভারতীয় কর্তাদের যা ধারণা তা থেকে এই দলের এমন শোচনীয় অবস্থায় লাজলজ্জা খুইবার কোন কারণ ছিল না। দলপতি শ্রীনিবাস ভেঙ্কটরাঘবন বলেছিলেন তিনি নাকি তাঁর দলীয় শক্তি সম্পর্কে খুবই আস্থাবান। তাঁর আশা দল এই চলতি বিশ্বকাপ আসরে ভাল ফল দেখাবে। তাঁর ভাষায় লিখতে না পারলেও বলতে পারি তিনি বলেছিলেন দল সেমিফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারবে।

কিন্তু এ কি খেলার নমুনা আমরা পেলাম ! পেশসর্বস্ব ক্যারিবিয়ানদের লাল বলের দুরন্ত গতিময় আক্রমণের সামনে না হয় ভারতীয় ব্যাটধারীরা ৫৩·১ ওভার ব্যাটিং করে ১৯০ রান করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় বোলারেরা কি করেছেন ? স্বয়ং ভেঙ্কট তাঁর বোলিংয়ের গড় কি ছিল সে কথার বিচার না করে শুধু বলি, পাঁচ পাঁচজন বোলার দিয়ে বাবু ভেঙ্কট সাহেব আক্রমণের মুনসীয়ানা দেখিয়েও একজনের বেশী ক্যারিবিয়ান ব্যাটধারীদের পকেটস্থ করতে পারলেন না—এটা কেমন কথা হলো। গত বিশ্বকাপ জয়ী ক্যারিবিয়ানরা যে শক্তিশালী এ কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু নিউজিল্যাণ্ড—তারাই বা ভারতীয় আক্রমনের বিরুদ্ধে মাত্র দুটি উইকেটের বিনিময়ে ১৮৩ রান সংগ্রহ করে ম্যাচ জিতে গেল কি করে ? ক্যারিবিয়ান ম্যাচ শেষে একটি কথা বোঝা গিয়েছিল ভারতীয় ব্যাটিং শক্তির মাত্র দুইটি স্তম্ভ—একটি ভিশ অন্যটি সানি। ভিশ ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে তাঁর স্বভাবজাত শিল্পীর খেলা খেলেছেন। তাঁর ব্যাটিংয়ের সুগভীর রাগিণী ক্রিকেটের কুঞ্জবনে শ্যামের মুরলী হয়ে বেজেছে বারংবার। আহা—কি সে সুর, কি সে ইন্দ্রিয়ানুভূতি। তাঁর ৭৮ রানের ইনিংসটি ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ব্যাটধারীরা হোলডিং, রবার্টস, গার্ণার ও ক্রফটের বলে শামুকের মত গুটিয়ে গিয়েছিলেন। যাঁরা সত্যিকার ক্রিকেট বোদ্ধা সেদিনের খেলা দেখে তাই আগেভাগে বলেছিলেন—"একজন বিশ্বনাথ ভারতীয় দলের পক্ষে সবটুকু নয়—প্রয়োজনে দলকে বাঁচাতে হলে আর একটা বিশ্বনাথের দরকার।"

কিন্তু হায় রে—একজনের মতো কি আর একজন পাওয়া যায় ! তাই ভিশ নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলতে না পারায় মাঝারি পেশম্যানদের হাতেই ভারত তার মর্যাদা বন্ধক দিতে বাধ্য হয়েছিল। আর শ্রীলঙ্কা—কল্কে না পাওয়া এই দলটি ওভার পিছু ৪ রান ভারতীয় বোলারদের কোনরকম সমীহ না করে সংগ্রহ করেছে মাত্র ৫ উইকেটের বিনিময়ে। সর্বসাকুল্যে তারা রান তুলেছে ২৩৮টি।

অথচ ভারতীয় খেলোয়াড়েরা হাজার চেষ্টা করেও পারেননি এই রান সংগ্রহ করতে। বরং ৫৪·১ ওভার ব্যাটিং করে ভারতের মতো একটা বিজ্ঞাপিত তরতাজা দল শেষ হয়ে গেল মাত্র ১৯১ রানে। ভিশ ২২ রানে এই ম্যাচে আউট হয়েই যেন ভারতীয় ব্যাটিংয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করে গেলেন। তাও রক্ষে এই ম্যাচে শ্রীলংকার প্রকৃত ক্রিকেটার অধিনায়ক অসুস্থতার দরুন খেলতে পারেননি। টেনিকুন এই ম্যাচে খেললে বিশ্ববরেণ্য স্পিনারদের যে কি হাল হতো তা ভেবেই ভারতবাসীমাত্র নিশ্চয়ই এখন শিউরে উঠছেন। তিনটি ম্যাচে ভারত ৩০টি উইকেটের বিনিময়ে সংগ্রহ করেছে ৫৬৩ রান, তার বিনিময়ে ভারতের বিরুদ্ধে উঠেছে মাত্র ৮টি উইকেটের বদলে ৬১৫ রান। এখন প্রশ্ন—এই ব্যর্থতা কিসের জন্য ?

ভারতীয় ক্রিকেট বহুবার বহু ম্যাচে নির্লজ্জভাবে হেরেছে—এই প্রসঙ্গে বলতে হয় ১৯৫২, ৬৭ ও ৭৪ সালের ইংল্যাণ্ড সফরের কথা। একদিনে দুটি ইনিংসের পতন ঘটেছে, আবার এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের মধ্যে চোস্ত দল তল্পি গুটিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে এসেছে—এ নজিরও আছে। তবু এই ভারতীয় দল ৭৮-এর বিশ্বকাপে যে নজির সৃষ্টি করেছে তার কোন তুলনা হয় না।

বিশ্বকাপ খেলা শেষ হওয়ার পর, তাই ইংল্যাণ্ড সফরে যে বিনা দর্শকে ভারতীয়দের খেলতে হবে এটা একরকম প্রায় স্থির ছিল। তবু সবাই ভেবেছিল ভারত হয়ত টেস্ট পর্যায়ের ক্রিকেটে নবশক্তিরপরিচয় দেবে। বিশ্বকাপের নিয়ম মাপা ওভার খেলার সঙ্গে তো টেস্ট ম্যাচের তফাত আছে। কিন্তু তা কি ঘটেছে ? এবার আমরা সেই চিত্রের মধ্যেই প্রবেশ করছি।

প্রুডেনসিয়াল কাপে ভারতীয় ক্রিকেটারদের শোচনীয় ব্যর্থতা শুধু যে ভারতবাসী মাত্রেই বিব্রত বোধ করেছিলেন তাই নয়, সব শেতাঙ্গ কলমচোয়ের দল ভারতীয় ক্রিকেটের দৈন্যতার ছিরি ছাঁদ লক্ষ্য করেই প্রকাশ্যে নির্ভয়ে বলে ফেললেন, চলতি মরশুমে ইংল্যাণ্ড সফর করতে ভেঙ্কটরাঘবনের নেতৃত্বে যে দলটি ক্রিকেটের নামে হাওয়া বদল করতে এসেছেন, তাঁরা ক্রিকেটের পরিভাষায় একেবারে নাবালক। ভারতের সঙ্গে চলতি মরশুমে ব্রিয়ারলি আর এক প্রস্থ ক্রিকেট প্র্যাকটিসের সময় পেলেন।

ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং আধুনিক কালের ক্রিকেট তাত্ত্বিক হিসাবে চিহ্নিত ডেনিস কম্পটন চুরুটের ধোঁয়া উড়িয়ে ঠাট্টার সুরে বলেই ফেললেন, 'ভারতীয় এই দলের মধ্যে এমন কিছু নেই, যার জন্য কলমের কালি খরচ করা চলতে পারে।'

কম্পটনের এই কঠিন বক্তব্য ঠাট্টার স্বাদ মিশ্রিত হলেও প্রকাশ্য উপহাস ছিল না। হাজার হোক কম্পটন একজন ক্রিকেটার, তাই মনে হয় তিনি সচেতনভাবে চাননি ভারতীয় ক্রিকেট তত্ত্বের মুখোশ খুলে একেবারে নগ্ন করতে। কিন্তু যাঁরা শুধুমাত্র সমালোচক তারা শিষ্টাচারের ধার ধারবেন কেন। তাই তাঁদের কেউ কেউ যা মন্তব্য ছোঁড়াছুঁড়ি করতে লাগলেন, যার ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায় যে এই ক্রিকেট খেলা দেখার চাইতে অপেরায় গিয়ে সময় কাটানো অনেক ভাল।

সমালোচকেরা যে যা খুশি বলুন, আমরা ভারতবাসী রাগে ফুঁসেছি মাত্র। আর সেই ফাঁকে প্রথম টেস্ট ম্যাচ শুরু হওয়ার আগের কয়েকটি খেলায় ভারতীয় ব্যাটধারীরা দস্তুর মতো ভালো খেলে কেউ কেউ প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টায় গুটিকয়েক শতরান করে বৃটিশ কলম-

বাজদের বোঝাতে চাইলেন মাপা ওভারের প্রুডেনসিয়াল কাপ আর টেস্ট ম্যাচ খেলা এক বস্তু নয়। অর্থাৎ ভারতীয় খেলোয়াড়েরা মনোবলে মোটেই খাটো নয়, তারা অবশ্যই এক হাত বৃটিশের সঙ্গে ক্রিকেট প্রাঙ্গনে লড়াইতে প্রস্তুত।

এজবাসটনে শুরু হলো প্রথম টেস্ট ম্যাচ।

খেলার আগের দিন পর্যন্ত ঠিক ছিল বেদী খেলছেন। চন্দ্রশেখর আহত। কিন্তু খেলার দিন বেদীর আঙুলে ও ঘাড়ে চোট থাকায় গোড়ালির ব্যাথা নিয়ে চন্দ্রকেই নামতে হলো মাঠে। অবশ্য এখন ক্রিকেটের কাছে চন্দ্র ও বেদীর শক্তি এমন একটা চরম জায়গায় এসে পৌঁছেছে, যে এই দুই ক্রিকেটার দলে থাকলে কোন দল যে বিশেষ কোন উপরি শক্তি পাবে—এমন বিশ্বাস নেই। যদি হঠাৎ করে কিছু ঘটে যায় তো বুঝে নিতে হবে, তা হলো ক্রিকেটের সৌভাগ্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। ক্রিকেট লড়াইতে ইংল্যাণ্ডের নিজস্ব ভূমি এমনিতেই স্বার্থপর। জলহাওয়ার উপরি সুযোগ বরাবরই ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়েরা একটু বেশী মাত্রায় ভোগ করেছেন। স্যাঁতসেঁতে আর্দ্র, জোলো মেঘলা আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের মতো গ্রীষ্মদেশীয় ক্রিকেটারদের ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যাওয়াটা খুবই কঠিন। এই ব্যাপারে স্যার ডন ব্র্যাডম্যান নিজেও ভুক্তভুগী। তাঁর মতো একজন রান সংগ্রহী যন্ত্র ব্যাটধারীকেও ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে মাথা নত করতে হয়েছিল। রান অ্যাভারেজ তাঁরও নেমে এসেছিল বেশ কিছুটা নীচের দিকে। কাজেই এই নয়া দলটি বিশেষ যে কোন সুবিধা করতে পারবে এই বিশ্বাস অতিবড় ভারতবাসীর ছিল না। সবাই জানতেন দলের মূল স্তম্ভ দুই ব্যাটধারী—সানি ও ভিশ। গোটা ইনিংসে এই দুজন যতক্ষণ, ততক্ষণই ভারতীয় ব্যাটিং-এর আস্ফালন। কথাটা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল এজবাসটনে! টসে জিতে ঝলমলে পরিষ্কার রোদ মাখা সকালে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিলেন ইংল্যাণ্ড দলপতি ব্রিয়ারলি। বয়কটকে নিয়ে স্বয়ং ব্রিয়ারলি দলের গোড়াপত্তন

করলেন ঠাণ্ডা মেজাজে। ধীরে সুস্থে খেলে প্রথম ঘণ্টায় ১৪ ওভারে তাঁরা তুললেন মাত্র তিরিশটি রান। ব্রিয়ারলি ও বয়কটের ওপর প্রাথমিক পর্যায়ে কপিলদেব ও ঘাউড়ির শাসন ছিল যথেষ্ট। অভিজ্ঞ বয়কটের মতো মন্থর ব্যাটধারীকে লাল বলের শাসনে আরো মন্থরতায় নিমগ্ন রেখে ভারতীয় দুই প্রারম্ভিক বোলারেরা নিজেদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হলেন। মাত্র দশটি রান সংগ্রহ করতে বয়কটকে ৯৪ মিনিট ধৈর্যের সঙ্গে ব্যাট করতে হয়েছিল—যদিও বলাবাহুল্য এই ম্যাচে বয়কট তাঁর টেস্টজীবনে সতেরোতম সেনচুরি করে ইংল্যাণ্ডকে বড় রানের ইমারত গড়ে জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন বটে, তবু বলি প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর ব্যাটিং বিন্যাসের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রবণতাই ছিল বেশী। প্রথম উইকেট ইংল্যাণ্ডের পতন ঘটে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর। মহিন্দর অমরনাথের বদলি হিসাবে ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম পাওয়া কপিলদেব ফিরে এসেই তাঁর চতুর্থ বলে ফিরিয়ে দিলেন ব্রিয়ারলিকে। উইকেটের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া বলে খেলতে গিয়ে ব্রিয়ারলি নিজের বিপদ ডেকে আনেন। উইকেটের পিছনে দাঁড়ানো ভরত রেড্ডী ব্রেয়ারলির বাটচুম্বিত লাল বলটি নিজের দস্তানার মধ্যে নিয়ে তাঁর ক্রিকেট জীবনকে সার্থক করলেন। এই সময় ইংল্যাণ্ডের রান তোলার গতি ছিল খুবই মন্থর। এরপর ডেরিক র‍্যাণ্ডেল এসে কিছুটা মারমুখী হতে গিয়ে আবার ওই কপিলের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া বলে ব্যাটের প্রলোভিত চুম্বনের মায়ায় জড়িয়ে ভরত রেড্ডীকে তাঁর পাওনা মিটিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন প্যাভেলিয়ানে। খেলার চেহারা বদল করলেন গ্রাহাম গুচ। মন্থর ক্রিকেটের বিরক্তিকর ম্লান গতিকে ভেঙেচুরে দিয়ে গুচ ভারতীয় বোলারদের প্রভাব নষ্ট করার জন্য বিদ্রোহী মনোভাবে শুরু করলেন ব্যাটিং করতে। উইকেটের চারদিকে মেজাজী গুচ লাল বলকে নিজের ইচ্ছানুসারে চালিত করতে লাগলেন। ঝড়ো বাতাসের মতো গুচের ক্রিকেট মুহূর্তের মধ্যে লণ্ডভণ্ড করছিল ভারতীয় বোলারদের স্থিতিশীল মনোভাবকে। তাঁর বেপরোয়া মারমুখী ব্যাটিংকে

সংযত রাখতে সক্ষম হলেন না ভেঙ্কটরাঘবন। একমাত্র গুচ-কল্যাণেই ইংল্যাণ্ড পেল বড় রান গড়ার প্রেরণা। চা পানের বিরতির সময় ইংল্যাণ্ডের রান এসে পৌঁছলো ২ উইকেটে ৯০ থেকে ২৩৫ রানে। বয়কট ৬৭, গুচ ৬৯। চা পানের বিরতির পর গুচ একাই নিলেন ইংল্যাণ্ড দলের রান তোলার সমস্ত দায়দায়িত্ব। বয়কট অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খেলছিলেন। তাঁর ওপর যেন নির্দেশ ছিল হলুদ উইকেটকে কেবল-মাত্র পাহারা দেওয়া। শেষ অবধি অতিরিক্ত মাত্রায় মারমুখী হতে গিয়েই গুচ নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনলেন। কপিলের বলে মারতে গিয়ে ব্রিয়ারলি ও র‍্যানডেলর পথ অনুসরণ করে ভরত রেড্ডীকে তাঁর তৃতীয় পুরস্কার বুলিয়ে দিয়ে নিজস্ব ৮৩ রানে সরে গেলেন উইকেট থেকে। চতুর্থ উইকেটে বয়কট-গাওয়ারের জুটি ইংল্যাণ্ডকে এনে দিল বড় রান গড়ার যোগাযোগ। বয়কট নিজস্ব ১৫৫ রানে কপিলের বলে লেগবিফোর হয়ে যখন ফিরে এলেন তখন স্কোরবোর্ডে জ্বলজ্বল করছিল ৪২৬টি রান জ্যোতিষ্ক। এই ম্যাচে গাওয়ারের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। উইকেটের চারপাশে তাঁর প্রতিটি স্ট্রোক ছিল যেমন কেতাবী তেমনি জোরালো। তাঁর ব্যাটের সামনে ভারতীয় কোন বল-বাজ সামান্য প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেলেন না। গাওয়ার মহিমায় সেদিন এজবাসটন মুখরিত হয়ে উঠেছিল বলা যায়। শেষ অবধি গাওয়ার পূরণ করলেন তাঁর দ্বিশত রান। দ্বিতীয় দিনে মাইক ব্রিয়ারলি যখন ভেঙ্কটরাঘবনকে দান ছেড়ে দিলেন, তখন ইংল্যাণ্ডের সৌভাগ্য মস্ত রানের শক্ত জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ৬৩৩ রানের ইনিংস গড়ে ইংল্যাণ্ড ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট পর্যায়ে তাঁদের বড় রানের নজির স্থাপন করলেন। বলাবাহুল্য গাওয়ারের এই দ্বিশত রান সেদিন পূরণ করতে সময় নিয়েছিল ৩৫৭ মিনিট।

ইংল্যাণ্ডের তৈরী বড় রানের ইনিংসটি চোখের সামনে দেখেই মনে হয় ভারতীয় ব্যাটধারীরা উইকেটে আসার আগেই মৃত হিসাবে গন্য হয়েছিলেন। বুকের ওপর কালো পাহাড়ের ছায়া ফেলে ইংল্যাণ্ড

বোলারদের আক্রমণ ভারতীয়দের শুরুতেই ধরলো টুটি চিপে। প্রথম উইকেটে চৌহান বিদায় নিলেন মাত্র ১৫ রানে, দ্বিতীয় উইকেটে বেঙ্কসরকার ৫৯ রানে। তৃতীয় উইকেটে সানি-ভিশের জুটি। খেলার মধ্যে এই সময় ভারতীয় ব্যাটিং-এর কিছুটা আস্থা ফিরে এসেছিল। উইকেটে চারদিকে নিখুঁত কেতাবী রকমারি মার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ছিল। বোথম, উইলিস, হেনড্রিক, এডমনডস, এঁদের কারো বিরুদ্ধেই কেতাবী উদাহরণ দেখাতে কসুর করলেন না ভারতীয় দুই ক্রিকেট অবতার। সানির অন ড্রাইভ, ভিশের স্কোয়ার কাট গোটা এজবাসটনকে সেদিন যেন সৌন্দর্যের মায়াজালে ভুলিয়ে রেখেছিল। একজনের ব্যাটিং-এর মধ্যে ছিল শিল্পের স্নিগ্ধতা, অন্যজনের হাতে ছিল শক্তির কালচক্র। চমৎকার খেলছিলেন দুই ব্যাটধারী। সবাই ভেবেছিলেন সানি হয়ত এই ইনিংসে তাঁর সেনচুরির অপ্রতিরোধ্য যাত্রাপথে দুর্বার গতিবেগে সদর্পে এসে পৌঁছবেন। কিন্তু হায়রে নিয়তি—নো বলে রান নিতে গিয়ে সানি নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনলেন। কভারে দাঁড়ানো ডেরিক র‍্যানডেলের ফ্লিডিং চাতুর্যের পরিচয় জানা সত্ত্বেও, সানি নিয়তিতাড়িত হয়ে উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই র‍্যানডেলের একটি নিখুঁত থ্রো হলুদ উইকেট ভেঙে দিয়ে ভারতীয়দের সমস্ত আশাকে এক নিমেষে গুঁড়িয়ে দিল। সানি ফিরলেও, এই ম্যাচে চমৎকার ব্যাটিং করলেন বিশ্বনাথ। তাঁর মনোরম লাবণ্য বিকশিত স্নিগ্ধ ইনিংসটি নিখুঁত না হলেও, দর্শনীয় ছিল শিল্পের রস বিন্যাসে। ভিশের হাতের ব্যাটে বেজেছিল কুঞ্জবনের বেণুবীণা। সার্থক জন্মশিল্পীর নিজের গরিমাকে প্রতিষ্ঠা করতে কুণ্ঠিত হলেন না। উইকেটের চারপাশে একের পর এক স্ট্রোকের মাধুর্য দিয়ে তিলতিল করে ভিশ সেদিন রচনা করলেন তাঁর তিলোত্তমা ইনিংসটিকে। নিজস্ব ৭৮ রানের পর ছন্দপতন ঘটলো। আত্মস্থ শিল্পী সহসা তালভঙ্গ করে চলে গেলেন উইকেট ছেড়ে—এখানেই বুঝি একজন সহজাত শিল্পীর সঙ্গে সাধারণ মনের তফাৎ। বিশ্বনাথ ফিরে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় দল গুটিয়ে

গেল ২৯৭ রানে। এই ইনিংসে উইলিস পেলেন ৭৯ রানে তিনটি উইকেট।

ফলো অনের মুখে পড়তে হল ভারতকে। এই ইনিংসে ভারতীয় দুই প্রারম্ভিক ব্যাটধারী চমৎকার খেলা শুরু করলেন। প্রথম ইনিংসের জড়তা মাখানো অভিজ্ঞতা কাটিয়ে উঠে চেতন চৌহান সানির সঙ্গে বেশ ভালই খেলা শুরু করলেন। উইলিস, হেনড্রিক, বোথাম, এডমনডস, মিলার কেউই ঠিক মতো বাগে আনতে পাচ্ছিলেন না এই দুই ব্যাটধারীকে। রানের গতি, খেলার ধরন তখন যে পর্যায়ে ছিল তাতে কেউই আশা করেননি, এই ম্যাচে ভারতকে শেষ পর্যন্ত হারতে হবে শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ৮৩ রানে। লাঞ্চের সময় রান ছিল বিনা উইকেটে ১২৪ রান। অথচ আশ্চর্য ক্রিকেট চরিত্র। লাঞ্চের সময় যেখানে ক্রিকেটের চেহারা ছিল সম্পূর্ণ আস্থাভাজন, সেই ক্রিকেট মাত্র কয়েক ঘণ্টায় বদলে গিয়ে গোটা ইনিংসকে শেষ করে বসলো চতুর্থ দিনের নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা আগে। হেনড্রিকের বলে ৬৮ রানে প্রথমে গাভাসকার ফিরলেন। ২০৪ রানের মাথায় পড়লো দ্বিতীয় উইকেট। চৌহান আউট হলেন ৫৬ রানে উইলিসের বলে, বেঙ্কসরকার ৭ রানে হেনড্রিকের বলে। এই সময় একচ্ছত্র অধিপতির মতো দুর্দন্ত প্রতাপ নিয়ে উইকেট আগলে রেখেছিলেন বিশ্বনাথ। তাঁর হাতের রাজসিক ব্যাটের মন্দাক্রান্তা ধারায় প্রহারিত হয়েছিলেন বৃটিশ বলবাজের দল। দু ঘণ্টার রাজসিক গরিমাদীপ্ত ইনিংসটির মধ্যে ছ ছটি উত্তপ্ত বাউণ্ডারী মেরে ভিশ বৃটিশ কলমচোষ্যদর বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নিজস্ব সৃজনী প্রতিভা। তবু বলি, অর্ধশত রান পূরণ হওয়ার পরই যেন ভিশের মনসংযোগে সামান্য চিড় ধরেছিল। এর ফলে অল্পের জন্য প্রথমে তিনি স্টাম্প আউট হওয়ার হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যান। পরে বোথাম নতুন বলে আক্রমণ শুরু করা মাত্র ভিশের জন্ম-শিল্পীর মেজাজী খেলার ছন্দপতন ঘটে। ৫১ রানে বিশ্বনাথের বিদায় যখন হয় তখন স্কোরবোর্ডে রান ছিল ২২০—এর পরই শুরু হয়ে যায়

ভারতীয় তাঁবুতে শোকযাত্রার পর্ব। গায়কোয়াড় ভালই খেলছিলেন, তাঁর আউট ছিল একটি সুন্দর ক্যাচের বিনিময়ে, এই ধরনের ক্যাচিং আধুনিক ক্রিকেটের কাম্য হলেও, বড় একটা চোখে দেখা যায় না। তাই গায়কোয়াডের উইকেটটি দখলের জন্য বোথামের বোলিং কৌশলের গুণ যত না বেশী, তার চাইতে গুচ-এর ফিল্ডিং-এর চাতুর্য অনেক বেশী প্রশংসনীয়। নতুন বলে বোথাম যেন ভেল্কি দেখালেন। মাত্র ২৪৩ রানে ভারতীয় ক্রিকেটের দশ দশজন ব্যাটধারীকে আউট করে ব্রিয়ারলি বাহিনী বিনা পরিশ্রমে ম্যাচ জিতে গেলেন এক ইনিংস ৮৩ রানে, যা ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে যতখানি দুঃখের, ঠিক ততখানি লজ্জার। দুই ইনিংস মিলিয়ে এই টেস্টে ভারতের মোট রান উঠেছিল ৫৫০। এই রানের মধ্যে ২৫৮টি রান ছিল ভিশ ও সানির সৃষ্ট। ভিশ একাই করেছিলেন উভয় ইনিংসে অর্ধশত রানের বিনিময়ে মোট ১২৯ রান, যার গড় হিসাব ছিল ৬৪·১০।

প্রথম টেস্টে পরাজয়ের পর ভারতীয় ক্রিকেটের স্বকীয় বিশ্বাস নিয়ে বৃটিশ ক্রিকেটের কলমচোষ্যের দল উঠে পড়ে শুরু করে দিলেন বিদ্রূপ সূচক মস্করা করতে। প্রাক্তন ইংল্যাণ্ড বলবাজ ফ্রেডী ট্রুম্যান, যিনি একদা তাঁর লাল বলের অগ্নিগর্ভ দাপট দেখিয়ে ভারতীয় ব্যাটধারীদের মনের মধ্যে রক্তপিশাচ দানব হিসাবে দুর্বলতায় পুজ্য হয়েছিলেন, সেই তিনি ক্রিকেটের বল ছেড়ে কলমের তীক্ষ্ণতায় বিদ্রূপের খোঁচা দিয়ে যা বললেন, তার অর্থ দাঁড়ায়; হায়রে ভারত, ভারতবর্ষের ক্রিকেট, শতছিন্ন জামা পরে একদল দৈন্যদশা প্রাপ্ত মানুষ ক্রিকেটার হওয়ার প্রত্যাশায় ইংল্যাণ্ডের ঐতিহ্যময় ক্রিকেট ভূমিতে বিচরণ করতে এসেছেন—যা দেখলে অত বড় দেশটার জন্য দুঃখও লাগে, হাসিও পায়।

ভারতীয় ক্রিকেটবাজেরা যে প্রথম টেস্টের নৈরাশ্যতা কাটিয়ে বাকি ম্যাচ গুলিতে খুব একটা সাফল্য দেখতে পারবেন না এ বিশ্বাস মনে হয় ভারতীয় দলপতি ভেঙ্কটরাঘবনের না থাকলেও, বৃটিশ বোদ্ধাদের মতো কতিপয়ভারতবাসীরওছিল। তাই অনেকে ভেবেছিলেন, ভেঙ্কট বিনা রণে

ব্রিয়ারলিকে সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করে স্বদেশে ফিরে এসে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবেন। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের সংগ্রামী অধিনায়ক পুরু ভঙ্গিমায় এত সহজে হার মানতে রাজি ছিলেন না। তিনি লর্ডস মাঠে তাই সাহস করে—বৃষ্টিভেজা উইকেটে টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং গোটা দলটা যখন মাত্র ৯৬ রানে বোথামের বোলিং-এর ঘায়ে মুড়িয়ে গেল, তখন কি ভেঙ্কটের মনে সত্যি কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি? প্রতিক্রিয়া যে হয়নি, একথা বলাই ভুল—নিশ্চয়ই হয়েছিল, অন্তত ভেঙ্কট একটা কথা ভেবে তৃপ্তি পেয়েছিলেন যে ভারতীয় ব্যাটধারীরা বিগত দিনের নির্লজ্জ অভিজ্ঞতার বেড়াজাল টপকে ৭৬-৭৭ 'এর ৪২ রানে আউট হওয়ার কলঙ্ক মুছিয়ে এবার দান শেষ করেছেন ৯৬ রানে। সে কি কম কথা হলো। এবার লর্ডসে সানি একাই করেছেন ৪২ রান, সঙ্গে ভিশের ২১ রান—ব্যাস তারপরই যে-কে সেই অবস্থা। অর্থাৎ একই কথা পরিষ্কার যে ভারতীয় দল দু বছরে ব্যবধানে লর্ডস-এর উইকেটে আরো ৫৪ রান বেশী সংগ্রহ করার মতো ক্ষমতায় এসে পৌঁচেছে—একি কম গৌরবের কথা নয়?

হায়রে ভারতীয় ক্রিকেট! তোমাদের দৈন্যতা কি কোন কালে ঘুচবে না। উঁচুনাকওয়ালা সম্ভ্রান্ত বৃটিশের কাছে কি চিরকালই আমাদের কটূক্তি শুনতে হবে? মাত্র ৯৬ রানে গোটা ভারতবর্ষকে পকেটস্থ করে বৃটিশ দলপতি ব্রিয়ারলি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন, প্রথম টেস্টের মতো একটা মস্ত রানের ইনিংস গড়ে ভারতীয় ব্যাটধারীদের স্নায়ু দুর্বল করে দেবেন। বোলিং-এর ধার ভারতীয়দের বিগত শক্তির তুলনায় খুবই কমজোরি। চন্দ্রশেখর এই ম্যাচে দলে নেই যে ভারতীয় দল চমক সৃষ্টি করবে। বোলার বোলতে বেদী ও ভেঙ্কট—যাঁদের এখন বয়সের হাত ধরে ক্রিকেট প্রাঙ্গণ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে এসেছে। হায়রে ভারত—এতদিনেও তোমার বোদ্ধা ক্রিকেট কর্মকর্তাদের হুঁশ হলো না আমরা ক্রিকেটের কোন্‌পথে চলেছি। ভেঙ্কট বৃটিশ দলপতির হুংকারিত

হাবভাব দেখে বুঝে ছিলেন, স্পিনে হাত ঘুরিয়ে যাদু খেলা দেখাবার চেষ্টা করলে আখেরে বৃটিশ ব্যাটধারীরাই লাভবান হবেন। ইংল্যাণ্ডে ঘাস ছাঁটা জলো উইকেটে চিরকালই পেশম্যানেরা দৌরাত্ম্য করতে অভ্যস্ত। কাজেই এক্ষেত্রে ভেঙ্কটরাঘবন মূলত চেষ্টা করলেন কপিলদেব ও ঘাউড়ির মধ্যে মূল আক্রমণকে ধরে রাখতে। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে বেশ কয়েকবার খেলা বন্ধ হওয়ায় একদিকে যেমন ব্যাটসম্যানদের মনঃসংযোগ করতে অসুবিধে হচ্ছিল, তেমনি ঘাসের উইকেট থেকে জলো আবহাওয়ার কিছুটা প্রাণস্পন্দন পাচ্ছিলেন কপিল ও ঘাউড়ি। কপিলদেব চমৎকার বোলিং করলেন। পাঞ্জাবের এই তরুণ বোলারটি তাঁর স্বদেশে একজন খাঁটি পেশম্যান হিসাবে প্রতিষ্ঠা না পেলেও, ইংল্যাণ্ডের কলমচোষ্যদের কাছে থেকে আদায় করলেন প্রভূত প্রশংসা। বেদী তাঁর পুরনো অভিজ্ঞতাকে এই ইনিংসে প্রাণপণ চেষ্টা করেও কাজে লাগাতে পারেননি। গাওয়ার, র‍্যানডেল, মিলার, টেলর এমন কি সুযোগ বুঝে গুচও তাঁকে পিটিয়েছেন যথেচ্ছার। বরং তাঁরা সমীহ হয়ে ব্যাট করেছেন কপিল এবং ঘাউড়িতে। চন্দ্রশেখরকে মনে হয় লর্ডসের ভিজে উইকেটে বাদ দেওয়ার মধ্যে আত্মদংশনে দহিত হচ্ছিলেন দলপতি ভেঙ্কটরাঘবন। তাঁর বোলিং-এর অবিন্যস্ত ছিরিছাঁদ দেখে একটা কথাই হয়ত তাঁর মনে হচ্ছিল যে এই ম্যাচে তিনিই হলেন সর্বাপেক্ষা অবাঞ্ছিত। এই ম্যাচে গাওয়ারের দুর্ভাগ্য যে তিনি আর একটি শতরান সংগ্রহে বঞ্চিত হলেন। ঘাউড়ির একটা ইনকামিং বল জোরের ওপর ভিতরে ঢুকে তাঁর অফস্টাম্প ছিটকে দিয়ে সেনচুরির মুখ থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ড ৭ উইকেটে ৩৫৭ রান হাতে নিয়ে শুরু করে দিল মারমুখী বেপরোয়া ব্যাটিং। এই দিন কপিলকে দিয়ে মাত্র কয়েক ওভার বল করিয়ে ভেঙ্কট নিজেই এলেন আক্রমণ রচনা করতে—সঙ্গে সঙ্গী বেদী। মিলার সকালের উইকেটে গতদিনের মতো আস্থা রেখে খেলতে পাচ্ছিলেন না। বেদী ও ভেঙ্কটকে নির্দয় ভাবে প্রহার করলেও ঘাউড়ির বলে তিনি বিপজ্জনক ভাবে দু-

ছুবার ভরত রেড্ডীর অনভিজ্ঞ হাতে ক্যাচ দিয়েও প্রাণে বেঁচে গেলেন। বিশেষ করে তাঁর নিজস্ব ৬০ রানের মাথায় ভরত রেড্ডীর হাতে ক্যাচ তোলার বহর দেখে মনে হয়েছিল মিলার যেন আউট হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এমন একটা সহজ স্বেচ্ছামৃত্যুর সুযোগ নিজের দস্তানার মধ্যে পেয়েও ভরত রেড্ডী তা কাজে লাগ তো পারলেন না। শেষে মিলার বেদীর হলে উইকেট ছেড়ে লাগাতে এসে মারতে গিয়ে ভরত রেড্ডীকে তাঁর টেস্ট জীবনের প্রথম স্টাম্প আউট করার একটা সহজমত স্বুবর্ণ সুযোগ দান করলেন। সৌভাগ্য ভরত-রেড্ডীর—এ যাত্রায় বল ধরে উইকেট ভাঙতে কসুর করেন নি। টেলর ও মিলারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অষ্টম উইকেটে রান উঠেছিল ১১০টি। এই রান তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন মাত্র ১০৩ মিনিটে। নবম উইকেটের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিয়ারলি দলের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন ৪১৯ রানের মাথায়।

ভারতীয় ব্যাটধারীরা যখন দ্বিতীয় দফায় ব্যাটিং শুরু করলেন তখন তাঁদের ইনিংস পরাজয় এড়াবার জন্য দরকার ছিল ৩২৩ রান। এই ইনিংসে চৌহান এবং গাভাসকার অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে বৃটিশ বলবাজদের খেলতে শুরু করেন। বিশেষ করে এই ইনিংসে গাভাসকার যে ভাবে দান শুরু করেছিলেন তা দেখে একবারও মনে হয়নি যে তিনি চতুর্থ দিনে কোন সময়ের জন্য আউট হতে পারেন। মধ্যাহ্ন ভোজন পর্যন্ত ভারতের রান ওঠে বিনা উইকেটে ৫২। গাভাসকার ৩৪ রান করলেও, তাঁর রানের মধ্যে তেজস্বী, গরিমা ছিল। কিন্তু লাঞ্চের ঠিক পরেই ৭৯ রানের মাথায় অপ্রত্যাশিত ভাবে আউট হলেন চৌহান। র‍্যানডেল ফরোয়ার্ড শর্ট লেগে যে ক্যাচ ধরলেন, তা নিয়ে চৌহানের মনে লোভ থাকলেও, বৃটিশ অইনজ্ঞ পারমারের মনে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। পরম নির্ভরতার সঙ্গে গাভাসকার তাঁর রাজসিক গরিমাকে প্রকাশ করেও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। ১১২ মিনিট দাপটের সঙ্গে ব্যাট করে অনেকটা যেন

ইচ্ছাকৃত ভাবে দায়সারা বাটিং বিন্যাসের পরিচয় দিয়ে প্যাভেলিয়ানে ফিরে এলেন ৫৯ রান সংগ্রহ করে। এই আউটের আগে গাভাসকার ওই একই ওভারে দু দুবার ক্যাচ আউট হওয়ার সহজ সুযোগ দিয়ে প্রাণ ফিরে পান। প্রথম বলে তাঁর ক্যাচ ফেলে দেন র‍্যানডেল, যা বৃটিশ ক্রিকেটানুরাগীদের কাছে এক বিস্ময়কর নজির। মনে হয় র‍্যানডেলকে ক্যাচ ফসকাতে দেখে গাভাসকার তাঁর নিজের দৈবনির্ভর ভাগ্যের প্রতি বড় বেশী আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এর ফলে সাধারণত যা তিনি করেন না তাই করে বসেন দ্বিতীয় বলে আবার স্কোয়ারকার্টের ঝুঁকি নিয়ে সহজ ক্যাচে দিলেন ব্রিয়ারলির হাতে। স্লিপে দণ্ডায়মান ব্রিয়ারলি ক্যাচের জন্য প্রস্তুত না থাকায় বল তাঁর বুকে ছুঁয়েও মাটিতে পড়ে যায়। তৃতীয় বলটি গাভাসকার কোন রকমে ঠেকিয়ে চতুর্থ বলে বোথামকে তাঁর টেস্ট পর্যায়ের শততম উইকেট লাভের গৌরব অর্জনে সাহায্য করলে ওই একই কায়দায় ব্রিয়ারলিকে আবার একটি ক্যাচ দিয়ে। এবারের উত্তপ্ত ক্যাচটি ব্রিয়ারলির হাত ফসকায়নি। সানির বিদায়ে ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকেরা, তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হলেও, বোথাম অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন সানিকে। তাঁর অনুগ্রহে বোথমের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এত অল্প সময়ের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেটে শত উইকেট পাওয়া। বোথাম ১০০টি উইকেট সংগ্রহ করেছেন ১১৩ দিনে, আর ১৩৩ দিনে শত উইকেট সংগ্রহ করেছিলেন এণ্ডি রবার্টস। ৫৯ রানে সানির বিদায়ের পর উইকেটে এসে দাঁড়ালেন ভিশ।

বেঙ্কসারকার ও ভিশের জুটি লর্ডসের বুকে সৃষ্টি করলো এক অনন্য নজির। ১৯৫২ সালে এই ঐতহাসিক লর্ডসের বুকে মানকাদ তাঁর জীবনের সেরা ইনিংসটি খেলে যে শিল্পসৌধ রচনা করে গেছেন, তা আজো অম্লান। তবে হ্যাঁ—এই মানকাদ সৃষ্টি শিল্প সুরভিত ঐশ্বর্য গরিমার মতো ধ্রুপদী অভিজাত্য রচিত না হলেও ১৯৭৯-র লর্ডসে বেঙ্কসারকার ও ভিশের যুগল প্রচেষ্টা ভারতীয় ক্রিকেট ঐতিহ্যকে অনেকখানি যে মহিমান্বিত করে তুলেছিল এই বিষয়ে কারো মনে সন্দেহের অবকাশ নেই। ক্রিকেটের তীর্থভূমি লর্ডসে ভিনু মানকাদ ১৯৫২ সালে ১৮২ রান করে প্রথম সেনচুরি করে-ছিলেন। তাঁর সেই তেজস্বী ও ঐশ্বর্যদীপ্ত অতুলনীয় হিসাবে দ্বিতীয় ইনিংসটির পর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ভারতবাসীকে অপেক্ষা করতে হয়েছে লর্ডসের বুকে ভারতীয় সেনচুরিটির জন্য। বৃষ্টি ভেজা উইকেটে দলের সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে নবীন বেঙ্কসারকার ৩৫২টি বল খেলে ৩৩৮ মিনিট উইকেট পাহারা দিয়ে লর্ডসের বুকে গড়লেন ভারতীয় হিসাবে দ্বিতীয় সেনচুরি। তাঁর সেনচুরির খানিক বাদে ভারতীয় ক্রিকেট-অর্জুন দায়িত্বশীল খুদে বিশ্বনাথ, উদার ধ্রুপদী শিল্প বাহারে রঞ্জিত করে তুললেন লর্ডসের ঐতিহ্য ভূমিকে। ৩০৯ মিনিট বৃষ্টি ভেজা উইকেটে নতুন বলকে হাত খুলে প্রহার করে চোদ্দটি বাউণ্ডারীর সাহায্যে পূরণ করলেন নিজস্ব শতরান। এই নিয়ে ভিশের টেস্ট পর্যায়ে পূরণ হলো নবম সেনচুরি। গাভাসকারের বিদায়ের পর তরুণ বেঙ্কসারকারকে সাহসী ও সংগ্রামী করে তোলার ব্যাপারে বিশ্বনাথের সচেষ্ট ভূমিকা ছিল যথেষ্ট। উইকেটের চারপাশে তিনি নিজেও যেমন স্বতস্ফূর্ত উদ্দামে বিন্যস্ত ব্যাটিং প্রয়াসে রানের বন্যা এনেছিলেন, তেমনি সহযোগী

বেঙ্কসারকারকেও সাহায্য করেছিলেন রান সংগ্রহ করতে। দীর্ঘকায় বেঙ্কসারকার এই ম্যাচে তাঁর জীবনের যে সেরা ইনিংসটি খেলেছিলেন সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই আমাদের। হেনড্রিক, বোথাম, লিভারকে যেমন তিনি ধৈর্য সহকারে নিখুঁত খেলার চেষ্টা করেছেন, তেমনি সময়মতো প্রহার করে ভেঙে দিলেনে লাল বলের বিষ দাঁত। তৃতীয় উইকেটে এই দুই যুগলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারত সংগ্রহ করলো ২১০টি তাজা রান, যা নিঃসন্দেহে ভারতবাসীর নমনীয় রক্তের মতো প্রয়োজনীয় ছিল। এই রানের সুবাদেই বলা যায় ভারত আর একবার নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেল। দীর্ঘ সময় জুড়ে আলো-আঁধারি পরিবেশের মধ্যে ভিশ ও দিলীপ যে খেলা খেলে গেলেন, তা বহুকাল লর্ড'স প্রত্যক্ষদর্শী মাত্র স্মরণে রাখবেন। বলাবাহুল্য দলের স্বার্থ আগলাতে ভিশ চিরকালই সিদ্ধহস্ত। ভিজে উইকেটে এই দিন তিনি বোথাম ও লিভারকে যে ভাবে খেলেছেন, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। কাব্যিক ঐশ্বর্য রসে সিদ্ধ অর্জুন ক্রিকেটার ব্যবহার করলেন রকমারি ঝলমলে স্ট্রোক। অনবদ্য ভঙ্গিমায় ভিশ সেদিন যে ভাবে বোথামকে স্কোয়ার কাট করেছেন, তা দেখে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছে লর্ড'স'এ উপস্থিত ক্রিকেট যোদ্ধা-দের। তাঁরা ভিশের ব্যাট থেকে নির্গত রানের ঝরকায় ভেসে আবেগভরা কণ্ঠে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, ভিশের ইনিংসটি কাব্যিক ঢঙে রচিত ক্রিকেটের একটি সেরা ইনিংস। চতুর্থ দিনে বেঙ্কসারকার যে স্বাচ্ছ্যন্দতা দেখিয়ে ব্যাট করেছিলেন, পঞ্চম দিনের খেলার মধ্যে ছিল না তাঁর সেই পূর্বকার আত্মবিশ্বাস। প্রথম দিকটায় তাই তাঁকে বেশ কয়েকবার অপ্রস্তুত হতে হয়েছিল। অবশ্য সেই পরিস্থিতি সামলে দিয়েছিলেন ভিশ। এইদিন ভিশ যেন হাতে একটি শক্ত চাবুক নিয়ে ব্রিয়ারলির মোকাবিলা করতে মাঠে নেমেছিলেন। ঘন ঘন বোলিং বদল করেও তাই ব্রিয়ারলি একমুহূর্তের জন্যেও শক্ত ও সংযত রাখতে পারেননি ভারতীয় 'ক্রিকেট অর্জুন' ভিশকে।

ক্রিকেটের প্রতিটি চোস্ত মারকে শৈল্পিক রস বিন্যাসে সঞ্চারিত করে ক্রিকেটের কবি বিশ্বনাথ এগিয়ে গেলেন নিজস্ব শতরান পূরণ প্রত্যাশায়। স্কোয়ারকাট, অনড্রাইভ, গ্লাইড শটের নিপুণ বিন্যাসিত শিল্প মহিমায় লর্ডসের বুকে সৃষ্টি হয়েছিল এক অনুপম বর্ণালী ধ্রুপদী চিত্র। চা পানের বিরতির পর এই যুগল ব্যাটধারীর মধ্যে প্রথম বিচ্ছিন্ন হলেন বেঙ্কসারকার। এডমণ্ডস-এর বলে তিনি ব্যাট চালালে, বল তাঁর ব্যাটের কানায় লেগে উড়ে এসে পড়ে বয়কটের হাতে। বয়কট ক্যাচটি পরম কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করায় বেঙ্কসারকারের সুদীর্ঘ ৩৫৮ মিনিটের সাহসী ইনিংসের বুকে যবনিকা পতন হয়। ৩০৯ রানে বেঙ্কসারকার বিদায় নেবার খানিক বাদেই ভিশও আউট হলেন। লিভারের আউট গোইং বলে তিনি কাট করার চেষ্টা করলে বলটি নিচু হয়ে কাছে দাঁড়িয়ে থাকা গাওয়ারের হাতের মধ্যে জমে যায়। ৩১২ রানে ভিশের বিদায়ের পর যশপাল শর্মা যোগ দিলেন গায়কোয়াড়ের সঙ্গে। তাঁরা ধীরেসুস্থে দেখে শুনে খেলতে লাগলেন। তাঁদের রক্ষণাত্মক খেলার ছাঁচ অনুমান করেই বৃটিশ দলপতি ব্রিয়ারলি পরিস্কার বুঝলেন, ম্যাচ নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাঁরই অনুরোধে অম্পায়ার শেষ অবধি লর্ডসের ক্রিকেটে আনুষ্ঠানিক ভাবে ছেদ টেনে দিলেন। চার উইকেটে ৩১৮ রানে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংস গড়ার সুবাদে সফরের দ্বিতীয় ম্যাচ শেষ হলো অমীমাংসিত ভাবে। এই ম্যাচে 'ম্যান-অফ-দ্যা-ম্যাচ' দেওয়া হয় তরুণ বেঙ্কসারকারকে।

বৃষ্টি ধোয়া লীডস

দ্বিতীয় টেস্ট অমীমাংসিত থাকায় লীডসের তৃতীয় টেস্টের গুরুত্ব বেড়ে গেল। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ব্যাটধারীদের সৃষ্টি এই ঐতিহাসিক নজির চোখ খুলে দিয়েছিল সেদিন বৃটিশ কলমচোষ্যদের। তাঁরা একটা কথা পরিস্কার বুঝতে পেরেছেন, দল হিসাবে ভারত খুব একটা কমজোরী নয়। এই ম্যাচের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয়দের সম্পর্কে এক নতুন মতামত রাখলেন মাইক ব্রিয়ারলি। তিনি পরিষ্কার বললেন ভারতীয় দলে উচ্চাঙ্গের ব্যাটধারী আছে বটে, তবে বোলিং-এর ধার তাঁদের বহুলাংশে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আশা করছি পরবর্তী পর্যায়ে খেলা আরো জমবে।

লীডসের বুকে ভারতীয় ক্রিকেটারেরা এক নতুন উন্মাদনায় ব্যাট-বল হাতে নিয়ে কোমর বেঁধে লড়াই করতে নেমেছিলেন বৃটিশ যোদ্ধাদের সঙ্গে। মাইক ব্রিয়ারলি টসে জিতে মেঘলা আবহাওয়ায় ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতীয় বোলারদের চটুল আক্রমণের সামনে যেভাবে প্রাণ প্রার্থনায় নুয়ে পড়েছিলেন তা দেখে অতিবড় নিন্দুকও যেন মনে হয় শিউরে উঠেছিলেন। হরিয়ানার তরুণ বোলার কপিলদেব সহ বোম্বাইয়ের কার্ষণ ঘাউড়ি যেভাবে আক্রমণ রচনা করেছিলেন, তাতে বৃষ্টি না হলে ইংলণ্ড দল যে ওইদিন মূষিক দুর্বলতায় অচিরেই গুটিয়ে যেত—একথা অস্বীকার করার উপায় মনে হয় কারো নেই। দিনের শুরুতেই ভারতীয় দলপতি স্বয়ং বৃটিশ দলপতির প্রতি বদান্যতায় বিমুগ্ধ চিত্তে সহজ ক্যাচিংয়ের সুযোগ হাতছাড়া করলেন। দুর্ভাগ্য কপিলের, মাত্র তিন রানে তিনি যে আক্রমণ হানার চেষ্টা করেছিলেন তা ভেঙ্কটরাঘবনের অক্ষমতায় হাতছাড়া হতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় বোলারেরা নিজেদের ওপর আস্থা হারাননি। বরং দ্বিগুণ আত্মপ্রত্যয়ে তাঁরা

জ্বলে উঠেছিলেন প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ডের মতো। অল্প সময়ের মধ্যে তাই দেখা গেল অধিনায়ক ব্রিয়ারলি সহ বৃটিশ নিরাপত্তার অন্যতম বাহক বয়কট, গুচ এবং গাওয়ারের মতো ব্যাটধারীকে ফিরে যেতে। দলের ওই সংকট মুহূর্তে নবাগত বোথাম ও র‍্যানডেল বৃটিশীয় ক্রিকেট ঘরানার আদর্শকে বজায় রাখতে মাটি কামড়ে ব্যাট ধরলেন। লীডসে বৃটিশ তনয়দের ক্রিকেট দৈন্যতা পরিলক্ষিত করে মনে হয় সেই মুহূর্তের জন্য ইংরিজি সাহিত্যের সরেষ পণ্ডিতের দল নিজেদের পাণ্ডিত্যকে কোন রকমে ধামা চাপা দিয়ে মাঠ ত্যাগের সংকল্পে ব্রতী হয়েছিলেন আত্মসম্মান রক্ষায়। সমবেত খৃষ্টভক্তদের সকরুণ প্রার্থনা মনে হয় ক্রিকেটের বিশপ সদৃশসাদা পোশাকধারী আম্পায়ারডিকি বোর্ডের কর্ণ-গোচরও হয়েছিল। তাই তিনি কপিলদেব সহ ভারতীয়দের বোথামের বিরুদ্ধে সমবেত উৎকণ্ঠিত এল. বি. ডাবলু আবেদনকে নির্লজ্জের মতো বাতিল করে দিতে কুণ্ঠিত হননি। শুধু দাক্ষিণ্য আম্পায়ারদ্বয় করেননি, সেই সঙ্গে খৃষ্টকুলকে পরিত্রাণ করার জন্য শুরু হয়েছিল আকাশ ঝাঁপানো বৃষ্টি। প্রথম দিনের খেলা যখন বন্ধ হলো তখন ইংল্যাণ্ডের স্কোর বোর্ডে রান দাঁড়িয়েছিল চার উইকেটে আশি—যা দেখে শিউরে উঠেছিলেন ক্রিকেট বোদ্ধার দল।

লীডসের ক্রিকেট—সত্যি বলতে কি বৃষ্টির দোহাইতে আর শেষ অবধি ক্রিকেট পদবাচ্য ছিল না। মোট ১৫ ঘণ্টার বেশী সময় নষ্ট হওয়ার পর ক্রিকেট পুনরনুষ্ঠিত হলো আবার পঞ্চম বা শেষ দিনে। চতুর্থ দিনে খেলা যে অনুষ্ঠিত হয়নি এমন নয়। তবে সেই দিনও চা পানের পর খেলা বন্ধ হয়ে যায় বৃষ্টির জন্য। চতুর্থ দিনে খেলা পুরোপুরি না হওয়ায় খেলার চরিত্র যে কোন্ খাদে প্রবাহিত হবে, তা অতি সহজেই ছিল অনুমেয়। ফলে পঞ্চম দিনের ক্রিকেটের কোন গুরুত্ব ছিল না। লীডসের মতো ঐতিহ্যপূর্ণ ক্রিকেট উদ্যানে এই ম্যাচ দেখতে সেদিন উপস্থিত ছিল মাত্র কয়েক হাজার স্কুলের ছাত্র। থাক সে কথা—ফিরে আসি খেলার প্রসঙ্গে। চতুর্থ দিনে বোথাম বৃটিশ

ক্রিকেটের পরিত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত হলেন সংহার মূর্তিতে রণং দেহি আভিজাত্যে। ভারতীয় বোলারদের বেপরোয়া পেটাতে কসুর করলেন না বোথাম। কপিলদেব, কার্ষণ ঘাউড়ি, মহীন্দর অমরনাথকে দিয়ে ভিজে উইকেটে আক্রমণ চালিয়ে ভারতীয় অধিনায়ক যে পরিকল্পনার ছক তৈরী করে লাভবান হতে চেয়েছিলেন, তা তাঁরি ফিল্ডিং ক্ষমতায় অচিরেই হলো হাতছাড়া। এক ভেঙ্কটরাঘবন চতুর্থ দিনে কমপক্ষে চার-চারটি সহজ ক্যাচ ফেলে দিয়ে বৃটিশ ক্রিকেটকে আত্মরক্ষার সুযোগ এনে দিলেন। এই ম্যাচে বোথাম ১৬৯ মিনিটে চারটি ছক্কা সহ চৌদ্দটি বাউণ্ডারী মেরে পূরণ করলেন নিজস্ব শতরান। তাঁর এই শতরানে ব্যাটিং চাতুর্য যত না প্রকাশ ঘটেছে, তার চাইতে বেশী ফিল্ডিং ব্যর্থতার চাতুর্য প্রকাশ পেয়েছে ভারতীয় দলনেতা ভেঙ্কটরাঘবনের। ক্রিকেট যে কত অনিশ্চিত খেলা, তার প্রমাণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন বৃটিশ তনয় বোথাম। ভাগ্য সহায় না থাকলে এই ইনিংসে অত সহজ সুযোগ দিয়েও তিনি উইকেটে টিকে গেলেন কি করে। আর কেনই বা তাঁর ব্যাট চুম্বিত তপ্ত কেকের মতো সুস্বাদু ক্যাচগুলো সেদিন অন্য কারো কাছে না গিয়ে একেবারে যন্ত্রচালিত নিয়মে ভেঙ্কটের পিছু তাড়া করেছিল! বোথামের দুর্ভাগ্য—তিনি সেদিন ভাগ্যচালিত হওয়া সত্ত্বেও মাত্র তিন রানের জন্য বিশ্বের দ্রুততম ডাবলস্ সৃষ্টির রেকর্ড থেকে বঞ্চিত হলেন। এই ম্যাচে তাঁর ভাগ্য যেভাবে বদান্যতার আনুকূল্য পেয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল তিনি হয়ত এই ইনিংসেই ভিনু মানকাদ সৃষ্ট ২৩টি টেস্টে তৈরী ডাবলস সৃষ্টির রেকর্ডটি ভেঙে দিতে পারবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে সুযোগ বোথামের হাতছাড়া হয়। ধৈর্যের অবসান ঘটিয়ে বোথাম ভেঙ্কটের একটি স্পিনহীন সোজা সাধারণ বলে আত্মহুতি দিলেন। বোথামের বিদায়ের প্রায় সঙ্গেই ইংল্যাণ্ডের ব্যাটিং ইনিংসটি তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়ে। মাত্র ছ রান যোগ করে শেষ চারটি উইকেটের পতন ঘটে মাত্র ২৭০ রানে। সপ্তম উইকেটে বোথাম-মিলারের যৌথ

প্রচেষ্টায় রান উঠেছিল ৮০ মিনিটে ৮৭ রান। এই ম্যাচে সর্বপ্রথম বৃটিশ সাংবাদিকেরা খোদ নিজেদের মাঠে বসে 'আগ মার্কা স্পিন' ভারতীয় দলকে পেশ আক্রমণের ভূমিকায় প্রত্যক্ষ করলেন—যা সত্যিই এই সিরিজে বলাবাহুল্য বৃটিশ ক্রিকেটের উন্নাসিক সমালোচকদের কাছে ছিল নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। ভারতীয় স্পিনের মূলধন যে দিন দিন কমজোরি হয়ে আসছে একথা মনে হয় নতুন করে অতিবড় ভারতীয় সমর্থকদের মনে করিয়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বেদী-চন্দ্রশেখরের মতো ভেঙ্কটরাঘবনও যে নির্বিষ সর্পে পরিণত হয়েছেন, একথা মনে হয় ভারতবাসী অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, আর সেই সুবাদেই বোদ্ধা ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন যে, তাঁরা যেন ভেঙ্কট বা তাঁর সমতুল্য কাউকে আনুগত্যের পুরস্কার দেওয়ার চিন্তা না করে অনতি-বিলম্বে যোগ্যতার পুরস্কার দেওয়ার কথা ভাবনা চিন্তা করে ভারতীয় ক্রিকেটের মঙ্গলামঙ্গলের কথা স্মরণ করেন। চতুর্থ দিনে ভারতীয় ব্যাটধারীরা যেভাবে সূচনা করেছিলেন তা আদৌ আশাপ্রদ ছিল না। মাত্র এক রানে চেতন চৌহান ও নয় রানে মহিন্দর অমরনাথকে তাঁবুতে ফিরিয়ে দিয়ে ব্রিয়ারলি ভারতীয় ব্যাটধারীদের একরকম প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছিলেন। এইদিন ভারতীয় ক্রিকেটের সৌভাগ্য কিনা জানি না, চা পানের পর বৃষ্টির জন্য একটি বলও আর খেলতে হয়নি ভারতীয় ব্যাটধারীদের। পঞ্চম দিনে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের মূল স্তম্ভ ছিলেন সানি। বিশেষ করে দ্বিতীয় ওভারে হেনড্রিকের বলে ভিশ মাত্র এক রানে ফিরে গেলে সানি যেভাবে খেলেছিলেন, তা সত্যিই ছিল অবর্ণনীয়। এই ইনিংসে শুধু সানি একা নয়, চমৎকার ব্যাটিং করলেন যশপাল শর্মা। বিপদের মধ্যে যশপাল শর্মা যেভাবে ব্যাটিং চাতুর্যের প্রমাণ দিয়েছেন, তা নবাগত ক্রিকেটারদের কাছে নিঃসন্দেহে প্রেরণা উপযোগী বলা যায়। মোট ২২৩ রানে দু উইকেট পতনের পর ব্রিয়ারলি যখন বুঝলেন খেলার মধ্যে আর কোন প্রাণনেই

তখন তিনি খেলার সমাপ্তি ঘটাতে অনুরোধ করলেন আম্পায়ারদের কাছে। বৃটিশ দলপতির আন্তরিক প্রার্থনার শেষ অবধি লীডসের বুকে ক্রিকেটের অবসান ঘটলো।

লীডসের পর ওভাল।

শেষ ম্যাচ।

ওভালের বুকে ভারতীয় ক্রিকেটারেরা যে উন্নত ক্লাসিক ক্রিকেটের পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রত্যক্ষ করে বৃটিশ বোদ্ধার দল সবিস্ময়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন ইংল্যাণ্ডের ভূমিতে অনুষ্ঠিত বিগত তিরিশ বছরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তেজনাময় সফল ক্রিকেট টেস্ট। এই ম্যাচের শেষ বলটির মধ্যে ছিল প্রাণের স্পন্দন। মাত্র দশ রান দূরে থাকতে নির্দিষ্ট সময়ের খেলা শেষ হয়ে গেল—দুর্ভাগ্যবশত জয়ের মুখ দেখতে পেলেন না ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। তবু তাঁরা এই দিন যে মারমুখী জীবন্ত ক্রিকেটের ছবিটি ওভালের বুকে তুলে ধরেছিলেন, তার সম্মান জয়ের গৌরব অপেক্ষা কম ছিল না।

ওভালের উইকেটে ভারতীয় ক্রিকেটারেরা বিস্ময়কর কিছু ঘটাতে পারে এমন প্রত্যাশা কিন্তু অনেকেই করেছিলেন। ১৯৭১ সালে এই ওভালের বুকেই ভারতীয় দল বৃটিশকুলকে নাস্তানাবুদ করেছিল। অনবদ্য বোলিং করেছিলেন সেদিন চন্দ্রশেখর। তাই খেলার শুরুতেই ছিল বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা। ভারত তার কল্পনাকে সার্থক করতে পারতো যদি ভেঙ্কট টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং করার সুযোগ পেতেন। সেদিক দিয়ে ব্রিয়ারলিকে অবশ্যই ভাগ্যবান বলতে হবে। তিনি ওভালের বুকে টসে জিতে পেলেন ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত—এর ফলে ক্রিকেটের ভাগ্য পঞ্চাশ ভাগ ইংল্যাণ্ডের অনুকূলেই ধাবিত হয়েছিল। কিন্তু প্রাথমিক এই ভাগ্য আনুকূল্যতাকে ইংল্যাণ্ড ধরে রাখতে পারে-নি। ভারতীয় পেশ ও স্পিন বোলিং-এর নিখুঁত নিশানা বৃটিশ ব্যাট-ধারীদের বাধ্য করে নজরবন্দী মন্থর ক্রিকেট খেলতে। অভিজ্ঞ বয়কট ঘাউড়িকে খেলতে গিয়ে বেশ কয়েকবার দৃষ্টিকটুভাবে পরাস্ত

হয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনেছিলেন। নবাগত বুচারও মোটেই স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে খেলতে পারছিলেন না। ভারতীয় ফিল্ডসম্যানেরা যদি শুরুতেই তৎপর হতেন, তাহলে হয়ত ১৪ রান ইংল্যাণ্ডের স্কোর বুকে সংগ্রহ হওয়ার আগেই ফিরে যে়তে হতো এই দুই প্রারম্ভিক ব্যাটধারীকে। বিশেষ করে ঘাউড়ির বলে উইকেটের পিছনে বয়কট যে ক্যাচ তুলেছিলেন, তা অবশ্যই ভরত রেড্ডীর ধরা উচিত ছিল। সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার জন্য ভারতীয় বোলারদের আর একটু সময় নিতে হলো। প্রথম দেড় ঘণ্টায় ইংল্যাণ্ড সংগ্রহ করলো মাত্র ৩৭ রান। বৃটিশ ব্যাটধারীদের মন্থর ক্রীড়াবিন্যাস অসহ্য করে তুলেছিল ওভালকে। ঘন ঘন করতালি ও নিন্দাসূচক মন্তব্যে অতিষ্ঠ হয়ে মনেহয় শেষ অবধি নবাগত বুচার আত্মদংশনে দহিত অবস্থায় সবিক্রমে ভেঙ্কট প্রহারে উদ্যত হয়ে মাত্র ১৪ রানের মাথায় তিনি প্যাভেলিয়ানে ফিরে যান। দলের রান তখন ছিল ৪৫। এরপরই শুরু হলো বিপর্যয়। লাঞ্চের পর দ্রুত বদল হলো ক্রিকেটের দৃশ্যপট। মাত্র তিন রানের মধ্যে ইংল্যাণ্ডকে হারাতে হলো দুটি শ্রেষ্ঠ ব্যাটধারীকে। প্রথমে কপিলের ইন কাটিং বলে লেগ বিফোর হলেন বয়কট, শূন্য রানে গাওয়ার। এই সময় কপিল ও ঘাউড়ি দ্বৈত আক্রমণে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন বৃটিশ ব্যাটধারীদের।

চতুর্থ উইকেটে গুচ ও উইলি অসাধারণ ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। মনের সাহসে হাত খুলে মেরে মুহূর্তে এই দুই ব্যাটধারী বদলে দিলেন ক্রিকেটের চেহারা। বিশেষ করে নবাগত উইলি ছিলেন এই প্রহার উদ্যত ভঙ্গিমায় শ্রেষ্ঠ। গুচের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে প্রাণবন্ত ক্রিকেট প্রদর্শন করে উইলি আটটি বাউণ্ডারী সহ ৫২ রান করে শেষ অবধি বেদীর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। এর পরই খেলতে আসেন ইয়ানবোথাম। খেলতে নেমে বোথামের এই ম্যাচে প্রথম কর্তব্য ছিল ভারতীয় ক্রিকেটার ভিনু মানকাদ সৃষ্ট টেস্ট রেকর্ডটিকে অতিক্রম করা। ভারতের ভিনু মানকাদ এতকাল বিশ্ব-

ক্রিকেটে ছিলেন দ্রুত ডাবলসের রেকর্ড-অধিকারী—এবার সে জায়গায় স্থান পেলেন তরুণ বৃটিশক্রিকেটার বোথাম। একশো উইকেট সহ হাজার রান মানকাদ করেছিলেন ২৩টি টেস্ট ম্যাচ খেলে, বোথাম করলেন মাত্র ২১টি টেস্টের বিনিময়ে—এখানেই বোথামের শ্রেষ্ঠত্ব।

মধ্যাহ্ন ভোজনের আগেই ইংল্যাণ্ড ৩০৫ রানে দান শেষ করার সুবাদে ভারতীয় দল শুরু করলো প্রথম পর্যায়ের খেলা। এই ইনিংসের সূচনায় ভারতীয় দল যথারীতি আপন বিপর্যয়ের পথ অনুসরণ করলেন। মাত্র ন' রানের মধ্যে পতন ঘটলো চৌহান ও বেঙ্কসারকারের। তৃতীয় উইকেটে সানি-ভিস খানিকটা রান তোলার পর, সানি বিচ্ছিন্ন হলেন ৪৭ রানের মাথায়। সানির বিদায়ের পর দলের প্রয়োজনে আপন প্রতিভায় প্রকাশতি হলেন ভিশ। তাঁর খুদে শরীরটি একটু একটু করে সম্প্রারিত হতে লাগলো ওভালের উইকেটের চার পাশে রাজসিক উদ্ধত লাবণ্যে। ভিশ প্রমাণ দিলেন নিজের ক্লাসিক ব্যাটিং-এর গরিমা। উইলিস, বোথাম, হেনড্রিক কাউকেই পরোয়া করলেন না ভিশ। অবনদ্য স্কোয়ার কাট, স্কোয়ার ড্রাইভ মেরে তিনি সচল করলেন ক্রিকেটকে। ভিশের গগন বিস্তারিত ক্রিকেটের ছায়ায় যশপাল শর্মাও আত্ম-প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হতে কুণ্ঠিত হলেন না। এরপর ১৩০ রানের মাথায় ভিশ নিজস্ব ৬০ রানে বিদায় নিলেন। তৃতীয় দিনের লাঞ্চের আগেই ভারতের ইংনিসের সমাপ্তি ঘটলো ২০২ রানে। শেষ দিকে যজুবেন্দ্র সিং অনবদ্য ব্যাটিং করে নট আউট থাকলেন ৪৩ রানে। ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে একশো রান ব্যবধানে ব্যাট করতে নামলো। এই দিন খেলার শেষে তাঁদের সংগৃহীত রান ছিল ৩ উইকেটে ১৭৭। বয়কট ৮৩ ও উইলি ২৬ রানে অপরাজিত। চতুর্থ দিনে ইংল্যণ্ডের বিপর্যয়কে বুক দিয়ে রক্ষা করলেন বয়কট। ৯২ রানে সকালের উইকেটে প্রথমে বিদায় নিলেন উইলি। তারপর একে একে ব্রিয়ারলি, বেয়ারস্টো এবং সবশেষে অনবদ্য সেনচুরি করে ঘাউড়ির বলে বোল্ড হলেন বয়কট। আট উইকেটে ৩৩৪ রান তুলে নিশ্চিন্ত মন নিয়ে

ব্রিয়ারলি দান ছেড়ে দিলেন ভারতীয় দলকে। ৩৩৭ রানের ব্যবধান নিয়ে ভারতীয় ব্যাটধারী যখন ওভালের উইকেটে দ্বিতীয় দফা ব্যাটিং-এর জন্য মাঠে নামলেন, তখনও কিন্তু ক্রিকেটের অতিবড় বোদ্ধাও টের পাননি কি ঘটতে চলেছে। ভারতীয় দলের বিগত ইনিংসগুলির অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে অনেকেই ধারণা করেছিলেন, এই ম্যাচে ভারতীয় দলের প্রাণে বাঁচা সম্ভব নয়। ক্রিকেটের চেহারা একটু একটু করে বদল হলো চতুর্থ দিনের শেষ বেলায়। ১০৬ মিনিট নিপুণ ভাবে ব্যাট করে যখন অক্ষত শরীরে সানি ও চৌহান ফিরে এলেন ৭৬ রান সংগ্রহ করে।

পঞ্চম দিনে নাটক জমলো।

ক্রিকেট—সুন্দরী ক্রিকেট—অনিশ্চিত ক্রিকেট। ক্রিকেটের এই অনিশ্চিত চরিত্র যে কতখানি সত্যি তা প্রত্যক্ষ করা গেল নতুন করে ওভালের উইকেটে। সানি ও চৌহান প্রথম দিকে রান সংগ্রহের চেষ্টা না করে উইকেট রক্ষার চেষ্টা করলেন। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে সানি তাঁর সেনচুরি সংগ্রহ করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল ক্রিকেটের চেহারা। এই ম্যাচে মুখ্য ভূমিকা ছিল গাভাসকারের। তিনি একা বৃটিশ বোলারদের মোকাবিলা করতে সংহার মূর্তি ধারণ করলেন। তাঁর আগ্নেয়দীপ্ত দাবানল প্রজ্জ্বলিত ব্যাটের প্রহারে খান খান হয়ে যাচ্ছিল বৃটিশ প্রতিরোধ। মাঠর চারদিকে খেলো-য়াড়দের ছড়িয়ে দিয়েও বাউণ্ডারী আগলাতে পারছিলন না ব্রিয়ারলি। রাজসিক বীর্যতার স্বকীয় মদকতায় ঝলসে ওঠা সানির অম্লান দীপ্তি ওভালকে নতুন প্রাণের উন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। শুরু হলো বল প্রতি রানের পিছনে ছোটার পর্ব। ঘড়ির কাটার পিছনে পিছিয়ে পড়া ভারতীয় দল সানির একক প্রচেষ্টায় রানের পিছনে পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগলো অগ্নিগর্ভ ব্যাটিং-এর ঘোড়া ছুটিয়ে। প্রথম উইকেটের পতন ঘটলো ২১৩ রানের মাথায়। ভারতের পক্ষে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে স্থষ্টি হলো এক নয়া নজির। এর আগে প্রথম উইকেটের

জুটিতে ভারতের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রান ছিল ২০৩। ১৯৩৬ সালে ওল্ডটাফোর্ড মাঠে মুস্তাক-মার্চেণ্টের সেই অমর রেকর্ডটি মুছে দিয়ে সানি-চৌহান গড়লেন এক নতুন রেকর্ড। উভয়েই সেদিন সেনচুরি করেছিলেন। কিন্তু এবার সেই সেনচুরি উভয় ব্যাটধারীর ভাগ্যে ঘটলো না। চৌহান দুর্ভাগ্যবশত চতুর্থবার শতরানের দোরগোড়ায় পৌঁছে যথারীতি ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে আউট হলেন নিজস্ব ৮০ রানের মাথায়। বেঙ্কসারকার-সানি এবার হয়ে উঠলেন রান সংগ্রহে মরিয়া। দ্বিতীয় জুটির ক্রিকেট দেখে ওভালের দর্শক শিউরে উঠলেন। এই দিন সানি যেন ক্রিকেট দেবতার বরে সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর হাতের ব্যাটে নির্গত হচ্ছিল রাজসিক মহিমা। চাপানের আগেই ভারত একটি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করলো ৩০৪ রান। চা-পানের পর সানি তাঁর চর্চিত রমণীয় ব্যাটিংয়ের অনবদ্য জৌলুসে পূরণ করলেন দ্বিশত রান। রানের গতি তখন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। পাঠকদের জানিয়ে রাখি, এই নিয়ে সানি তিনবার টেস্ট ক্রিকেটে ডাবল সেনচুরি করলেন। তাঁর এই রান করতে সময় লেগেছিল ৪৯০ মিনিট। এই ৪৯০ মিনিটে ২১টি বাউণ্ডারী মেরে তিনি পূরণ করলেন নিজস্ব ২২১ রান। বেঙ্কসারকার আউট হলেন ৩৬৬ রানের মাথায়। ভারত তখন জয়ের প্রত্যাশায় সময় গুনছে। এই অবস্থায় কাঁধে ব্যথার জন্য ভিশ আসতে না পারায় তাঁর জায়গায় পাঠানো হলো কপিলদেবকে। কপিলদেব এই মরশুমে তাঁর মারমুখী ব্যাটিং-এর পরিচয় দিতে পারলেন না। সানি-কপিল জুটি পতনের পর যশপাল শর্মা ধরলেন দলের হাল। ইতিমধ্যে ২২১ রানে সানির বিদায় দলকে কিছুটা দমিয়ে দিল। বলাবাহুল্য—ক্রিকেটের সেই চরম মুহূর্তে সানি যদি উইকেটে আর একটু থাকতে পারতেন, তাহলে মাত্র ন'রানের জন্য ভারতকে এমন এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত হাতছাড়া করতে হতো না। কিন্তু এর নাম ক্রিকেট—একজন ক্রিকেটার যা করেছেন তা সধ্যাতীত—বাকী খেলোয়াড়েরা কি

করলেন। রানের পিছনে ছুটতে গিয়ে বেহিসাবী আউট হলেন ভিশ। মাত্র ১৫ রানে তিনি আউট হওয়ার প্রায় সঙ্গেই যুজুবেন্দ্র সিংও বিদায় নিলেন। রানের দূরত্ব কমে আসায় ক্রিকেটের উত্তেজনা বাড়তে লাগলো। আবেগে থরথর কাপতে লাগলো ক্রিকেট। দলের প্রয়োজনে ভেঙ্কট তরুণ খেলোয়াড়কে সাহস দেওয়ার জন্য নিজেই বেরিয়ে এলেন সাজঘর থেকে। ভালই খেলছিলেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভেঙ্কটের চরম মুহূর্তে তিনি রান পিপাসায় বলি হলেন রান আউটের কবলে পড়ে। ক্রিকেটের শেষ ওভারটি পর্যন্ত গোটা ওভাল আবেগে শিউরে উঠেছিল ঘন ঘন। দর্শকদের মধ্যে যারা হার্টের রুগী তাঁরা অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ইংল্যাণ্ড ক্রিকেটার হৃদয় যখন ভারতীয় ব্যাটধারীরা কাঁপন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য জান-মান পণ করে বসেছিলেন ঠিক তখনই চতুর্থ টেস্টর অন্তিম মুহূর্তের ছেদ পড়লো। মাত্র ন'রানের জন্য ভারতীয় ক্রিকেটকে হারাতে হলো এক ঐতিহাসিক গৌরব। তবে একটা ঠিক পঞ্চম দিনে ভারতীয় ব্যাটধারীরা যে চিত্তাকর্ষক ক্রিকেটের পরিচয় দিয়েছেন, তার আচরণ বৈশিষ্ট্যে ও উপভোগ্যতায় ওভাল ক্রিকেট সত্তরের শ্রেষ্ঠ ম্যাচ হিসাবে নিঃসন্দেহে যে বিস্মিত হয়ে একথা বলতে কোন দ্বিধা নেই।

ইংল্যাণ্ড ক্রিকেট সফর পর্ব শেষ। এবার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। সামনে অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তান সফর। আমরা অপেক্ষা করছি আগামী দিনের ইতিহাসের জন্য।

ভিশ একজন জাত শিল্পী। তাঁর ক্রিকেটের বৈচিত্র্যময় বিন্যাসের মধ্যে দেখা গেছে শিল্পের মহিমাময় গরিমা, যাঁর বিচ্ছুরিত দ্যুতির অম্লান সৌন্দর্যপ্রভায় ভারতীয় ক্রিকেটের ঐতিহ্য আজ অনেকখানি প্রকাশিত।

শিল্পীর কাছে শিল্পই বড়।

আর্ট ফর এ্যান আর্ট সেক—কথাটা লিখতে বসে এই মুহূর্তে আবার

নতুন করে মনে পড়লো। একজন জন্মগত জাত শিল্পী বলেই বোধহয় ভিশ তাঁর সৌন্দর্যের ভাণ্ডার অবলিলায় অকৃপণ হাতে বিমুক্ত করে দিয়েছেন সকলের কাছে। ভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচনকালে তাঁর হৃদয়ে জাগেনি কোন সন্দেহ বা সঙ্কোচের প্রশ্ন। কেন প্রশ্ন আসবে—তিনি তো আপন ঐশ্চর্য ভূমিতে একক—অপ্রতিদ্বন্দ্বি ক্রিকেট অর্জুন।

তাঁর কাছে ক্রিকেট ক্রিকেটের জন্য। এই ক্রিকেটের রস-সাগরে ডুব দিয়ে তিনি নিজেকে আত্মতৃপ্তির রূপলাবণ্যে সুসজ্জিত করেছেন। তাঁর কাছে ক্রিকেটকে ক্রিকেটের আপন রূপেই প্রকাশ করাই হলো আসল কাজ। রূপ থেকে অপরূপের যাত্রায় ভিশ তাঁর আপন গরিমার বিচ্যুরিত দ্যুতির প্রদীপ্ত প্রভায় আপন সাধন-যন্ত্রের একতারে বাজিয়ে গেছেন বৈরাগ্য-সাধনের মুক্তির গান। যে সুর ক্রিকেটকে বারংবার চমকৃত করেছে। যে সুর মূর্ছিত যন্ত্র ঝঙ্কারে ক্রিকেট বলতে হয়েছে—তুমি ক্রিকেটারের ক্রিকেটার।

ভিশ যে ক্রিকেটারের ক্রিকেটার কথাটা মিথ্যে নয়। তাঁর ক্রিকেটকে আত্মস্থ করতে হলে দরকার এক বিশেষ হৃদয়ানুভূতির। সানির ক্রিকেটে গরব আছে, তেজ, পৌরুষ আছে। কিন্তু ভিশের ক্রিকেটে আছে বিন্যাস, আছে লাবণ্য, আছে নমণীয় চাতুর্য—যা হৃদয়ে জাগিয়ে এক তোলে অজানা স্বপ্ন। তাই সানি আমাদের কাছে ভালো-বাসার, ভিশ আমাদের কাছে প্রেমিকের প্রেমিক। সানিকে হয়ত সেই কারণে বোঝা যায়, চেনা যায়, অনুভব করা যায়। কিন্তু ভিশ—তিনি বোঝা, চেনা, জানা, অনুভবের অতিরিক্ত আরএক সত্যনিষ্ট মানস পুরুষ। যাঁর উপলব্ধি একমাত্র হৃদয়ের গোপনতন্ত্রীর আপন সৌন্দর্য-গরিমায়।

ভিশের ক্রিকেট তাই রানের প্রত্যাশায় নয়, গরবের গরিমায় নয়, তাঁর ক্রিকেট হলো ক্রিকেট-রসের বিচারাধীন।

কথাটা মিথ্যে নয়।

একবার মনে করে দেখুন তো ইডেনের বুকে তাঁর ৯৬ রানে বিদায়-দৃশ্যের চিত্রটি! ইডেনের মানুষ সেদিন তাঁর সেনচুরি প্রত্যাশায় উন্মুখ,

ঠিক সেই মুহূর্তে ফিরে আসছেন তিনি। কোন শোক নেই, ব্যথা নেই, বেদনা নেই—উদাসীনতার এক জলন্ত প্রতিভূ যেন।

তাঁর ব্যর্থতায় চোখে জল এসেছিল সকলের।

অথচ কি আশ্চর্য! যার ব্যর্থতাকে ঘিরে এত শোক সেই তিনি বৈরাগ্যের সুরে গলা মিলিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কেবল বললেন, এটাই সহজ। এটাই ক্রিকেট। ক্রিকেটে এমন ঘটনাই ঘটে, এর জন্য দুঃখ করার কি আছে। ওহে তোমরা শোক ভুলে সহজ হও।

জীবন সম্পর্কে এমন নিশ্চিত দর্শনবোধ এক জাত-শিল্পী না হলে কেউ কি দিতে পারে।

সানি তাঁর সম্পর্কে মনে হয় ঠিক কথাই বলেছিলেন, ভিশ নিজে জানে না, ও কতবড় ক্রিকেটার।

আসলে জানা হয়ত সম্ভব নয়। জাতশিল্পী যদি তাঁর আপন সত্ত্বাকে আপনার মাঝে চিহ্নিত করতে পারেন, তাহলে তো তাঁর কোন প্রকাশের অবকাশই থাকে না। তাই ভিশের পক্ষে শিল্পের গরিমায় সচেতন আত্মপ্রসাদ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।

তাই তাঁর চন্দনচর্চিত রাজসিক ব্যাটের দ্যুতির চমক, শিহরণ জাগতে পেরেছে দর্শকদের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। রক্তের বেণুতে বেজেছে শ্বাশত শিল্পের অনুপম বসন্ত বাহার।

ভিশের ক্রিকেট তাই কাব্যের সৌন্দর্যে, শিল্পের মাহাত্ম্যে রসের সরসতায়, বিজ্ঞানের অঙ্গিকে সমাদৃত। তাই হয়ত তাঁর ব্যাটের রমণীয় তানে শোনা যায় সেই চেনা কলি ঃ

মম বাঁশরীর তানে পাশরি।
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরি॥

স্বল্পভাষি, লাজুক প্রকৃতির মানুষ ভিশ চিরকালই বড় একা। প্রচারের আড়ম্বর থেকে নিজেকে স্বেচ্ছায় সরিয়ে নিয়ে ভিশ যেন আপন জগতে, আপন চেতনায়, আপন শিল্পে, নির্বাসিত থাকতে চান সারাক্ষণ। অনাড়ম্বর ব্যক্তিগত জীবনে ভিশ তাই একজন সাদামাটা গোছের

মানুষ। তাঁকে দেখলে তাই বাহ্যরূপে ধরা পড়ে না তাঁর আন্তরিক হৃদয়-ঐশ্বর্য। বোঝা যায় না, ছোট্ট এই মানুষটির সত্যিকার ঐশ্বরীক ক্ষমতা কত ব্যাপক, কত গভীর।

চাপয়া-পাওয়ার সার্বিক মিলনেই জীবনের পূর্ণতা। সেই পূর্ণতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আজ আমি তৃপ্ত। একদিন যা আমি চেয়েছি, তা আমি পেয়েছি। ক্রিকেট আমায় অনেক কিছু দিয়েছে। আমি ক্রিকেটের কাছে প্রতি পদে পদে ঋণী। তবু অনেক কিছু পাওয়ার পর একটা কথাই মনে হয়, তা হলো নিজের সীমায়িত গণ্ডির পরিধি—যার মধ্যে বাধা পড়ে আছে আমার আর এক অতৃপ্ত মন। যে মন আমায় প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দেয়, "ওহে ভিশ, ক্রিকেটে তোমার আরো কিছু দেওয়ার আছে—সে যে আরো কিছু প্রত্যাশা করে তোমার কাছে—তুমি কি বোঝ না।"

হে ক্রিকেট, আমি তোমায় ভালোবাসি। ভালোবেসে তোমাকে উজাড় করে দিতে চাই। আমি যে তোমার, পথিক কবির গভীর রাগিণী বেণু বনে গান গাওয়া, এর বেশি তো আমি আর কিছু জানি না। আর তো আমার কোন পরিচয় নেই। আমি চাই না তোমার প্রেমে বিভোর হয়ে জাগতিক প্রত্যাশায় বড় রান গড়ার মোহে নিজেকে আস্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে—চাই না রেকর্ড বইয়ের অঙ্ক হিসাব করে তোমার মন্ত্র স্নিগ্ধ যন্ত্রের প্রহারে নিজের আত্মগরিমাকে প্রকাশ করতে। আমি চাই, আমার হৃদয়ের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু আকার, তাকে আপন কল্পনায় তোমার পায়ে সাজিয়ে দিতে। গ্রহণ করার হলে, তুমি তা গ্রহণ করবে। আর যদি ত্যাগ করতে চাও, তাও করতে পার, অসঙ্কোচে দুঃখ করবো না। কেবল বলবো হে ক্রিকেট, তোমাকেই আমি ভালোবাসি। তোমার মধ্যেই আমার প্রকাশ। রাখার হলে তুমি রাখবে, গ্রহণ করার হলে তুমি করবে, আমি যে তোমার একনিষ্ঠ পূজারীমাত্র।

ডাকাতের পাল্লায় বিশ্বনাথ

ক্রিকেটের কথা তো অনেক হলো এবার একটা ছোট্ট গল্প বলি। বাঙালী পাঠক ও লেখকদের এই এক বড় দোষ—ধরলে আর ছাড়তে চায় না সহজে—বিশেষ করে যদি তা মুখরোচক হয়—কি বলেন ?

পাতৌদির স্টেটে সে বছর আমন্ত্রিত হয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। পাতৌদির মানে আমাদের নবাব সাহেব মনসুর আলী। স্বভাবে গম্ভীর, স্বল্পভাষী। দেখে বোঝার উপায় নেই ভদ্রলোক ভিতরে ভিতরে কি ভাবছেন। ভারতীয় খেলোয়াড়েরা নবাবকে একদিন আর্জি জানালেন শিকারের। তাঁরা শুনেছেন এখানে নাকি মস্ত জঙ্গল আছে। উত্তরে নবাব বললেন—শিকারের ইচ্ছে যখন তোমাদের হয়েছে তখন আমি তোমাদের বাধা দেব না। জঙ্গলে তোমরা যেতে পার, তবে একটা কথা ওখানে কিন্তু বড় বেয়াদপ ডাকাত আছে তারা কিন্তু আমার অধীনস্থ নয়। উত্তরে অনেকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। ভিশ বললেন, ওসব ডাকাতের পরোয়া আমি করি না। ক্রিকেট মাঠে যদি গুণ্ডা বোলারদের গুণ্ডাপ্পা শায়েস্তা করতে পারে তো জঙ্গলের গুণ্ডাদেরও পারবে।

পাতৌদি আর আপত্তি করলেন না।

জঙ্গলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। সঙ্গে লোক পাঠালেন, নিজে গেলেন না—শরীর খারাপ।

জঙ্গলে পা দিয়ে প্রথমটায় কিছু বোঝা যায়নি। সারাটা দিন কাটলো। এরপর ফেরার পথে ঘটলো অঘটন। হৈ হৈ করে 'হারে-রে-রে' বলে ডাক ছেড়ে মশাল জ্বালিয়ে ডাকাতের দল ঘিরে ধরল তাঁদের। সবাই তখন প্রাণভয়ে কাতর।

ভিশের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। গাছের ডালে উঠে তিনি তখন আত্মরক্ষায় ডাকাত সর্দারকে বোঝাতে চাইছেন যে তিনি বিশ্বনাথ, ক্রিকেট খেলেন ভারতীয় দলে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ডাকাতেরা ক্রিকেটের কি বোঝে। তারা তাদের কাজ করলো। প্রাণে না মেরে এক রকম প্রায় বিবস্ত্র করে ছাড়লেন ভারতীয় ক্রিকেটের নন্দতুলাল গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথকে। মনমরা হয়ে প্রাণে বেঁচে লজ্জায় ফিরে এলেন রাজপ্রাসাদে।

সতীর্থ ক্রিকেটার অনুজদের এমন চেহারা দেখে পাতৌদি অবাক। বিনীত হয়ে বললেন—কি হলো ভিশ, এমন অবস্থা কে করলো তোমায়?

ভিশ সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা বললেন। উত্তরে দুঃখ প্রকাশ করে পাতৌদি বললেন—আমি সত্যিই দুঃখিত, তবে আমি কিন্তু তোমাকে আগেই সতর্ক করে ছিলাম।

তখনও কিন্তু কিছু বোঝা যায়নি। বোঝা গেল কিছু সময়ের পর। যখন পাতৌদি তাঁদের খোয়া যাওয়া বস্তুগুলো পাইয়ে দিলেন।

সবাই অবাক!

কি করে এসব সম্ভব হলো! ডাকাতদল পাতৌদিকে পৌছে দিয়ে গেছে সমস্ত অপহৃত বস্তু—তার মানে পাতৌদি কি এই ডাকাতদের সর্দার?

হ্যাঁ—এই ডাকাতির সর্দার ছিলেন স্বয়ং ক্রিকেটার নবাব অফ পাতৌদি। ডাকাতেরা ছিল সবাই তাঁর শেখানো অনুচর মাত্র। কেবল একটু নির্মল রসিকতাই ছিল সেদিনের এই ডাকাতির উদ্দেশ্য—আর কিছু নয়।

ভারতে হিউজ এলেন

ইংল্যাণ্ডের রাজসিক সফর শেষ করে ভারতীয় ক্রিকেট দল ফিরে এলো স্বদেশে। ওভালের বুকে সানির গরিমাদীপ্ত যৌবনবহ্নির রূপ প্রত্যক্ষ করেই, মনে হয় ভারতীয় কর্ণধারেরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার প্রায়শ্চিত্তের মনোভাব নিয়ে অধিনায়কের দায়দায়িত্ব ভেঙ্কটরাঘবনের হাত থেকে তুলে নিয়ে তা অর্পণ করলেন অচিরেই সেই কয়েক মাস আগের খারিজ হওয়া সানির হাতে।

হায় রে ভারতবর্ষের ক্রিকেট ও ক্রিকেটের কর্ণধারগণ ; আপনাদের ঘিরে আমার মতো অনভিজ্ঞ ক্রিকেট রসিক যাঁরা আছেন, তাঁদের তরফের শতকোটি প্রণাম। আর রঙ্গরসিকতা করার মতো সময় বা বয়স মনে হয় ভারতীয় ক্রিকেটের নেই। এখন থেকে সংযত হয়েই নির্বাচনী কাজে মন দিলে মনে হয় তাঁরা সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবেন। এবং তাতে আর কারো ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধ না হলেও, ভারতীয় ক্রিকেটের যে মঙ্গল সাধিত হবে এই বিষয়ে মনে হয় কারো সন্দেহ নেই।

সানিকে যে কি কারণে সেদিন খারিজ করে বাবু ভেঙ্কটকে অধিনায়ক নির্বাচন করা হয়েছিল এবং কেনই বা যে আবার কয়েক মাসের মধ্যে সেই সিদ্ধান্ত বদল করে বাবু ভেঙ্কটকে অপসরণ করে পুনরায় অধিনায়ক পদে খারিজ সানিকে বহাল করা হলো—এই রহস্য আজো ভারতবাসীর কাছে অজানা। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের বুদ্ধিমান কর্তারা নিজেদের মগজচর্চিত আর কোন নজির স্থাপন না করে অধিনায়ক নির্বাচনের হাস্যকর নাটকের যবনিকা টেনেছেন।

সানি অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন, সেই সঙ্গে সহ অধিনায়কের মর্যাদা পেয়েছেন আর একটি খুদে মানুষ—বিশ্বনাথ।

এবার সফরের কথা শুরু করি।

ওভালের বুকে ভারতীয় ক্রিকেটারেরা যে সংগ্রামী মনভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা থেকে অনেকেই অনুমান করেছিলেন যে চলতি সফরে নবগঠিত অস্ট্রেলিয়ানরা বড় একটা সুবিধা করতে পারবেন না।

কিন্তু ক্রিকেট চরিত্র—স্বধর্ম প্রকাশে সক্রিয় এবং তার প্রমাণ দিয়েছেন তরুণ অস্ট্রেলিয়া দল। মাদ্রাজের চিপক উইকেটে ভারতীয় ব্যাটিং ও বোলিং-এর সমস্ত গুণগত প্রভাবকে অস্বীকার করে চমৎকার ক্রীড়াশৈলীর পরিচয় দিয়েছেন হিউজ-এর দল। যে অমর প্রতিভার সে বহ্নি উন্মদনা কয়েকমাস আগে টেমস-এর জলোচ্ছ্বাসে সমগ্র ইংল্যাণ্ডকে কাঁপিয়ে তুলেছিল—সেই সানি চিপকের উইকেটে খুব একটা সুবিধা করতে পারলেন না। মাত্র পঞ্চাশটি রান, তার উত্তপ্ত ব্যাটকে অতৃপ্ত রেখেই বিদায় নিয়েছিল চিপকের উইকেট থেকে। আর ভিশ—ভারতীয় ক্রিকেট কৌলীন্যের আজন্ম শিল্পী, তিনিও যৎ-সামান্য কৃপাবর্ষণে বিদায় নিলেন মাদ্রাজের মানুষকে হতাশ করে। প্রথম টেস্ট ম্যাচ সেই অর্থে ভারতীয়দের পক্ষে কোন গরিমার ছিল না, বরং সেই তুলনায় অবশ্যই প্রশংসা করবো অস্ট্রেলীয় দলপতি এবং তাঁর সঙ্গীদের। ঘূর্ণিমান উইকেটে নিজেদের দায়িত্বকে কাঁধে নিয়ে সেদিন বর্ডার ও হিউজেস যেভাবে ব্যাটিং করেছিলেন তা সত্যিই প্রসংসার দাবী রাখে। ভারতের পক্ষে প্রথম টেস্টে একমাত্র সদস্য ছিল বাংলার বর্ষিয়ান বাঁহাতি বোলার দিলীপ দোশী। এই টেস্টে তিনি ভারতীয় দলে বয়সকালে নির্বাচিত হয়েও যৌবনদীপ্ত সুকুমারের মতো বল ঘুরিয়ে প্রমাণ করেছেন যে দলে তাঁকে আগে ডাকা হলে হয়ত কর্তারা লাভবানই হতেন—বাংলার ক্রিকেটারেরা অচ্ছুৎ নয়! ভারতবর্ষের ক্রিকেট, তোমার চরণে আর একপ্রস্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি—তোমার করুণার শেষ নেই, তুমি যে খেলোয়াড়দের গুণগত যোগ্যতার কথা স্মরণে না রেখে কর্তার ইচ্ছায় কর্মের ন্যায় কখন যে কার প্রতি সদয় হও—তা একমাত্র ঈশ্বরই—থুড়ি, তিনি জানেন না।

মাদ্রাজের চাঁপক উইকেটের টেস্ট ম্যাচে ভারতবাসী যে প্রত্যাশা ভারতীয় দলের কাছ থেকে আশা করেছিলেন তার বিন্দুমাত্র পূরণ হয়-নি। ইংল্যাণ্ড প্রত্যাগত দলটির অবিন্যস্ত ক্রীড়াশৈলী তাই বার বার ভারতবাসীর মনে এনেছে—একি সেই তাঁরাই, যারা ব্রিয়ারলীর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন! চেয়ার থেকে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন কুলীনকুলসর্বস্ব বৃটিশ ক্রিকেট কর্তারা। ভাগ্যিস মাদ্রাজে বৃষ্টি হয়েছিল, তাই না রক্ষে—নচেৎ কোথার জল যে কোথায় দাঁড়াতো তা হলপ করে কে বলতে পারে!

মাদ্রাজের টেস্ট বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার দিন কয়েক বাদে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হলো বাঙালোরে।

বাঙালোরে লর্ডসের ছবি

মাদ্রাজের মতো বাঙালোর ক্রিকেটে ভারতীয় দলপতি দ্বিতীয়বার টসে হারলেন। টসে জেতা অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক কিম হিউজ কিন্তু বৃষ্টি ভেজা বাঙালোর উইকেটে খুব একটা সুবিধা করতে পারলেন না। শুরুতেই ৯৫ মিনিট সময় বৃষ্টির কল্যাণে নষ্ট হলো। এরপর খেলা যখন শুরু হলো তখন অনেকেই আশা করেছিলেন ভারতীয় বোলারেরা হয়ত ভিজে উইকেট থেকে কিছুটা সুবিধা আদায় করতে পারবেন। কিন্তু ভারতীয় দর্শকদের সমস্ত আশাকে দুরাশায় পরিণত করে হিউস-এর দল দিনশেষে কোনক্রমে পৌঁছে গেলেন ১৮২ রাণে। প্রথম দিনে পতন হলো চারটি উইকেটের। চমৎকার খেলেছিলেন বর্ডার ও অধিনায়ক হিউজ। ভারতীয় বোলারদের কোনরকম সমীহ না করে, এই দুই অস্ট্রেলীয় ব্যাটধারী সেদিন নিখুঁত ক্রিকেট খেলে গেলেন ঘূর্ণিমান উইকেটে। নবাগত যাদব, অভিজ্ঞ ভেঙ্কট এবং দিলীপ

দোশী প্রাণপণ স্পিন শক্তিকে প্রয়োগ করা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র সংযত করতে পারলেন না বর্ডার বা হিউজকে। শেষ পর্যন্ত সাবলীল বিন্যাসিত ব্যাটিং-এর পরিচয় দিয়ে দোশীর বলে যাদবের হাতে ৪৪ রাণে কাচ আউট হলেন বর্ডার। বর্ডার বিদায়ের পর ইয়ালোপ উইকেটে খেলতে এসে প্রথমটায় খুব একটা স্বস্তি বোধ না করলেও প্রায় যখন তিনি নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তখনই যাদবের বাঁকা বলে অবর্ণনীয় ক্যাচ নিয়ে গোটা মাঠকে হতবাক করেছিলেন বিশ্বনাথ। প্রথম দিনের খেলা শেষ মুহূর্তে গড়িয়ে আসায় অধিনায়কের সঙ্গে উইকেট পাহারায় ব্যাট হাতে মাঠে নামলেন নৈশ প্রহরী ইয়ার্ডলি।

দ্বিতীয় দিন ৪ উইকেটে ১৮২ রান মূলধন করে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটধারীরা দেয়ালে পীঠ দিয়ে লড়াই শুরু করলেন। প্রাথমিক মন্থরতা ও দুর্বলতাকে পরিহার করে এই দিন ব্র্যাডম্যানীয় দর্শনে উদ্বুদ্ধ হলেন হিউজ। প্রথমে কপিল, ঘাউড়ি ও পরে যাদব, ভেঙ্কট, দোশী—এই ত্রয়ী স্পিন বূহ্যকে পাল্টা আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে নিজেদের স্বপ্রতিভায় প্রতিষ্ঠ করলেন হিউজ। ইয়ার্ডলিও অধিনায়কের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খারাপ খেললেন না। ১৫৯ রাণ থেকে পঞ্চম উইকেটে রাণ দাঁড়ালো ১৫৮। ষষ্ঠ উইকেটে উডের ব্যাট ছোঁয়া বলকে মাটিতে ঝাপিয়ে পড়ে ঘাউড়িকে একটি সতেজ উইকেট পাইয়ে দিলেন কিরমানি। হিউজ তখনও বেপরোয়া। মনে হয় এই সময় তিনি নিজের ব্যক্তিগত সেনচুরির কথা ভুলে গিয়ে দলীয় স্বার্থে রান তোলার ভাবনায় আত্মস্থ ছিলেন। তা নাহলে যে হিউজ এমন নিখুঁত ব্যাট করছিলেন, সেই তিনি কপিলের একটি নিকৃষ্ট বলে উত্তেজিত হয়ে অখেলোয়াড়োচিত ভাবে ব্যাট চালালেন কেন—আত্মসচেতন থাকলে নিশ্চয়ই তিনি অমন কাজ করতেন না। ফলে নিজের বাহাদুরির জন্য একটি সহজ ক্যাচ ঘাউড়িকে উপহার দিয়ে ৮৬ রানে ফিরলেন হিউজ। একটি জীবন্ত ইনিংসের অবসান ঘটলো। এরপরও অস্ট্রেলীয় ব্যাটধারীরা লড়াই করতে কসুর করলেন না। তাঁরা ঘূর্ণিমান যাদবকে দাবিয়ে শেষ পর্যন্ত

দলকে পৌঁছে দিলেন ৩৩৩ রানের একটি মাঝারি ইনিংসে। ভারতীয় দলের প্রাথমিক পর্বের ব্যাটিং দৃশ্য—কহতব্য নয়। নেহাতই দুঃখজনক—যে সানির ওপর ভারতীয় দর্শকদের মস্ত ভরসা, সেই সানি মাত্র ১০ রান করে ভারতীয় দলকে নিরাশ করে ফিরে এলেন প্যাভেলিয়ানে। চৌহান ফিরলেন ৬১ রানের মাথায়। বেঙ্কসরকারের সঙ্গে নৈশ্য প্রহরী হিসাবে যোগ দিলেন কিরমানি। দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতীয় দল তাঁবুতে ফিরলো দুটি মূল্যবান উইকেট খুইয়ে ৬৯ রাণ সংগ্রহ করে।

এরপর তৃতীয় দিনের ক্রিকেট। বেঙ্কসরকার-ভিশের জুটি বাঙালোরের রমণীয় ক্রিকেটে সৃষ্টি করলো এক অমর কাব্য। সেদিনের এই দৃশ্যকাব্যকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁরা নিসন্দেহে ভাগ্যবান। লর্ডসের বুকে মাত্র কয়েকমাস আগে এই জুটি যে ক্লাসিক ক্রিকেটের অবতারণা করে তাবৎ বৃটিশ মহলকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিলেন, সেই দৃশ্যকাব্যের একটা খণ্ডিত স্মৃতির বিন্যাসিত গরিমার প্রতিফলন যেন উপছে পড়েছিল বাঙালোরের উইকেটে।

তৃতীয় দিনের সকালে নৈশ প্রহরী কিরমানি ইয়ার্ডলির বুদ্ধি খাটানো ঘূর্ণিবলের ফাঁদে পড়ে দলীয় ১২০ রানের মাথায় রাইটের হাতে স্ট্যাম্প আউট হলে হিউজ হয়ত কিছুটা আশার আলো দেখেছিলেন। কিন্তু ভিশের আগমনে মুহূর্তে বদলে গেল ক্রিকেটের চেহারা। লর্ডসের কথা স্মরণ করানো এই ইনিংসে একটি মাত্র সুযোগ ছাড়া, বেঙ্কসরকার তাঁর বাঙালোরের গরিমাময় ইনিংসে আর দ্বিতীয় কোন সুযোগ দেননি। আর ভিশ—তাঁর শিল্পাসুলভ মন নিয়ে বাঙালোরের বুকে রচনা করলেন একটি অনুপম শিল্পশ্রী। একজন নিখুঁত শিল্পী যে ভাবে রঙ তুলি নিয়ে আত্মতন্ময়তায় নিমগ্ন থাকেন, ঠিক সেইভাবে নিজেকে আপন ভাবতন্ময়তায় ডুবিয়ে রেখেছিলেন বিশ্বনাথ। তাঁর বর্ণাঢ্য রূপ বিন্যাসিত অলংকার প্রয়োগে অচিরেই ক্রিকেট হয়ে উঠেছিল রমণীয়। ক্রিকেট কেতাবের সমস্ত ওস্তাদি মারগুলিকে রেশমী

মসৃণতায় আপন সাবলীল প্রক্রিয়ায় প্রয়োগে বিশ্বনাথ বাঙালোরের বুকে প্রমাণ করলেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। ১২০ রান থেকে অচিরেই ভারতের রান এসে পৌঁছলো ২০০ রানের দোরগোড়ায়। এই সময় দিলীপ বেঙ্কসরকার চমৎকার ভাবে তুটি ছক্কা মারলেন। বাঙালোরের নিস্তেজ ক্রিকেট, মুহূর্তে উভয় ব্যাটধারীর মারমুখী ক্রীড়াবিন্যাসে হয়ে উঠলো সজীব সতেজ। প্রথম শতরান পূরণ করলেন দিলীপ বেঙ্কসরকার। বাঙালোরের শতরান দিলীপের ক্রিকেট জীবনের তৃতীয় শতরান। লর্ডসের বুকে বেঙ্কসরকারের অমর ক্রিকেট, যা বৃটিশ সমালোচকদের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল, তারি একটি ভগ্নাংশ চিত্র ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করলেন সেদিন। বেঙ্কসরকারের শতরান পূরণের পর আত্মতন্ময়তায় নিমগ্ন শিল্পী ভিশ, এবার তাঁর হাতের গাণ্ডীবকে মন্ত্রবলে জাগ্রত করলেন। নিখুঁত ছবির মতো একটি শতরান ভিশের ব্যাট থেকে নির্গত হতে সময় নিলো না। চতুর্থ উইকেটে ভিশ-বেঙ্কসরকার জুটি ঐতিহাসিক লর্ডসের ক্রিকেটকে পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে বাঙালোরের বুকে গড়লো ১৫৯ রান। ২৭৯ রানের মাথায় ইয়ার্ডলির একটি নিচু বলে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খেলার চেষ্টা করায় বেঙ্কসরকার আউট হলেন এল. বি. ডাবলু। সঙ্গী হারিয়ে ভিশ যেন বহ্নি উন্মাদনায় প্রজ্বলিত হলেন। হিগস-এর বলে উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসে বিশ্বনাথ তাঁর ক্রিকেট জীবনে একটি অ-বিশ্বনাথীয় স্ট্রোকে ছক্কা মেরে চমকে দিলেন সকলকে। ভিশের সেদিনের অগ্নিগর্ভ ব্যাটিং-এর সুর ঝংকারিত প্রহারে দিশেহারা হয়ে উঠেছিলেন অস্ট্রেলীয় দলপতি। তিনি ঘনঘন বোলিং বদল করেও কিছুতেই দমন করতে পারলেন না বিশ্বনাথের সাবলীল মন্ত্রসিদ্ধ ব্যাটের ধ্রুপদীয়ানাকে। পেশ ও স্পিনের সম্বলিত আক্রমণকে নির্দয় চিত্তে ব্যাটের চাবুকে ভিশ দিলীপকে সাহস যোগালে, মুহূর্তে বোম্বাই তনয়ের হাতের ব্যাট ঝলসে উঠতে থাকে। মন্থর ক্রিকেটের অপবাদ খণ্ডন করতে মনে হয় বেঙ্কসরকার সেদিন বদ্ধপরিকর ছিলেন। ওভালের বুকে বীরদীপ্ত সংগ্রামী ঝড়ো

ক্রিকেটের পরিচয় দেওয়া ভারতীয় দল যে জয়মুখ দেখতে পেলেন না, এর জন্য অনেকেই সেদিন দায়ী করেছিলেন বেঙ্কসরকারের গতানুগতিক মন্থর ক্রিকেটকে। অনেকের ধারণায়, বেঙ্কসরকার সেদিন যদি তাঁর হাতের ব্যাটকে গুটিয়ে না রেখে কিছুটা সাহসভরে ব্যাট চালাতে পারতেন, তাহলে হয়ত সময়ের অভাবে ভারতীয় দলকে জয়ের মুখোমুখি এসে থমকে দাঁড়াতে হতো না। এই নিন্দা অপবাদ মনে হয় বেঙ্কসরকারকে আত্মদহনে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। তাই তিনি ঠিকই করেছিলেন, মন্থরবিমুখ ক্রিকেটে ব্যাটকে সক্রিয় রাখবেন। ভিশ উইকেটে আসার পর খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন না। তাঁর হাতের ব্যাট সেদিন প্রতিটি বলকে অসংযমীর মতো ছুঁয়ে ছিল। বিশেষ করে একবার ইয়ার্ডলির বলে স্কোয়ার কাট করতে চেষ্টা করলে, বল তাঁর ব্যাটের তলায় লেগে স্কোয়ার লেগের দিকে চলে যায়। এই ধরনের বিসদৃশ স্ট্রোক শুধু যে গোটা মাঠের দর্শকদের অবাক করেছিল তাই নয়, সেই সঙ্গে সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন খুদে মাস্টার স্বয়ং। ভিশের ক্রিকেট জীবনে এই ধরনের বিস্ময়কর স্ট্রোক তাঁর ব্যাট থেকে উদ্গারিত হতে এর আগে কেউ কখনও দেখেছেন বলে মনে হয় না। তবে এটা ঠিক—এই দিন উইকেট ছিল অত্যন্ত মন্থর, বল পড়ে এত আস্তে ছুটছিল যে ভিশের পক্ষে তাঁর সাধনসিদ্ধ স্ট্রোকগুলিকে প্রয়োগ করা হয়ে উঠেছিল প্রতিকূল। তবু এই প্রতিকূলতার মধ্যে ভিশ নিজেকে মানিয়ে নিতে কসুর করলেন না। জাত শিল্পী তাঁর শিল্প বনেদিয়ানার প্রভাবে বেঙ্কসরকারকে প্রলুব্ধ করে তুললো অচিরেই। জীবনের একটি সেরা ইনিংস স্বদেশে প্রদান করলেন দিলীপ। উইকেটের চারদিকে হগ, হার্স্ট, হিগস, ইয়ার্ডলি ও ইয়ালোপকে যথেচ্ছা পেটালেন। তাঁর উদ্ধত ব্যাটের নির্দয় প্রহারে লালবল ছুটে চললো সীমানার বাইরে। লম্বা তাড়িত ইনিংসটির মধ্যে বেঙ্কসরকার মাত্র একবারই ভুল করেছিলেন। হগ-নিক্ষিপ্ত বাউনসার কাঁধ পর্যন্ত লাফিয়ে উঠলে দীর্ঘকায় বেঙ্কসরকার সেই বলকে লেগের

দিকে হুক করার চেষ্টা করলে মিড-উইকেটে যে ক্যাচ উঠেছিল তা ফসকে যান হিগস। আপন শাসনভারে ভিশ এই দিন দস্তুর মতো সম্রাট ভূমিকায় বিচরণ করেছেন। তাঁর ক্লাসিক ব্যাটের সৌন্দর্য পশরা মোহিত করে তুলেছিল সমগ্র বাঙালোরকে। বিশেষ করে ভিশের অনবদ্য চোখ জুড়ানো স্কোয়ার কাট, স্কোয়ার ড্রাইভ, পুল ও গ্লান্স বহুকাল স্মরণে থাকবে বাঙালোরের ক্রিকেট রসিকদের। গোটা ইনিংসে একমাত্র ৪১ রানের মাথায় একটি সহজ ক্যাচ উঠেছিল ভিশের উত্তপ্ত ব্যাট থেকে—কিন্তু ভিশের ব্যাট ছোঁয়া সেই নিচু ক্যাচ স্লিপে হিলডিচের হাত ছুঁয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এই একটি মাত্র অসংযমী স্ট্রোক ছাড়া ক্রিকেটের সাধক সন্ন্যাসীকে দ্বিতীয় কোন ভুলের সুযোগ দিতে দেখা যায়নি, তাঁর মহিমান্বিত ১৬১টি রানের মধ্যে। পঞ্চম উইকেটে তরুণ যশপাল সহজ ভাবে ব্যাটিং শুরু করে অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করে নিলেন নিজস্ব ৩৭ রান। ষষ্ঠ উইকেটে কপিলদেব ও বিশ্বনাথ দলকে পৌঁছে দিলেন ৪৫৭ রানে। শেষ দিনে ভিশের ১৬১ রান ও কপিলের ৩৮ রানের মাথায় ভারতীয় দলপতি যখন ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন, আগেই বোঝা গিয়েছিল বাঙালোরের দ্বিতীয় টেস্টের ফলাফল মাদ্রাজের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। কিন্তু শেষ দিনে বাঙালোরের সজীব উইকেটের প্রাণ-ইশারায় নবীন যাদব যে ভাবে বল করেছিলেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। মাত্র ১৩ রানে প্রথমে হিলডিচ ও পরে ৫৩ এবং ৬২ রানে যাদবের ঘূর্ণিমান স্পিনের টানে ঘায়েল হলেন বর্ডার ও উড। হিউজ ও ইয়ালোপ দলকে টেনে নিয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত।

বাঙালোরের ক্রিকেট শেষ হলো। এই ফলহীন ক্রিকেটের মূল্যায়নে আমরা ভারতবাসী পেলাম বিশ্বনাথের একটি নিখুঁত ব্যাটিং চিত্রের পরিচয়—সে দৃশ্যকাব্য বহুকাল আমাদের স্মরণ থাকবে। সেই সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট দীর্ঘদিন বাদে আবিষ্কার করলো একটি তরুণ হাতিয়ার—প্রসন্ন, ভেঙ্কটের যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে ক্রিকেট

ভূমিতে ভূমিষ্ঠ হলো তরুণ স্পিনার শিবলাল যাদব। মাদ্রাজের প্রথম টেস্টে বাঁহাতি দিলীপ দোশী যে চমক এনে ভারতীয় দল থেকে অভিজ্ঞ বেদীর স্থানকে অনিশ্চিতের মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েছে, ঠিক তেমনি যাদব ভূমিকা প্রশ্ন এনেছে ভেঙ্কটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

কানপুরে ভারত জিতল

দীর্ঘ বিশ বছর আগের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে কানপুরের তৃতীয় টেস্টে ভারত জিতলো। জিতলো দীর্ঘ আটটি টেস্ট অমীমাংসিত থাকার পর।

চলতি সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল তাঁদের গুণগত উৎকর্ষতার কোন পরিচয় দক্ষিণ ভারতীয় সীমানায় প্রদর্শন করতে না পারায় ভারতীয় ক্রিকেট রসিকেরা মোটেই সুখী ছিলেন না। নবাগত স্পিনার হিসাবে দিলীপ দোশী ও শিবলাল যাদবের বোলিং এবং ব্যাটসম্যান হিসাবে সেই সবেধন নীলমণি সানি ও ভিশের যুগ্ম প্রয়াস ছাড়া আর কোন নতুনত্ব চলতি সফরে বলার মতো ছিল না।

মাদ্রাজ ও বাঙালোর টেস্টে ভারতীয় দল ক্রিকেটের কোন বিভাগেই অস্ট্রেলিয়ানদের পিছু ফেলে নিজেদের উন্নত মেধার পরিচয় দিতে পারেননি। তাছাড়া পরপর দুই টেস্টের মেজাজ কিছুটা ব্যহত করেছে একঘেয়ে বৃষ্টি। এর ফলে কানপুরের তৃতীয় টেস্টকে ঘিরে ভারতীয়দের মনে দানা বেঁধে ছিল নানা রকম জল্পনা কল্পনা।

বলাবাহুল্য এই কানপুর মাঠেই ভারতীয় দল প্রথম ম্যাচ জিতেছিল অফস্পিনার যসু প্যাটেলের কল্যাণে—সেটা ছিল ১৯৫৯ সাল।

বৃষ্টিহীন কানপুরের নবনির্মিত উইকেটে ভারতীয় দলপতি গাভাসকার টসে জিতলেন। চৌহান-গাভাসকরের জুটি এই

কানপুর উইকেটে শুভ সূচনায় যথেচ্ছার পেটালেন ডিমক, হগ, ইয়ার্ডলি ও হিগসকে। কানপুরের উইকেট চরিত্রের স্পিন দুর্বলতার খ্যাতি মনে হয় চলতি মরশুমে কার্যকরী হয়নি। বরং সে তুলনায় কানপুরের নতুন উইকেট থেকে সাহায্য পেলেন অস্ট্রেলীয় পেসম্যানেরা। চমৎকার বোলিং করলেন ডিমক। হগ 'নো-বোলিং'-এর দুর্বলতার কবলে পড়ে মানসিক দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বোলিং-এর ধার কম ছিল না। বিশেষ করে তাঁর বোলিং-এর সামনে বারবার অসহায় অবস্থায় পড়তে হয়েছিল চৌহানকে। খেলার শুরুতেই এই দিন আত্ম-প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ছিলেন সানি। তাঁর উদ্ধত ব্যাটের ঘায়ে লাল বল বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গিয়েছে সীমানার বাইরে। বিশেষ করে সানির অন ড্রাইভ ছিল দেখার মতো। কানপুরের সপ্রাণ উইকেটে হার্স্ট দলে না থাকায় মনে হয় অধিনায়ক হিউজ কিছুটা মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। যদিও একথা ঠিক হার্স্টের বদলি হিসাবে এই ম্যাচে ডিমক চমৎকার বোলিং করেছিলেন। চৌহান তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ অস্থির ব্যাটিং বদলে এই দিন সম্পূর্ণ মন্থর খোলসের মধ্যে গুটিয়ে রেখেছিলেন নিজেকে। সানির ব্যাটিং চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত—বরং তিনি কিছুটা বাড়তি উৎসাহে ব্যাটকে চালনা করলেন নিজের খেয়াল খুশি মতো। তাঁর দর্পিত ব্যাটের উগ্র দংশনে প্রহারিত লাল বল সবুজ ঘাসের বুকে বিদ্যুৎ রেখায় ছুটে যাচ্ছিল বাউণ্ডারীর বাইরে। দেখ দেখ করে সানির পুরে গেল অর্ধশত রান। চৌহান তখনও অনেকটা পিছনে পড়ে। অধিনায়ক হিউজ আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয় আম্পায়ারদের কাছে হগ-এর বৈধতা প্রমাণ করতে পারলেন না। এর ফলে ডিমক ও ইয়ার্ডলি এবং প্রয়োজনে ইয়ার্ডলিকে বদলে হিগসকে এনে শুরু করলেন নয়া আক্রমণ। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ফল ফললো—ডিমকের একটা নিচু বলে নিজস্ব ৭৬ রানের মাথায় লেগবিফোর হলেন সানি। প্রথম উইকেটের পতন ঘটলো ১১৪ রানের মাথায়। দ্বিতীয় উইকেটে বেঙ্কসরকার এসে জোট বাঁধলেন চৌহানের সঙ্গে।

সানির বিদায়ের পর চৌহান তাঁর মন্থরতার খোলস ছাড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। এই সময় রান এলো কিছুটা। বেঙ্কসরকার বেশ কয়েকটি চোস্ত মার মারলেও, তাঁর খেলার মধ্যে স্বচ্ছন্দতা ছিল না। বরং সে তুলনায় চৌহান ছিল অনেকখানি আত্মনির্ভর। চা পানের পর অধিনায়ক হিউজ স্পিন বোলার বদল করে উভয় প্রান্ত থেকে শুরু করলেন পেস আক্রমণ। এই সময় 'নো' আক্রান্ত মানসিক বিকার কাটিয়ে হগ যে স্বচরিত্রে এতটা মারাত্মক আকার ধারণ করবেন মনে হয় এই কল্পনা অস্ট্রেলীয় দলপতিরও ছিল না। ২০১ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটলো। হগের বুদ্ধি-দীপ্ত, একটা মন্থর ডেলিভারিতে ড্রাইভের চেষ্টা করায় চৌহান সহজ ক্যাচ তুলে বিদায় নিলেন। এর খানিক বাদে ওই হগের নিচু বলে লেগবিফোর হলেন বেঙ্কসরকার—চলতি মরশুমে তিনটি ইনিংসে এই নিয়ে পূরণ করলেন একটি সেনচুরি সহ দুটি অর্ধশত রান। ২০৬ রানে তৃতীয় উইকেটের পতনের পর চতুর্থ ও পঞ্চম উইকেটের পতন ঘটলো খুবই দ্রুত। প্রথম ফিরলেন শূন্য রানে যশপাল শর্মা, এরপর কপিলদেব। নিমেষে বদলে গেল ক্রিকেটের চেহারা। নড়ে যাওয়া ভারতীয় খুঁটিকে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলেন ত্রাণকর্তা বিশ্বনাথ। দলের বিপদে অর্জুনের ভূমিকায় স্বহস্তে গাণ্ডীব ধারণ করে বহুবার এই খুদে মানুষটি দলকে রক্ষা করেছেন। এই দিন বিশ্বনাথের ব্যাট যেমন ছিল সংযত, তেমনি ছিল অপরিমেয় আত্মবিশ্বাসে অটল। দলের সমস্ত দায়িত্বকে খুদে মানুষটি নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে লড়াই শুরু করলেন অস্ট্রেলীয় আক্রমণের সামনে। হগ, ডিমক, হিগসকে সাবলীল ভঙ্গিমায় মন্ত্রসিদ্ধের ন্যায় প্রহার করে ভিশ কানপুরের বুকে রচনা করলেন এক অমর কাব্য। ভিশ যে কত বড় কাব্যিক ক্রিকেটার তা স্পষ্টত ধরা পড়লো কানপুরের দরদী ইনিংসটির মধ্যে। হৃদয়ের সমস্ত আবেগকে পুঞ্জিভূত গরিমার স্বতন্ময়তায় প্রকাশ করে ভিশ যেন হাতের ব্যাটে বাজালেন ক্রিকেটের ধ্রুপদ রাগিনী। সে রাগমূর্ছনার

তরঙ্গিত স্রোতস্বিনী প্রবাহে গোটা কানপুর হয়ে উঠেছিল ভাববিহ্বল। ভিশ এইদিন ছবির মতো একটি নিখুঁত ইনিংস গড়লেন। বর্ণাঢ্য রঞ্জিত স্বতঃস্ফূর্ত এই ইনিংসটির তুলনা একমাত্র ভিশের নিজের স্বকীয় প্রতিভার সঙ্গেই তুলনীয়। উইকেটের একটি প্রান্ত অচলায়তন ভিশ আগলে রাখলেও অন্য প্রান্তে হগ ও ডিমক হয়ে উঠলেন ভয়ঙ্কর। একক প্রচেষ্টায় প্রাণ-উজ্জ্বল ক্রিকেটে ভিশ নিজের ব্যক্তিগত রান গরিমার কথা স্মরণে না রেখে দলগত স্বার্থে নিজের শক্তিকে চালিত করলেন। কিরমানি, ভেঙ্কট, যাদব, ঘাউড়ি কেউই বুকে সাহস নিয়ে কোমরের কষি শক্তভাবে বেঁধে দাঁড়াতে পারলেন না ডিমকের বলে। শেষ উইকেটে দিলীপ দোশী কিছুটা সময় ব্যাট সোজা রাখার ফলে ভিশ বেপরোয়া কয়েকটা রান সংগ্রহ করেছিলেন। অবশেষে অতিরিক্ত খেলোয়াড়ের হাতে রানের প্রত্যাশায় ক্যাচ তুলে দিয়ে উইকেট থেকে বিদায় নিলেন ক্রিকেটের কবি। তাঁর এই ইনিংসে সংগৃহীত ৪৪টি রান যে শতরানের সমতুল ছিল, একথা স্বীকার করতে মনে হয় ভারতবাসীমাত্র বাধ্য। ২৭১ রানে ইনিংস শেষ হলো ভারতের। ডিমক পেলেন ৯৯ রানে পাঁচটি উইকেট, হগ চারটি উইকেট তাঁর ঝুড়িতে সংগ্রহ করলেন ৬৬ রানের বিনিময়ে।

কানপুরের নতুন উইকেটে অস্ট্রেলীয়ানরা প্রথমদিকে খুব একটা সাহসের সঙ্গে ব্যাট ধরতে পারলেন না। মাত্র তেরো রানের মাথায় হিলডিচ আউট হলেন ঘাউড়ির বলে। দ্বিতীয় উইকেটে বর্ডার ও ইয়ার্ডলি বেশ সতর্কতার সঙ্গে খেলা শুরু করেছিলেন। কানপুরের সতেজ উইকেটে ভারতীয় দলপতি যে মূলত নির্ভর করেছিলেন পেশ আক্রমণকে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল একটানা কপিল ও ঘাউড়িকে প্রয়োগের মধ্যে। এই যৌথ পেশ আক্রমণের ফল ফললো অচিরেই— ঘাউড়ির আউট-গোয়িং বলে ব্যাট ছুঁয়ে যশপালের হাতে ক্যাচ আউট হলেন ইয়ার্ডলি। তৃতীয় উইকেটে অধিনায়ক হিউজ এসে ঘোরালেন খেলার গতি। ব্যাকরণ-সিদ্ধ ক্রিকেটকে কার্যকরী করে হিউজ-এর

উগ্রমূর্তি অচিরেই নুয়ে দিল ফুঁসে উঠে ভারতীয় বোলিং আক্রমণকে। উইকেটের চারদিকে হিউজের স্পর্ধিত ব্যাটের ঘা খেয়ে বল ছুটে চললো বিদ্যুৎ গতিতে। রান বাড়তে লাগলো। অন্যপ্রান্তে বর্ডার সক্রিয়। এই সময় সানি পেশ আক্রমণকে সাময়িক বিরতি দিয়ে বল তুলে দিলেন অভিজ্ঞ ভেঙ্কট-এর হাতে। এই বদলে ফল পেলেন গাভাসকার। ভেঙ্কট-এর ঘূর্ণিমান বলে বর্ডারের ব্যাট ছোঁয়ামাত্র স্লিপে দর্শনীয় ক্যাচ ধরলেন বিশ্বনাথ। ৭৫ রানে বর্ডারের বিদায়ের পর ইয়ালোপ এসে দাঁড়ালেন হিউজের পাশে। চতুর্থ উইকেটের এই জুটি প্রথম দিকে খুব একটা আস্থা প্রকাশ করতে না পারলেও ধীরে ধীরে তাঁরা বদলে দিলেন ক্রিকেটের গতিকে। বর্ডার বিদায়ের পর ভারতীয় দর্শকেরা অনেকেই নড়ে বসেছিলেন। ভেবেছিলেন হয়ত তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যে ইয়ালোপকে ফিরিয়ে দিয়ে হিউজের স্নায়ুর চাপকে বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু কার্যত তা হলো না, বরং এই দুই ব্যাটধারী যে নম্রতা মিশ্রিত দাপটের পরিচয় দিলেন, তাতে পাল্টা স্নায়ুর চাপ বৃদ্ধি পেলো ভারতীয় দর্শকদের। বিশেষ করে স্পিনপোক্ত ইয়ালোপের ভূমিকা সেদিন ছিল অনবদ্য। তাঁর সঙ্গত, ন্যায়নির্ভর ব্যাটিং চাতুর্য শুধু দর্শনীয় ছিল না, সেই সঙ্গে শিক্ষণীয়ও ছিল বলা যায়। হিউজ যাদব ও দোশীর বলে বেশ কয়েকবার পরাস্ত হওয়ার পর ৫০ রানের মাথায় বোল্ড হলেন যাদবের বলে। এই উইকেট পতনের পর দ্রুত কপিলের একটা নিচু বলে লেগবিফোর হলেন রাইট। হোয়াটমোর উইকেটে এসে কয়েকটি সুন্দর স্ট্রোক করা সত্ত্বেও উইকেটে টিঁকলেন না। আহত ডারলিং সপ্তম উইকেটে ইয়ালোপের সঙ্গে যোগ দিয়ে, ভারতীয় বোলারদের সাময়িক উত্তেজনাকে খর্ব করে পুনরায় খেলার গতিকে টেনে আনলেন অস্ট্রেলীয় অনুকূলে। দুর্ভাগ্য ইয়ালোপের, তিনি একটি সহজ সেনচুরির সুযোগ নষ্ট করলেন। কপিলের লাফানো বলে পুল করতে গিয়ে ভারসাম্য হারানো ইয়ালোপের হাতের ব্যাট উইকেট ভেঙে দেয়—এর ফলে ৮৯ রানে হিট উইকেট

হয়ে বিদায় নিলেন ইয়ালোপ। ইয়ালোপের বিদায়ের পর অস্ট্রেলীয় ইনিংসটি আর দীর্ঘতর হলো না—৩০৪ রানে সমাপ্তি ঘটলো অস্ট্রেলীয় ইনিংসটির। ডারলিং ৫৯ রানে বিদায় নিলেন ঘাউড়ির বলে—এই উইকেটের পতনের পরই অস্ট্রেলীয় ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতীয় ইনিংসটি আশাপ্রদ হলো না। সর্বাগ্রে কানপুরের সমর্থকদের নিরাশ করে মাত্র ১২ রানে বিদায় নিলেন সানি। এই ইনিংসে আবার একটি নিখুঁত ছবির মতো ইনিংস খেললেন বিশ্বনাথ। তাঁর অনবদ্য ব্যাটের সুরমূর্ছিত ঝঙ্কারে মোহিত হয়ে উঠেছিল কানপুর। কানপুরের ক্রিকেট উদ্যান বিশ্বনাথ-ক্রিকেটের নন্দনকানন। এই মাঠে প্রথম আবির্ভাবে বিশ্বনাথ এই অস্ট্রেলীয় দলের বিরুদ্ধেই ১৯৫৯ সালে করেছিলেন প্রথম আবির্ভাবে শতরান। বিগত মুরশুমে এই কানপুরের ঐতিহাসিক উদ্যানে ভিশ গড়েছিলেন ক্যারিবিয়ানের বিরুদ্ধে একটি অবর্ণনীয় সেনচুরি। সেই কারণে অনেকেরই প্রত্যাশা ছিল ভিশ হয়ত এই ইনিংসে বড় একটা রানের ইমারত গড়বেন। কিন্তু ক্রিকেট কারো অনুমান সাপেক্ষ নয়—ক্রিকেট ক্রিকেটই—স্বধর্মে চালিত হতে সে বাধ্য। কাজেই সকলের সমস্ত প্রত্যাশাকে নির্মূল করে ক্রিকেটের মন্ত্রসিদ্ধ সাধক আপন বৈরাগ্যের ভাবতন্ময়তায় বিদায় নিলেন ৫২ রানের একটি স্মরণীয় ইনিংস গড়ে। তৃতীয় উইকেটে চৌহান-ভিশের জুটি যোগ করল ১১৩ রান। তাঁর সেদিনের স্বতঃস্ফূর্ত রেশমমসৃণ ব্যাটিং-এর সাবলীলতাকে প্রত্যক্ষ করে একজন সাংবাদিক লিখলেন—"He is a great enough as a batsman to do what he likes." বিশেষ করে ভিশের অনবদ্য স্কোয়ার কাট, স্কোয়ার ড্রাইভ ছিল চণ্ডীদাসের পদাবলীর মতো যেমন সুমিষ্ট, তেমনি ভাবগম্ভীর। হৃদয় আবেগের সমস্ত ভাব উন্মাদনাকে থরে থরে সাজিয়ে ভিশ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সংবেদনশীল ক্রিকেটের বিন্যাসিত একটি নির্মল ইনিংস। একজন শিল্পী যে কত নিখুঁত ও সাবলীল হতে পারেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর এই মাধুর্যদীপ্ত ব্যাটিং লালিত্যে।

চমৎকার বোলিং করেছিলেন ডিমক। কানপুরের উইকেট থেকে যত রকম সাহায্য পাওয়া যায়, তার ষোলো আনা ফায়দা তুলে ডিমক ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন ভারতীয়দের মনে। চৌহানের দুর্ভাগ্য—এবারেও তিনি সেনচুরির দরজা টপকাতে পারলেন না। ৮৪ রানের মাথায় ডিমকের বলে কাট করতে গিয়ে ক্যাচ আউট হলেন ইয়ার্ডলির হাতে। তরুণ যশপাল এই ইনিংসেও শূন্য রানে কানপুরে চশমা পরতে বাধ্য হলেন। এই অবস্থার মধ্যে একমাত্র কিরমানি ছাড়া আর কেউই পারলেন না সাহসের পরিচয় দিতে। এই মরশুমে কিরমানির ক্রিকেট প্রমাণ করেছেন ভারতীয় নির্বাচন মণ্ডলীর নির্বুদ্ধিতা। তাঁর সক্রিয় ব্যাটের প্রহারে অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ হলো ৪৫ রান—সঙ্গে বাঁহাতি ঘাউড়ির আত্মনির্ভর সুদক্ষ ব্যাটিং। মোট ৩১১ রানে শেষ পর্যন্ত সমাপ্তি ঘটলো ভারতীয় দলের। এই ইনিংসে ডিমক সংগ্রহ করলেন ৬৭ রানে ৭টি উইকেট।

ক্রিকেট যে স্বচরিত্রে গৌরবান্বিত তার প্রমাণ মিললো শেষ দিনে। কানপুরের উইকেট গোপনে বিশ বছর আগের চেহারায় রূপান্তরিত হয়ে পঞ্চম দিনে বদলে দিলো ক্রিকেটের ভাগ্য। ২৫০ মিনিটে ২৭৯ রান তোলার ঝুঁকি নিয়ে অস্ট্রেলীয়ানরা জয়ের প্রত্যাশায় হাত না বাড়িয়ে ম্যাচ বাঁচানোর চেষ্টায় হলেন সক্রিয়। অসাধারণ বোলিং করলেন কপিলদেব ও ঘাউড়ি সহ নবাগত যাদব। মাত্র ১৩ রানে ইয়ার্ডলি লেগবিফোর হলেন কপিলের বলে। ৩২ রানে ফিরলেন বাঁহাতি বর্ডার। কপিলের নিচু বলে অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত ভরসাকে ভরাডুবি করে লেগবিফোর হলেন অধিনায়ক হিউজ। হিলডিচ ভালই খেলছিলেন কিন্তু একসময় তিনি দোশীর ঘূর্ণি বলে সুইপ করার চেষ্টা করলে বল তার প্যাডে লেগে উইকেটে লাগে। এরপরই শুরু হলো শোভাযাত্রা—রাইট ও হোয়াটমোর উইকেটে এসে শেষ মুহূর্তে কিছুটা বাঁচার চেষ্টা করলেও হালে পানি পেলেন না। প্রথমে রাইট ও পরে হোয়াটমোরকে বোল্ড করলেন যাদব। ৯৩ রানে ষষ্ঠ

উইকেট পতনের পর ভারতীয় দল স্বস্তি বোধ করলেন, ম্যাচ যে তাঁদের হাতের মুঠোয় একথা বুঝতে কারো বাকি ছিল না। তবু ক্রিকেট—শেষ বলের জন্য প্রতীক্ষার প্রয়োজন। জয়ের উন্মাদনায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল ভারতীয় সমর্থকেরা। চরম সেই মুহূর্তটি অবশেষে ধরা দিল। কপিলের অষ্টাদশ ওভারের দ্বিতীয় বলে লেগবিফোর হলেন হগ। এর ফলে গোটা একটা তাজা দল গুটিয়ে গেল মাত্র ১২৫ রানে। একটানা আটটি বন্ধ্যা ক্রিকেট পর্ব পার করে কানপুরে ভারত দেখতে পেল জয়ের মুখ। সানির অধিনায়ক জীবনে এটি হলো দ্বিতীয় জয়—এই জয় এলো ১৫৩ রানের ব্যবধানে। ভারত এগিয়ে গেল ১—০ ম্যাচে।

ভারত জিতলো—আর এই জেতার মূলে ভারতীয় বোলারদের সঙ্গে যাঁর নাম সর্বাগ্রে গীত হলো—তিনি হলেন ভারতীয় ক্রিকেট অর্জুন বিশ্বনাথ।

কানপুরের টেস্ট ম্যাচ পূরণের পর ভিশ গড়লেন ভারতীয় ক্রিকেটে একটি অনন্য নজির। তিনি হলেন প্রথম ভারতীয় ব্যাটসম্যান যিনি পৃথিবীর তিনটি বড় দেশের বিরুদ্ধে করলেন হাজার রান। এই রান যথাক্রমে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ২০টি টেস্টে ১২০৯ রান, ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ১৮টি টেস্টে ১৪৫৫ রান ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কানপুর পর্যন্ত ১২টি টেস্টে ১০৮১ রান।

দিল্লীতে আবার বিশ্বনাথ

কানপুর টেস্টে জয়লাভ করে ভারতীয় দল নতুন আশায় কোমর বেঁধে নেমেছিলেন রাজধানী ফিরোজ-শাহ-কোটলায়। কোটলার নতুন উইকেটে ঘাস থাকায় সকলেই মনে করেছিলেন ক্রিকেট হয়ত অনেক বেশী সতেজ ও প্রাণবন্ত হবে। তাছাড়া বিগত বৃষ্টির কল্যাণ

প্রসাদ কোটলার ক্রিকেটকে স্পর্শ করতে পারেনি, বরং সে তুলনায় আকাশ ছিল যথেষ্ট স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। এককথায় ক্রিকেটে ছিল কানপুরের পরিবেশ।

কোটলার নবনির্মিত ঘাস উইকেটে টসে জিতে ভারতীয় দলপতি নিলেন ব্যাটিং-এর সুযোগ। সতেজ উইকেটে ব্যাট হাতে সানি যেন গোড়াতেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন। ডিমক, হগ-এর মতো পেশ-ম্যানদের কোনরকম তোয়াক্কা না করে সানি তাঁর হাতের ব্যাটকে বিক্রম ভূমিকায় ঘা মেরে প্রাণ উন্মাদনায় মাতিয়ে তুলেছিলেন দিল্লীর মানুষকে। ক্রিকেটকে ধন্যবাদ—এই ইনিংসে তার বেপরোয়া ব্যাটিং দৌরাত্মে যে দুটি সহজ ক্যাচ উঠেছিল, তা উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে নিজের দস্তানায় ধরে রাখতে পারেননি উইকেটরক্ষক রাইট। এই দুটি সুযোগের বিনিময়ে সানি তাঁর সেনচুরি রেকর্ড লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে কসুর করলেন না। ইনিংসের প্রথম দিকে চৌহান ও বেঙ্কসরকার বিশেষ কার্যকরী না হওয়ায় ভারতীয় দল যে বিপাকের মুখে পড়েছিল তা কাটিয়ে উঠতে সময় নিলো না উইকেটের উভয় প্রান্তে দুই খুদে যুবা পুরুষের কল্যাণে। একপ্রান্তে বেপরোয়া সানি, অন্যপ্রান্তে দায়িত্ব-শীল ক্রিকেট দরদী যোগী শিল্পী ভিশ। সানি-ভিশের যুগল ক্রিকেট ভারতীয় দর্শকদের কাছে বিরল। আর সেই বিরল চিত্রের একটি অনুপম মাধুর্য সৌভাগ্যের কল্যাণে দৃশ্যায়িত হয়েছিল কোটলার রমণীয় উদ্যানে। সিংহ বিক্রমে সানি তাঁর পৌরুষ উদ্ভাসিত ব্যাটের রাজসিক দৌরাত্মে যেমন মাতোয়ারা করে রেখেছিলেন, তেমনি বিপরীত চিত্র-কল্পে একজন শিল্পী তাঁর শ্বাশত শিল্প মানসকে উদার মানসিকতায় মুক্ত হস্তে ফিরোজ শাহের উদ্যানে ছড়িয়ে মোহিত করে রেখেছিলেন। ফিরোজ-শাহ-কোটলা সেই মুহূর্তে যেন যৌবনের প্রেমোচ্ছ্বাসে বিগলিত। একজনের ব্যাটিং গরিমা, অন্যজনের শিল্পসুষমা—এ যেন ক্রিকেটের এক অভিনব দৃশ্য। এ দৃশ্য কি চোখে দেখার পর ভোলা যায়, নাকি ভোলার!

দিল্লীর মানুষ ভাগ্যবান, তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন রমণীয় ক্রিকেটের এক বরণীয় শিল্পচাতুর্য। এই দিন ভিশ যেন তাঁর ক্রিকেট প্রতিভার স্বধর্মকে সাবলীল বিন্যাসে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর দরদী ব্যাটের সুরমূর্ছিত দরবারি রাগের ধ্রুপদীয়ানা গোটা ক্রিকেটকে করে তুলেছিল অনুপ্রাণিত। সানির অন ড্রাইভের দাপট যেমন ধাঁধা লাগিয়েছে, তেমনি ভিশের শিল্পীজ ব্যাটের স্বতঃস্ফূর্ত মাধুর্যমণ্ডিত স্কোয়ার কাট ও স্কোয়ার ড্রাইভ-এর ছন্দময় কাব্যিক রোমান্টিকতা মুগ্ধ করেছে। কাকে ছেড়ে কাকে দেখি—সানি না ভিশ। উভয় প্রান্ত থেকে ঘনঘন বোলার বদল করেও অস্ট্রেলীয় দলপতি কিছুতেই পারলেন না এই দুই ভারতীয় যুগলকে দমিয়ে রাখতে। 'নো' বিধ্বস্ত হগ এই সময় দু-একটা বাউনসার প্রয়োগ করে সানির দৌরাত্ম্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করলে, সানি তাঁর অগ্নিগর্ভ ব্যাটের দাপটে মোক্ষম শিক্ষা দিয়ে লাল বলকে পত্রপাঠ ছুঁড়ে দিলেন সীমানার বাইরে। ভিশ—উদার, তিনি খেয়ালি শিল্পীর দরদী মনের আত্মজ মসৃণতায় মনোরম ভঙ্গিমা প্রয়োগে প্রকাশ করলেন একের পর এক অনুপম শিল্পশ্রী।

মার আর মার—রকমারি মারের মনোহারি ঐশ্বর্য যেন উপচে পড়েছিল দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলায়। প্রথম শতরান পূরণ করলেন সানি। এরপর ভিশ এগিয়ে গেলেন নিজের শতরান পূর্তির দিকে। অনবদ্য চোখ ঝলসানো স্ট্রোক। চোখে দেখার পরও যেন তৃষ্ণা মেটে না। ভিশের সৌন্দর্যদীপ্ত সুর ঝংকারিত ব্যাটের টংকারে গোটা ক্রিকেট হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত। ভিশ সেনচুরি করলেন। তাঁর এই ইনিংসটির মধ্যে গড়ে উঠেছিল ক্রিকেটের একটি রেকর্ড। ১৯৭৯ সালের মরশুমে ভিশ দ্বিতীয় ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসাবে পূরণ করলেন নিজস্ব হাজার রান। প্রথম দিনের ক্রিকেট এইসময় ছিল দেখার মতো। দিনের শেষ ওভারে নিজস্ব ১১৫ রানে আউট হলেন সানি। তৃতীয় উইকেটে এই দুই যুগলের প্রাণবন্ত প্রচেষ্টায় রান

উঠলো ১৫৯—ভারতীয় ক্রিকেটে এই দুই ব্যাটধারীর এটাই হলো সর্বোচ্চ রানের জুটি। এবং এই নিয়ে তৃতীয়বার ঘটলো ভারতীয় ক্রিকেটে অমাবস্যায় চাঁদের উদয়।

দ্বিতীয় দিনের ক্রিকেট ছিল আরো বেশী চিত্রাকর্ষক। এই দিন সকালে ভিশ রাজসিক গরিমায় ক্রিকেটের সমস্ত ঐশ্বর্যকে আন্তরিক উদারতায় উইকেটের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে ১৩১ রানের একটি অনুপম ভাস্কর্যের নজির সৃষ্টি করে বিদায় নিলেন। ক্রিকেটের কবি ভিশের বিদায়ের পর ক্রিকেট ঝিমিয়ে গিয়েছিল কিছু সময়ের জন্য। বিশেষ করে যশপাল বিগত টেস্টে চশমা পরায় স্নায়ু দুর্বল অসুস্থতায় আক্রান্ত হওয়ায় এই ইনিংসে তাঁর হাতের ব্যাট যেন শামুকের মতো গুটিয়ে ছিল। কিছুতেই তিনি বলকে প্রহারের জন্য হাতের ব্যাটকে প্রয়োগ করতে চাইছিলেন না। তাঁর এই অনীহাগ্রস্থ ব্যাটিং'-এর ফলে দর্শকেরা ঘন ঘন করতালির মধ্যে বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন। ক্রিকেটের চেহারা আবার বদল হলো কিরমানির আবির্ভাবে। উইকেটে এসে কিরমানি তাঁর হাতের ব্যাটকে চাবুকে রূপান্তর করে ঝিমিয়ে যাওয়া ক্রিকেটকে নতুন প্রাণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করলেন। মার আর মার—উইকেটের চারদিকে বল ছুটলো এলোমেলো। কিরমানির দৌরাত্ম্য যশপালকে অচিরেই প্রেরণা এনে দিল। খোলসের মধ্যে গুটিয়ে থাকা যশপাল তাঁর হাতের ব্যাটকে মুহূর্তে উন্মুক্ত কৃপা ভঙ্গিমায় ব্যবহার করে একের পর এক রকমারি চোস্ত মারে মাতিয়ে তুললেন দিল্লীর দর্শকদের। যে যশপাল কয়েক ঘন্টা আগেও দর্শকদের কাছে বিরক্তিকর হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন সেই তিনি মারমুখী ক্রিকেট কল্যাণে হয়ে দাঁড়ালেন চোখের মণি। পঞ্চাশ থেকে একশো রানে পৌঁছতে বেশী সময় নিলেন না যশপাল। ঘড়ির কাঁটাকে পিছনে ফেলে রানের গতিকে সাদা ঘোড়ায় ছোটালেন তরুণ ব্যাটধারী। কিরমানির পঞ্চাশ মিনিটে ৩৫ রানের গৌরবান্বিত ইনিংসটি নিসন্দেহে ছিল প্রাণবন্ত, সেই সঙ্গে তিনটি ছক্কা সহ

যশপালের শতরান। এক ইনিংসে তিন—তিনটি সেনচুরির কল্যাণে ৫০৭ রানে দল পঁছিলে ৭ উইকেটে দান ছেড়ে দিলেন সানি। হাতে তখন ভারতীয়দের সময় এক ঘন্টা সহ গোটা তিনটি দিন। বড় রান মূলধন করে একটা ম্যাচ জেতার পক্ষে এই সময় নিসন্দেহে যথেষ্ট। জয়ের প্রত্যাশায় সেই কারণে কোমর বেঁধে নামলেন ভারতীয় খেলোয়াড়েরা। উইকেটের চরিত্র নিয়ে বোদ্ধার দল আগেভাগে যে মন্তব্য করেছিলেন তার সিকি ভাগও কিন্তু কার্যকরী হয়নি। ঘাস উইকেটে প্রাণ থাকা সত্বেও গতির অভাব ছিল যথেষ্ট। তবু বড় রানের মোকাবিলায় স্নায়ু দুর্বল থাকায় প্রাণদানে অস্ট্রেলিয়ানরা অতিমাত্রায় সাবধান হতে গিয়ে নিজেদের বিপদ নিজেরাই স্বইচ্ছায় যেন ডেকে এনেছিলেন। দলের দামা দামী ব্যাটধারীরা কিছুটা অতি সাবধানী হওয়ার ফলে দ্রুত কয়েকটি উইকেটের পতন ঘটলো। এই অবস্থায় চমৎকার ব্যাট করেছিলেন হোয়াটমোর। পেস ও স্পিন বোলিংকে সমান দক্ষতায় খেলে হোয়াটমোর প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন, ভারতীয় বোলিং-এর ধার জনশ্রুতি অনুযায়ী উচ্চাঙ্গের নয়। ক্রিকেটের সাধারণ জ্ঞান ভরসা করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেলতে পারলে কোটলার উইকেট থেকে তাঁরাও রান আদায় করে নিতে পারতেন। এই ইনিংসে হোয়াটমোরের শতরানের সম্মান পাওয়া উচিত ছিল, অন্তত তাঁর ক্রিকেট দেখে একসময় সেই ধারণা জন্মেছিল সকলের। কিন্তু দুর্ভাগ্য হেয়াটমোরের। কপিলদেবের অফস্ট্যাম্পের বাইরে বেরিয়ে যাওলা বল তাঁর পদচুম্বন করা মাত্র, সাদা কোটধারী ভারতীয় ক্রিকেটের ধর্মাবতারের তর্জনীর নির্দেশে অকারণে তিনি মাঠ ত্যাগে বাধ্য হন। ক্রিকেটের ধর্মের নামে অধর্মের বহু ধরনের চক্ষুলজ্জাহীন দৃশ্য একাল যাবৎ আমাদের চোখে পড়েছে, তবে মনে হয় তাঁর মধ্যে এই নির্দেশটি সর্বাপেক্ষা বিসদৃশ। সহৃদয় মহামান্য আম্পায়ারের নির্দেশটি যে অস্ট্রেলীয় ব্যাটধারীকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, তা স্পষ্টতই অনুমান করা গিয়েছে বিদায়ী খেলোয়াড়ের

নারব মুখভঙ্গিমায়। হোয়াটমোরের এই বিতর্কিত আউটে আর কেউ খুশী না হলেও গাভাসকার খুশী হয়েছিলেন জয়ের প্রত্যাশায়। এবং সেই সঙ্গে এটাও পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে ফলোঅন এড়ানো অস্ট্রেলিয়ানদের পক্ষে কোনমতেই হয়ত সম্ভব হবে না। এই ব্যাপারে খেলোয়াড়দের তুলনায় আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন কতিপয় কিছু ভেতো বাঙালী সাংবাদিক। একজন তো কোন একটি বহু প্রচারিত বাংলা দৈনিক পত্রিকার পাতায় তৃতীয় দিনে এমন একটি মন্তব্য করে বসলেন, যার পরিষ্কার তর্জমায় দাঁড়ায় ভারত অলিখিত ভাবে দিল্লীর ম্যাচ জিতে গেছে।

হায়রে—বোদ্ধার দল, ক্রিকেট কি এতই সোজা চরিত্রের খেলা? বাঙালী চরিত্রের মতো যে ক্রিকেট চরিত্র এত সহজ সরল নয়, কিছুটা যে সাহেবিয়ানার মতো গোলমেলে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল চতুর্থ দিনের প্রথম ঘণ্টায়। ৯ উইকেটে ২৫৮ রানের পর তা না হলে শেষ ৭২ মিনিটে ৫২ রান যোগ দিলেন কি করে শেষ উইকেটে হিগস-এর মতো একজন নবীশকে সঙ্গে নিয়ে অনভিজ্ঞ রাইট? যে সব চুরুটচোষ্য সাংবাদিকেরা হিগসকে চন্দ্রশেখর মনে করে তৃতীয় দিনে মাঠে প্রবেশ করার পর পরের দিনের হেড লাইনের নকশা করেছিলেন, তাঁদের মুখে গালে আর একটু হলেই চুনকালি লেপে দিচ্ছিলেন ওই হিগস। শেষ উইকেটে ভারতের বিরুদ্ধে এক নয়া নজির সৃষ্টি করেও ফলোঅনের গতি আর মাত্র কয়েকটা রানের জন্য টপকে যেতে পারলেন না রাইট-হিগসের জুটি। শেষ পর্যন্ত আবার সেই প্রশ্নসূচক পদদংশনে আম্পায়ারজীর তর্জনীর শাসন ইঙ্গিতে দোশীর বলে দোষী সাব্যস্ত হয়ে ইনিংসে ছেদ টানতে বাধ্য হয়েছিল অস্ট্রেলীয় দল। ২৯৮ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘটায় অস্ট্রেলিয়াকে দ্বিতীয়বার ব্যাট করতে হলো ফলোঅনের সুবাদে। এবং পুরো দুটো দিন হাতে থাকায় ভারতের জয় সম্পর্কে অতি বড় নিরাশবাদীর মনেও কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু ক্রিকেট যে কারো অনুগত নয়-সে যে আপন চরিত্র বজায় রাখতে সক্রিয়, তার

প্রমাণ হলো এই ম্যাচে। ফিরোজ শাহ কোটলার সতেজ উইকেট চতুর্থ দিনের পর থেকে এত শক্ত ও মন্থর হয়ে পড়েছিল যে ওই উইকেটে একমাত্র ব্যাটধারী স্বইচ্ছায় ভুল না করলে উইকেটের পতন ঘটানো কোন বোলারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবু ভারতীয় বোলারদের ধন্যবাদ যে তাঁরা প্রথমেই ডারলিং-এর উইকেটটি তুলে নিয়ে ক্রিকেটকে একটু জমাবার চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিতীয় উইকেটে বাঁহাতি বর্ডার আসার পর ভারতীয় বোলারদের যাদুবিদ্যার নির্বিষ গুণপনা স্পষ্ট হয়ে যায়। উইকেটে চারদিকে হাত খুলে যথেচ্ছা পেটাতে থাকেন বর্ডার, ও হিলডিচ। হিলডিচের দুর্ভাগ্য যে তিনি নিজের ভুলে সেনচুরি পেলেন না। বর্ডার আউট হলেন অতি মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হওয়ার চেষ্টায়। ইয়ালোপ ও অধিনায়ক হিউজ চমৎকার খেলছিলেন। পঞ্চম দিনের সকালে কোটলার মন্থর শক্ত উইকেটে বাঁহাতি দোশী বুদ্ধিতে ইয়ালোপকে ঠকিয়ে আউট করার পর ক্রিকেট সহসা চনমনে হয়ে উঠেছিল। প্রথম ইনিংসে বিতর্কিত সিদ্ধান্তে আউট হওয়া হোয়াটমোর দ্বিতীয় দফায় মনে হয় পায়ে বল না লাগার ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। তাঁর এই অতি সাবধান হওয়ার চেষ্টায় দোশীর বলে পয়েন্ট অঞ্চলে যে সহজ ক্যাচটি উঠেছিল, তা বেঙ্কসরকার হাতে ছুঁয়েও ধরে রাখতে পারলেন না। এরপর আর একবার চৌহানের ছুঁড়ে দেওয়া বল শিবলাল যাদব ঠিকমতো ধরতে না পারায় হোয়াটমোর রান আউট হওয়ার হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যান—তার ফলেই অস্ট্রেলিয়া ভারতের জয়ের সমস্ত প্রত্যাশাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে নির্ভীক মানসিকতায় ধীরে ধীরে গড়ে তোলে পালটা ৪০০ রানের একটি ইনিংস—যা ভারতীয়দের বাড়া ভাতে ছাই ফেলে প্রমাণ করে দিয়েছিল—ক্রিকেট যে কত বড় অনিশ্চয়তার খেলা।

শেষ ঘণ্টার খেলায়, সত্যি বলতে কোন প্রাণ ছিল না। শিষ্টাচার পালন করার জন্যই ভারতীয় দলপতি দলবদল নিয়ে ক্রিকেট নামে মজা করছিলেন। এই সময় গাভাসকার তাঁর সমস্ত নিয়মিত বোলারদের

বিশ্রাম দিয়ে একমাত্র ব্যবহার করছিলেন দোশীকে। সঙ্গে অন্য প্রান্ত থেকে নিজেও হাত ঘুরিয়েছেন, সুযোগ দিয়েছেন বিশ্বনাথকেও। ৩৪ ওভার বোলিং করে দোশী মাত্র একটি উইকেট সংগ্রহ করেছেন ৬৯ রানের বিনিময়ে, যা তাঁর পক্ষে পঞ্চম টেষ্টে বাদ পড়ার একটা লক্ষণ বলে অনেক বিজ্ঞের দল মনে করেছিলেন। সেই সঙ্গে আসমুদ্র হিমাচল একটি খবরে অবাক হয়েছেন যে খুদে ওস্তাদ ভিশ ব্যাট ছেড়ে দিল্লীর রান সর্বস্ব উইকেটে হাত ঘুরিয়ে মাত্র তিন ওভারে দখল করেছেন গত ইনিংসের হিরো হিগস-এর উইকেটটি। শেষ পর্যন্ত দিল্লীর ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ সমর্থনে ভারতীয়দের নিরাশ করে ম্যাচের ফলাফল দাঁড় করালো অমীমাংসিত চেহারায়। এবার লক্ষ ইডেন—যে ইডেন ভিশের জীবনে সেরা খেলার এক তীর্থভূমি।

ইডেনে ক্রিকেট হয়েছে শেষ ছুদিন

অক্টোবরের শীতহীন সকালে ইডেনের ক্রিকেটে ছিল না কোন স্বস্তির ছোঁয়া। ফুরফুরে শীতের পরশ কলকাতার ক্রিকেটে স্পর্শ না করায়, ব্যতিক্রম পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে নবনির্মিত ঘাসহীন উইকেটে চলতি মরশুমের ইডেনকে অনেক অচেনা বলে মনে হচ্ছিল।

ন্যাড়া উইকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে মস্ত মস্ত পণ্ডিতের দল নানাবিধ মন্তব্য করায়, ইডেনের ক্রিকেট বড় বিভ্রান্তির মধ্যে শুরু হয়েছিল! চরিত্র না বোঝা উইকেটে কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে টসে জেতা অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক প্রথমেই নিলেন ব্যাটিং করার সুযোগ। দিনের প্রথম ওভারের চতুর্থ বলে কপিলের লাল বলে হিলডিচ উইকেটের পিছনে কিরমানির দস্তানাবন্দী হওয়ায়, ইডেন যে প্রত্যাশার চমকে ঝলসে উঠেছিল, তা শেষ পর্যন্ত ম্রিয়মান হলো ইয়ালোপ ও অধিনায়ক হিউজ-এর মন্থর ব্যাটিং-এর বিন্যাসিত কৌশলে। সারাটা দিন

ইডেনের উইকেটে মাথা ঠুকেও দুটির বেশী তিনটি উইকেট দখল করতে পারলেন না ভারতীয় বোলারেরা। কেবল নীরস অলস প্রহরে হাত পা ছড়িয়ে ইডেনের আশী হাজার দর্শক অন্তত অস্বস্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন ইয়ালোপের একটি নির্ভুল শতরানের ইনিংস। পাক্কা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় অস্ট্রেলীয় ব্যাটধারীরা ইডেনের মন্থর প্রাণহীন উইকেট চষে ঘরে তুললেন ২২৭ রানের নিস্তেজ ফসল। এই নিস্তেজ ব্যাটিং-এর পিছনে অবশ্য একটা মস্ত কারণ ছিলো, তা হলো অস্ট্রেলিয়া দলের বড় রান তোলার প্রতি অনীহা। হিউজ আশা করেছিলেন মস্ত রান তুলে ভারতীয় দলকে ইডেনের উইকেটে বেসাম'ল অবস্থার মধ্যে কোণঠাসা করে তুলবেন। প্রথম দিনের নিস্তেজ ক্রিকেটের খুব একটা পরিবর্তন এলো না দ্বিতীয় দিনের খেলায়। যদিও এই সকালে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক এবং ইয়ালোপ দুজনেই বেশ কিছু সুন্দর পচ্ছন্দসই স্ট্রোক করে ছিলেন, তবু রান ওঠার গতি খুব একটা সচল ছিল না। ইয়ালোপের মতো হিউজ-এর একটি সুন্দর সেনচুরি মনে হয় নিশ্চিত অপেক্ষা করেছিল ইডেনের দর্শক মনে। কিন্তু বেচারি হিউজ শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। কপিলের উইকেট সোজা একটা নিচু বলে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে কাট করার চেষ্টায় তাঁকে ৯২ রানে আউট হতে হলো। ইয়ালোপের ধৈর্যের প্রশংসা না করে উপায় নেই। কলকাতার প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে সারাটা দিন বেচারি ইয়ালোপের লাল চেহারা রোদের আঁচে আরো তেতে ওঠা সত্ত্বেও তিনি হাতের ব্যাট আলগা হতে দিচ্ছিলেন না। তাঁর অলস বিন্যাসিত ব্যাকরণ মানা ক্রিকেটের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি বুঝি অবশ্যই দুশো রানে গিয়ে পৌঁছবেন। ইডেনের ক্রিকেট ঝিমধরা অবস্থায় প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে যখন অস্ট্রেলিয়া দলকে বড় রানের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল, ঠিক তখনই ক্রিকেট তার খোলস ছাড়িয়ে আসল রূপটি আচমকা প্রকাশ করলো ইডেনের বুকে। যাদবের বলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাট করার চেষ্টায় দুশো রানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ইয়ালোপ আউট হলেন ১৬৭ রানে।

এরপর ইডেনের বুকে নাটকের চরম মুহূর্তের সূত্রপাত। যে ইডেন দেড়টা দিন মনমরা হয়ে রৌদ্রাঘাতে ক্লান্ত অবসন্নতায় ধুঁকছিল, সেই ইডেনের গ্যালারী চেনা উন্মাদনায় হঠাৎ হয়ে উঠলো রূপসী। বাঁহাতি দোশীর অনবদ্য ফ্লাইট স্পিন গুটিয়ে দিলে সতেজ অস্ট্রেলিয়া দলকে। পর পর তুটি বলে তুটি ব্যাটসম্যানকে তুলে নিয়ে দোশী ইডেনের প্রাণ ফিরিয়ে আনলেন। চা-পানের বিরতির অল্প সময়ের পরই গোটা অস্ট্রেলিয়া দল মুড়িয়ে গেল ৪৪২ রানে। ৬১৬ মিনিট ব্যাটিং করার সুবাদে অস্ট্রেলিয়া দলের সংগৃহীত ৪৪২ রান মোটেই যে সতেজতার পরিচয় নয়, মনে হয় একথা পাঠকদের নতুন করে বলার নয়। মাত্র খেলা শেষের ৩৩ মিনিট সময় বাকি থাকতে ভারতীয় দল ব্যাট করতে নামলেন। গাভাসকার বা চৌহান কারো খেলার মধ্যেই বিন্যস্ত ছিরিছাঁদ ছিল না। বিশেষ করে গাভাসকার এই ইনিংসে ছিলেন সব চেয়ে নিষ্প্রভ। তাঁর আউট হওয়ার ধরন দেখে মনে হয়নি যে তিনি একজন উচ্চাঙ্গের প্রতিভাধর ব্যাটধারী। বল ডিমকের হাত থেকে ছিটকে আসার আগেই অখেলোয়াড়োচিত ভঙ্গিমায় পা স্যাফেল করে যেভাবে খেলার চেষ্টায় আত্মাহুতি দিলেন তা ছিল যেমন দৃষ্টিকটু তেমনি বেমানান। সানির বিদায়ে অস্ট্রেলীয় ফিল্ডসম্যানেরা নব উদ্যমে চাপ সৃষ্টি করলেন ভারতীয় ব্যাটধারীদের ওপর। দ্বিতীয় দিনের শেষ বেলায় বেঙ্কসরকার বা চৌহান কেউই স্বমূর্তি প্রকাশে সাহস না পেয়ে হাতের ব্যাট গুটিয়ে কোন রকমে ২১টি রান সংগ্রহ করে ফিরে এলেন তাঁবুতে।

তৃতীয় দিনে—মেঘের কোলে প্রথম রোদ ঘটলো বিশ্বনাথের আবির্ভাবে। প্রথম দিকের ক্রিকেট ঘণ্টা খানেক সময় পার হয়েছিল গতানুগতিক নিষ্প্রভতায়। বড় রানের সামনে স্নায়ু তুর্বল ভারতীয় ব্যাটধারীরা সানির বিদায়ের শোক মনে হয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মাত্র ২৫টি রান সংগ্রহ করতে তাই চৌহান ও বেঙ্কসরকারের সময় লেগেছিল পাকা ১৮১টি মিনিট। ভারতীয় ব্যাটধারীদের এই গতিহীনতায়

ইডেনের দর্শক অন্ত্যত বিব্রত বোধ করছিলেন। বিশেষ করে চৌহানকে দেখে মনে হচ্ছিল, ভদ্রলোক যেন ব্যাটের ঘায়ে বল প্রহারকে নিষিদ্ধ বলে প্রচার করতে মাঠে নেমেছেন। প্রথম ঘণ্টায় সংগৃহীত ২৮টি রানের মধ্যে তাহাদের সংগ্রহ ছিল মাত্র ৫টি রাণ। মোট সাড়ে চার ঘণ্টা ব্যাট করার পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তিনি চৌহানের ৩৯ রাণের একটি নেতিমূলক ইনিংসের পরিসমাপ্তি টানলেন। এই সময় বেঙ্কসরকার ছিলেন সক্রিয়—তার হাতের ব্যাট থেকে মাঝে মাঝে দু-একটা সুন্দর মার বেরিয়ে এসেছিল। ক্রিকেট বদল হলো বিশ্বনাথের আবির্ভাবে। উইকেটে এসেই ভিশ শুরু করলেন আপন সক্রিয় প্রতিভায় ব্যাট চালনা। তাঁর কব্জির মোচড়ে দেবতার আশীর্বাদ নির্ভর চমৎকার স্কোয়ার কাট ইডেনের মরা শরীরে প্রাণের সঞ্চার করলো। ঝিমনো ইডেন ভিশের আনন্দসুন্দর মারের ঝলকানিতে মুহুর্তে হয়ে উঠলো উদ্ভাসিত। মন্থর উইকেট স্ট্রোকের পক্ষে অনুকূল না হলেও, ভিশের সচেষ্ট সাধন প্রক্রিয়ায় ক্রিকেটের রকমারি মারগুলি গোলার মতো ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল অনাবিল উন্মাদনায়। এই সময় বেঙ্কসরকার চমৎকার খেলছিলেন। বিশেষ করে তিনি হগকে একটি সুন্দর হুক শটের সাহায্যে বাউনসারের যথার্থ মূল্য দিয়ে বুঝিয়ে দেয়, এই মারটি তাঁর অজানা নয়। বেঙ্কসরকার সেদিন সেভাবে খেলছিলেন তাতে কোন কারণেই তাঁকে একটি সেনচুরির প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব হতো না। কিন্তু হতভাগ্য বেঙ্কসরকার, তাঁর দৈবকে এড়াবেন কি করে। তাই এমন একটা ইনিংসের মধ্যে হঠাৎ তিনি স্বেচ্ছায় ছেদ টানলেন হাতের ব্যাথার অজুহাতে। চা-পানের বিরতির পর বেঙ্কসরকারের পরিবর্তে যশপালকে সঙ্গে নিয়ে ভিশ উইকেট এসে দাঁড়ালেন অস্ট্রেলীয় আক্রমণ মোকাবিলায়। নতুন জুটি সঙ্গে থাকায় চা-পানের পর ভিশকে আগের তুলনায় স্বভাবত কারণেই একটু মন্থর হতে হলো। তবু তাঁর কয়েকটি চোখ ধাঁধানো মনোরম শর্ট ছিল সত্যিই অনুপম সৌন্দর্যের আকার। ভিশের স্ট্রোক প্রমান করেছিল

ইডেনের মন্থর উইকেটে জাত শিল্পীর আভিজাত্য। গ্লানস, কাট, স্কোয়ার ড্রাইভ প্রভৃতি দুরূহ শিল্পসিদ্ধ স্ট্রোকের অনাবিল স্বতস্ফূর্ত্ততায় প্রমাণ হয়েছিল জাত শিল্পীর সত্যিকার বিচার। দিনের শেষে ভারতীয় দল যখন প্যাভেলিয়ানে ফিরে এলেন তখন স্কোরবোর্ডে রাণ উঠেছে দুই উইকেটে ২২১। ভিশ ৪৩ ও যশপাল ১৩ রাণে অপরাজিত।

একটানা তিনটে দিন ক্রিকেটের শাম্বুক গতিকে প্রত্যক্ষ করে ইডেনের দর্শক ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় একটা ভাবনা চিন্তায় বসলেন না। খেলা যে ড্র'য়ের দিকে ঢলে পড়েছে একথা বুঝতে বাকি ছিল না কারো। তবু তার মধ্যে চতুর্থ দিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন বিশ্বনাথ। ইডেনের আশি হাজার মানুষ তাঁর কাছ থেকে রকমারি মারের জলুসে প্রার্থনা করেছিল একটি মনোরম শিল্পসমৃদ্ধ মণিহার। দিনের প্রথম বলটির সঙ্গে ইডেনের প্রত্যাশিত মেজাজকে কার্যকর করতে কুণ্ঠিত হলেন না ক্রিকেটের কবি। তাঁর সাধনসিদ্ধ ব্যাটের চমকে ইডেনের বুকে রচিত হয়েছিল ক্লাসিক কাব্য। কব্জির মোচড়ে ভিশের ব্যাটের টানে লাল বল হিল্লোলিত আবেগে ছুটে চলেছিল সীমানার বাইরে। তাঁর ব্যাটিং পদ্ধতির মধ্যে যে সহজাত প্রতিভার একটা মেজাজী আমেজ আছে—একথা ইডেনের মানুষ অকুণ্ঠ চিত্তে বহুবার স্বীকার করেছেন। ক্রিকেটের জাত স্ট্রোকগুলি জাত ক্রিকেটার বিশ্বনাথই পারেন অনাবিল মসৃণতায় সীমানার বাইরে পাঠাতে।

চতুর্থ দিনের নবম ওভারে হগ সাহেব হঠাৎ তাঁর লাল বলে আগুন ঝরালেন। পর পর দুবার তিনি যশপালকে দস্তুর মতো পরাস্ত করে তৃতীয়বারে গুটিয়ে দিলেন উইকেটের পিছনে দাঁড়ানো রাইটের হাতে। ২৫৬ রাণে আউট হলেন যশপাল। সবাই ভেবেছিলেন এই উইকেটের পতনের পর হয়ত বেঙ্কসরকার আসবেন তাঁর অসমাপ্ত দানকে শুরু করতে। কিন্তু সকলকে আশ্চর্য করে দেখা গেল ব্যাট হাতে নামছেন নরসীমারাও। আহা বেচারী নরসীমা—ইডেনে

এবার তাঁকে দলে কিসের যুক্তিতে নির্বাচন করা হয়েছিল, এর উত্তর মনে হয় স্বয়ং সে নিজেও দিতে পারবে না। গতবছর ইডেনের দর্শক তাঁর খেলা দেখে হতাশ হয়েছিলেন, এবছর বিস্ময়ে বিরক্ত প্রকাশ করেছেন। আর এই বিরক্ত প্রকাশের সামনে মনে হয় নরসিমাকে "বলির পাঠা" হিসাবে ব্যবহার করতে উঠে পড়ে কোমর বেধে সক্রিয় ভূমিকায় মদত জুগিয়েছেন স্বয়ং ভারতীয় দলপতি। নরসীমাকে বোলার হিসাবে হাত ঘোরাবার সুযোগ গাভাসকার বড় একটা দেন-নি। আর ব্যাটিং—বেচারা যখন কোনরকমে নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য দেয়ালে পীঠ রেখে লড়ছিলেন, ঠিক তখনই বিশ্বনাথের একটা বাজে দৃষ্টিকটু বলে অহেতুক রাণের চেষ্টায় রাণআউট হয়ে ফিরে যেতে হলো নরসীমাকে। ২৯০ রানে নরসীমা বিদায়ের পর ইডেন কিছুটা চনমনে হয়ে উঠেছিল বেঙ্কসরকারকে মাঠে নামতে দেখে। ভিশ তখন ৮৩, বেঙ্কসরকার উইকেটে এলেন তার তৃতীয় দিনের ৮৯ রাণকে মূলধন করে। উভয় ব্যাটসম্যান সেনচুরির দোরগোড়ায়। ইডেন প্রাণ উন্মাদনায় তখন চঞ্চল মুখর। কে আগে শতরাণ পূরণ করবে, তার জন্য শুরু হলো ক্রিকেট গ্যালারীতে শেয়ার মার্কেটের চেহারা। হায়রে—স্কোর বোর্ডের দিকে দর্শকদের দৃষ্টি থাকলেও বেঙ্কসরকার বা ভিশের যে সেদিকে দৃষ্টি ছিল না, তা বোঝা গেল অচিরেই। উইকেটে এসে বেঙ্কসরকার ইডেনের মেজাজকে যে সপ্তরাগে তরঙ্গিত করেছিলেন, তা এক নিমেষে নিরুত্তাপে পর্যবসিত হলো তার বেআক্কালের মতো ব্যাট চালনায়। ইয়ার্ডলি পাক খাওয়া বলে জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাট উঁচু করে একটা তোপ্পা ক্যাচ দিয়ে বেঙ্কসরকার যেন মনে হলো প্র্যাকটিস মেজাজে পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন হিউজের তৎপরতা। তা না হলে সেনচুরি যাঁর হস্তগত, সেই অবস্থায় কেউ এমনভাবে ব্যাট চালনা করেন—না করেছেন কখনও? বেঙ্কসরকারকেই বা একা দোষ দিই কি করে—যে ভিশ ইডেনের আরাধ্য দেবতা হিসাবে কলকাতার দর্শকদের হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত, সেই তিনি চমৎকার বাউণ্ডারীতে

নব্বুই রানের দোরগোড়ায় পৌঁছে হঠাৎ ক্রিকেটের সমস্ত জৌলুস বিসর্জন দিলেন কি করে। চতুর্থ দিন ইডেনের প্রতিটি দর্শক একরকম প্রায় নিশ্চিত ছিলেন বিশ্বনাথের সেনচুরির জন্য। তাঁর রাজসিক ব্যাটের চন্দনচর্চিত ধ্রুপদীয়ানার রাগ-রাগিনী যে মূর্ছনায় ইডেনকে এক স্বপ্নসিদ্ধ আমেজে তরতাজা করে তুলেছিল, তা থেকে ইডেনের দর্শক যে কখনও স্বপ্নভ্রস্ট হতে পারে এমন আশা করা যায়নি। আশ্চর্য একেই বলে ক্রিকেট—যা ভাবা যায় না, সময় সময় তাই সে ভাবায়। পঁচানব্বুই রানের মাথায় নেহাত হগ সাহেবের কপাল মন্দ না হলে বিশ্বনাথকে তিনি নিজের ঝুলিতে কুড়িয়ে নিতেন। ইডেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল হিলডিচের ক্যাচ ফসকানোর বহর দেখে। কিন্তু পরের ওভারে বিপরীত প্রান্তে প্রাণে বাঁচা ভিশ একটা রান কুড়িয়ে শত রাণের জন্য এমন অস্থির হয়ে উঠলেন যে, নিজের আত্ম-প্রতিভার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ভাবে উইকেটের বহু বাইরে বেরিয়ে যাওয়া বলকে তাড়া করে রানের প্রত্যাশায় জলাঞ্জলি দিলেন একটি অনন্য সুন্দর প্রত্যাশিত সেনচুরিকে। গোটা ইডেন ভিশের এই আকস্মিক পতনে হতবাক। অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারেরাও বুঝতে পারেননি, এমন একটি মূল্যবান উইকেট তাঁরা এত সহজে হাতের মুঠোয় পাবেন। অবাক হয়ে শুধু একটা কথাই ইডেন সেদিন ভাবছিল, যে ক্ষুদে মানুষটি ওস্তাদ ব্যাটের চমকে ক্রিকেটের দুর্লভ দৃষ্টিনন্দন মারগুলিকে দুর্দান্ত আকারে প্রকাশ করছিলেন, সেই তিনি কি ইয়ার্ডলির বলে অমন একটা দৃষ্টিকটু ব্যাট চালনা করেছিলেন, না কি অন্য কেউ—সে কি অন্য কোন বিশ্বনাথ! বিশ্বনাথ ভারতীয় ক্রিকেটে একাল পর্যন্ত যতগুলি ইনিংসে ব্যাট করেছেন, তার মধ্যে ইডেনের এই ইনিংস নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ হতে পারতো, যদি তিনি শেষ পর্যন্ত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়ে শত রানের প্রত্যাশায় অমন বিচলিত না হতেন। আশ্চর্য—এই কি ক্রিকেট! সুন্দর একটা ইনিংসের এমন নিদারুণ পতন। আপসোসের শেষ ছিল না। ইডেনের হাজার হাজার দর্শক

সেদিন হয়ত বা আমার মতো ভেবেছিলেন একটা কথাই—কি প্রয়োজন ছিল ভিশের এই অনন্য সুন্দর ইনিংসটি ইডেনের মানুষকে দেখানোর। তিনিও তো অনায়াসে পারতেন সানির মতো প্রথমেই হাত গুটিয়ে নিতে! যদি ভিশ এই ইডেনে প্রথম লগ্নে এসেই বিদায় নিতেন, তাহলে এই শোক এত বেশী করে ব্যথার নূপুর হয়ে মুর্ছিত হতো না আমাদের শোকতপ্ত বুকে। আসলে তিনি যে আমাদের চোখে তাঁর হাতের ব্যাটের যাদুস্পর্শে রচনা করেছিলেন এক মোহিনী স্বপ্ন—যে স্বপ্নভঙ্গের জন্য ইডেনের লক্ষ প্রাণে আপসোসের শেষ নেই। ভিশের বিদায়ের কিছু পরেই ভারতীয় ইনিংস কপিলদেবের শোক ভোলানো ক্রিকেট পর্বের অবসান ঘটতেই গুটিয়ে গেল ৩৪৭ রানে। ৯৫ রানে এগিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়া দল ব্যাট হাতে যখন দ্বিতীয়বার মাঠে নামলেন তখন মোটামুটি ভাবে ক্রিকেট সম্পর্কে বড় ধরনের কোন ধারণা ইডেনের দর্শকদের মনে ছিল না। সবাই ধরে নিয়েছিল খেলার গতি গতানুগতিক প্রবাহে ড্র'এর দিকে গড়াবে। কিন্তু চতুর্থ দিনের ইডেনে চমক ছিল যথেষ্ট। ক্ষনে ক্ষনে বদল হয়েছে ক্রিকেটের চেহারা। ২১ রানে কপিল ফিরিয়ে দিলেন গত ইনিংসের বোঝা ইয়ালোপ সাহেবকে। এরপর স্পিনের ভেল্কি দেখালেন দোশী। বর্ডার, হোয়াটমোর, ডারলিং এর মতো ব্যাটধারীরা একে একে ফিরে এলেন প্যাভেলিয়ানে। মাত্র ৮১ রাণে চতুর্থ দিনের উইকেটে দোশীর স্পিন বোলিং-এর সামনে হিউজ-এর কঠিন আত্মরক্ষামূলক ক্রিকেটের পরিচয় পাওয়ায় ইডেন জমে উঠলো শেষ দিনের খেলায়। অনেক আশা অনেক কল্পনা নিয়ে পঞ্চম দিনের ইডেন উপছে পড়লো এক নয়া মেজাজে। প্রথম ঘন্টার ক্রিকেট ছিল আকর্ষণীয়—সকলেই ভেবে ছিলেন শেষ দিনের বল হয়ত লাট্টুর পাক খেয়ে হিউজ-এর দলকে এক ঘন্টা কি দেড় ঘন্টার মধ্যে গুটিয়ে দেবে। কিন্তু পঞ্চম দিনের ক্রিকেট শুরুর মুহূর্ত থেকে স্বয়ং হিউজ সাহেব দলের দায়িত্ব কাধে নিয়ে সমস্ত কল্পনাকে তছনছ করে ব্যাট চালাতে লাগলেন উইকেটের চারপাশে।

প্রথম ঘণ্টা গড়িয়ে দ্বিতীয় ঘণ্টায় অনায়াসে পৌঁছে যেতে কিছুমাত্র কষ্ট হলো না হিউজ-এর। উইকেটের চারদিকে তিনি সবিক্রমে বেশ কিছু দর্শনীয় শট করলেন দোশীর বলে। বাউণ্ডারী ওভারবাউণ্ডারী মেরে হিউজ পৌনে তু ঘণ্টা ব্যাট করে সহসা দান সমাপ্তি ঘোষণা করে ইডেনকে আবার করে তুললেন উদ্দীপ্ত। ২৪৬ রানের ব্যবধানে হিউজ যখন ভারতকে ব্যাট ছেড়ে দিলেন তখন ক্রিকেট শেষ হতে বাকি পাক্কা ১৮৭ মিনিট সহ ২০টি বাধ্যতামূলক ওভার। ক্রিকেটের পক্ষে রানের হিসাবে সময়টা নেহাত কম নয়। সতেজ ব্যাটিং-এ এই রান সংগ্রহ করা খুব একটা আহামরি ব্যাপার নয়—তাই হিউজ-এর এই চ্যালেঞ্জ ছিল সত্যিই তুঃসাহসিক। কিন্তু আশ্চর্য—দর্শকেরা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অধীর হলেও ভারতীয় দলকর্তা কিন্তু খুব একটা আগ্রহী হলেন না। চৌহানকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যথারীতি শুরু করেছিলেন নেতিমূলক ক্রিকেট। চ্যালেঞ্জের মেজাজ যে নষ্ট হয়েছিল তা নয়—সেই সঙ্গে মন্থর ক্রিকেটের সুবাদে ভারতীয় তাঁবুতে সহসা এসেছিল আত্মরক্ষার জন্য হুঁশিয়ারী। হিউজ-এর বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনা ও দলীয় ঐক্যতার সুবাদে ভারতকে খোয়াতে হলো তিন-তিনটি মূল্যবান উইকেট। হিলডিচের দর্শনীয় ক্যাচে গাভাসকার, রাইটের দৃষ্টিনন্দন অনবদ্য ক্যাচিং-এ বেঙ্কসরকার ফিরে যাওয়ার শোক ভুলতে না ভুলতেই, ডিমক-এর একটি নিচু বল অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিরিয়ে দিল ক্রিকেটের নন্দকিশোর বিশ্বনাথকে। বেণু বনে শ্যামের বাঁশি না বাজার আগেই বিচ্ছেদ বেদনায় অধীর হয়ে উঠলো ইডেন। হিউজ তখন জয় প্রত্যাশায় লিপ্ত। এই অবস্থায় চতুর্থ উইকেটে ক্রিকেট মেজাজকে বদলে দিলেন চৌহান ও যশপাল জুটি। যে চৌহান প্রথম ইনিংসে রান সংগ্রহের অনীহায় ইডেনের বুকে নিন্দাবাদ কুড়িয়েছিলেন, সেই ইডেন এবার তাঁকে বাহবা দিল কঠিন অবস্থার মধ্যে বুক চিতিয়ে রান সংগ্রহের মেজাজি চেহারা প্রত্যক্ষ করে। তরুণ যশপাল এইদিন কার আশীর্বাদে ধন্য ছিলেন জানা নেই—তবে তাঁর ব্যাটিং-এর প্রাণবন্ত চেহারা দেখে

মনে হয়েছিল ক্রিকেটের দেবতা যেন তাঁকে আজ সমস্ত ঐশ্বর্যবাণে সুসজ্জিত করেছেন। উইকেটের চারদিকে বল ছুটিয়েছেন চড়া মেজাজে। বাউণ্ডারীর পর বাউণ্ডারী মেরে তিনি মুহুর্মুহু কুড়িয়েছেন ইডেনের অভিনন্দন। লড়িয়ে ছুই ব্যাটধারী ক্রিকেটের চেহারা এমন ভাবে বদলে দিলেন যে খানিক আগের আত্মরক্ষার কথা ভুলে গিয়ে দর্শকেরা আক্রমণাত্মক ক্রিকেটের জন্য বাহবা দিতে লাগলেন চৌহান ও যশপালকে। ভারতীয় ক্রিকেটের দুর্ভাগ্য এবং ইডেনের কপাল নেহাতই মন্দ—তা না হলে এই জুটি যদি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারতো তাহলে ক্রিকেট যে কোন্ পর্যায়ে উঠতো একথা হলপ করে বলা শক্ত হয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু চৌহানের দ্বিধাগ্রস্ত বিদায় এবং নরসীমার রক্ষণাত্মক ক্রিকেট শেষ পর্যন্ত সংগ্রামী যশপালের অভিষ্ট সিদ্ধ হতে দিলো না। হিউজ উইকেটের চারদিকে খেলোয়াড় ছড়িয়ে যশপালকে বাধ্যতামূলক ওভারে বাউণ্ডারীর পরিবর্তে টুকরো রান নিতে বাধ্য করেছিলেন। তরুণ যশপাল শেষ লগ্নের ইডেনে একাই একশো। তাঁর প্রাণবন্ত ক্রিকেট দর্শকচিত্তে যেমন আনন্দ দিয়েছিল, তেমনি শেষ দিনের ইডেনকে করে তুলেছিল প্রাণবন্ত। তাঁর মেজাজি ক্রিকেটের আস্ফালন শেষ পর্যন্ত নিস্ফল হলেও—তাঁর মারমুখী প্রবণতাকে অস্বীকার করা আমাদের উচিত হবে না। সত্যি বলতে চলতি মরশুমে যশপালের ভূমিকা বহুকাল মনে রাখবে কলকাতার মানুষ। তাঁর ৮৫ রানে অপরাজিত ইনিংসটির মূল্য যে কোন মূল্যবান বড় রানের চেয়ে কম নয়। তাঁর রণচাতুর্যের প্রহেলিকায় ভারতীয় ক্রিকেটের তাবৎ রথী-মহারথীরা কেউই এই দিন মানানসই হয়ে উঠতে পারেননি। যদি একজন কেউ যশপালের মতো হিউজের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় হাতের ব্যাটকে শক্ত হাতে ধরতে পারতেন, আবার বলি—ইডেন হয়ত অন্য চেহারা নিতো! তা শেষ পর্যন্ত বাধ্যমূলক ওভারের তিন ওভার বাকি থাকতে ইডেনে ক্রিকেটের যবনিকা

পড়লো ভারতীয় দলের ২০০ রানের মাথায়—জয় তখন আর মাত্র ৪৭ রাণের দূরত্বে।

গাভাসকারের চ্যালেঞ্জ বিমুখ মনোভাবে ইডেনের ক্রিকেটে প্রাণে উন্মাদনার কোন প্রত্যক্ষ কার্যকারী ফলাফল এনে না দিলেও, ভারত কানপুরের সূত্র ধরেই এগিয়ে চললো ১—০ ম্যাচে। পরিশেষে বলি এবার ইডেনে ভিশের নয়নাভিরাম স্ট্রোকের রোশনাই এবং যশপালের শেষ দিনের বীরত্বটুকু ছাড়া—ক্রিকেট বলতে যা হয়েছে তা যেমন বিরক্তিকর, তেমনি অসহনীয়। ইডেনের নটেগাছ মুড়িয়ে এবার আমাদের অনুপ্রবেশ তীর্থভূমি বোম্বাই শহরে।

ভারত রাবার জিতলো

কলকাতার বিরক্তিকর টেস্ট ম্যাচের পালা সাঙ্গ হওয়ার পর এবার শেষ পর্যায়ের খেলাটি বসলো বোম্বাই শহরে। 'ন্যাড়া' যে বার বার বেলতলায় যায় না, তার প্রমাণ মিললো বোম্বাই-এর উইকেট চরিত্রে। খেলা শুরুতে বোম্বাই-এর নবনির্মিত উইকেট দেখে মুষড়ে পড়েছিলেন ক্রিকেটের অতবড় পাকা কলমবাজের দল। সাহস করে তাঁরা মুখ খুলতে ভরসা পাননি, বোকা প্রতিপন্ন হওয়ার আশায়। ইডেনে বড় মুখ করে অনেক কথা বলে পরিণামে গালে চড় খেয়েছিলেন। কাজেই অভিজ্ঞতা সামনে রেখে আর বোকা বনতে তাঁরা নারাজ। তবু দু-চারজন মস্ত বিজ্ঞের দল স্বভাবদোষে কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলেছিলেন, "উইকেট হয়ত শেষ দুদিনে কিছুটা ভাঙবে।"

গাভাসকর বোম্বাই-এর উইকেটে টসে জেতায় ভারতবর্ষ যে অনুকূল পরিবেশের সুযোগ পেয়েছিল, তাকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগাতে দিলেন না অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক কিম হিউজ। বুদ্ধিদীপ্ত আক্রমণে তিনি গাভাসকর ও চৌহানকে রান সংগ্রহে এমন কোণঠাসা করে

রেখেছিলেন যে বোম্বাই-এর প্রথম দিনের ক্রিকেট ইডেন অপেক্ষাও বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল। একেকটা রান সংগ্রহের জন্য ভারতের তুই ব্যাটধারীকে লড়াই করতে হয়েছিল দস্তুরমতো। এই ইনিংসে গাভাসকার একবারে ব্যবসায়ী বৃত্তিতে কর গুনে রান সংগ্রহে ব্যাট চালিয়েছিলেন। তাঁর কৌশলীরীতি দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল সিরিজের শেষ খেলায় কোনরকমে একটা সেনচুরি সংগ্রহ করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। সানিকে ধন্যবাদ—তিনি সারাটা দিন বিরক্তিকর নির্ভুল নির্জীব ব্যাটিং করে আপন সংগ্রহে বাইশটি সেনচুরিতে নিজেকে বিশ্ব-ক্রিকেটের একজন শ্রেষ্ঠ রান সেনচুরি সংগ্রহকারী ধনী হিসাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। এখন তাঁর সামনে মাত্র তুজন 'স্যার' চিহ্নিত পুঁজিপতি—এঁদের অতিক্রম করতে পারলেই তাঁর সাধ আহ্লাদ তৃপ্ত। কাজেই নেতিমূলক ক্রিকেটের জন্য এই কারণে সানিকে কোন ক্রীড়া সমালোচকই কটু বাক্যে দোষী সাবস্ত করেননি। কিন্তু চৌহান, তাঁর মন্থরতার কারণ কিসের জন্য? সেনচুরি নামক তুর্বল বস্তুটি যদি চৌহান জয় করতে পারতেন তাহলে মনে হয় ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা খুশী হতেন চৌহানের চাইতে বেশী। আহা বেচারি—এই নিয়ে ষষ্ঠবার সেনচুরির দোরগোড়া থেকে অনধিকার প্রবেশের অপরাধে যেন অর্ধচন্দ্র নিয়ে পরম তুঃখে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন প্যাভেলিয়ানে। তাঁর খেলার রীতিনীতি দেখে মনে হয়েছে সেনচুরি নামক বস্তুটি কোন কালেই তাঁর হয়ত জয় করা সম্ভব হবে না। আর যদি হয় তো—সেই হওয়াটা কবে হবে এটাই আধা প্রৌঢ় চৌহানের কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য। দিলীপ বেঙ্কসরকার-এর ক্রিকেট প্রথম দিনের সর্বাপেক্ষা বিসদৃশ ঘটনা। ভদ্রলোক ৭৫ মিনিট উইকেটে ব্যাট হাতে নিয়ে যে কি করতে চাইলেন, কিছুই বোঝা গেল না। অহেতুক সতর্কতা ও নেতিমূলক ব্যাটিং-এর ছিরি দেখে মনে হচ্ছিল, বেচারা দিলীপবাবুর ষষ্ঠ টেস্টের ইনিংস শুরু করার সময় স্মৃতিমণি-কোটায় যেন তাঁর পঞ্চম টেস্টের তুর্বিষহ চিত্রটি জ্বলজ্বল করছিল। যে

সতর্কতা তিনি বোম্বাইতে অবলম্বন করে অহেতুক ধৈর্যবান হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন, সেই চেষ্টার একাংশ যদি তিনি ইডেনে প্রয়োগ করতেন তাহলে তাকে একটি দুর্লভ সেনচুরির সুযোগ অকারণে বোকার মতো হারাতে হতো না। গোটা দিনে ভারতীয় ব্যাটধারীরা মাটি কামড়ে তিনটি সতেজ উইকেট খুইয়ে সংগ্রহ করলেন মাত্র ২৩১টি রান। কেবল শেষ বেলায় বিশ্বনাথের দশ মিনিটের আবির্ভাবে দুটি চিত্রাকর্ষক সতেজ স্কোয়ার ড্রাইভ' এর ফলে বোঝা গেল বোম্বাই-এর উইকেটে ক্রিকেট নামক বস্তুটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারাদিনে ভিশের এই ষ্ট্রোক দুটি ছিল কাব্যিক রস বিন্যাসে সর্বশ্রেষ্ঠ! প্রথম দিনের খেলার বর্ণনা প্রসঙ্গে ডি. গি. রত্নাগর লিখলেন : "বিশ্বনাথ —তিনি আরো বড় স্কোর গড়তে চলেছেন, আজ মাত্র ৬মিনিট উইকেটে থাকার ফাঁকেই তিনি বর্ডারের একটি বলকে যেভাবে স্কোয়ার ড্রাইভ করছেন, তা ছয় ঘন্টা উইকেটে থাকার পরও ঐ ধরণের একটি মার মারতে যে কোন ব্যাটসম্যান ইতস্তত করবেন। এবং এই মারটিকে যে আজকের দিনের সেরা মার বলে চিহ্নিত করতে এতটুকু কাউকে ভাবতে হবে না!"

ডি.গি.-র মন্তব্য সঠিক হলেও, ক্রিকেট একথায় মনে হয় মনে মনে হেসেছিল। বড় রান গড়ার সমস্ত প্রত্যাশা জলাঞ্জলি দিয়ে দ্বিতীয় দিনে বোম্বাই-এর উইকেট ভোজ বাজির মতো উল্টে দিল সমস্ত চিন্তা ভাবনা। প্রথম ফিরলেন বিশ্বনাথ দশরানে, তারপর একে একে একে যশপাল ও মহিন্দার।

বেচারা মহীন্দর—এত বিদ্রূপ সত্বেও বাম্পার প্রলভনে সংযত হতে শিখলেন না। হগ সাহেব তাকে নেহাতই শিশু সুলভ শক্তি প্রয়োগে বাম্পারে প্রলুব্ধ করে উইকেটের ওপর আছড়ে ফেলে জন-সমক্ষে পুণরায় প্রমাণ করলেন তার অনভিজ্ঞতা। ক্রিকেটের চেহারা একটা সময় আতঙ্কিত অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। ধন্যবাদ কিরমানি ও কারসন ঘাউড়িকে। পতনোন্মুখ অবস্থায় কিরির অনবদ্য ব্যাটিং ভারতীয়

কর্মকর্তাদের কাছে এক শিক্ষণীয় বস্তু। এই ইনিংসে কিরি তার বিন্যাস মণ্ডিত ক্রিকেটে প্রমাণ করলেন ভারতীয় ক্রিকেট কর্তাদের নির্বুদ্ধিতা। ইংল্যাণ্ড সফরে বাতিল হওয়া কিরমানি আত্ম-অভিমনে এই সফরে পুঞ্জিভূত আক্রোশে প্রমাণ করলেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। ঘূর্নিমাণ যে উইকেটে বিশ্বনাথ, যশপাল ও কপিলদেবের মতো ব্যাটধারী পীঠ সোজা রেখে ব্যাট করতে পারলেন না, সেই উইকেটে এই জুটি বেপরোয়া মার মেরে বিধ্বস্ত করে তুললেন কিম হিউজকে। এগারোটি চার সহ তিনটি ছক্কায় ঘাউড়ি বহুদিন বাদে প্রকাশ করলেন তার মার মুখী সতেজ চেহারাটি। কিরমানির অন ড্রাইভ, স্কোয়ার ড্রাইভ, কভার ড্রাইভ পাকাপোক্ত ব্যাটধারি মতো ছিল যেমন বিন্যস্ত তেমনি নির্ভুল। মোট ১৫৪ মিনিটে ৯৯টি বলের বিনিময় ঘাউড়ি করলেন তার জীবনের সর্বোচ্য রান। মনে হয় নিজস্ব ৮৬ রানের মাথায় ঘাউড়ি লক্ষ্য করেননি স্কোর বুকে তার নিজস্ব রান অঙ্কটিকে। হয়ত সেই কারণেই তিনি অমন একটা লাফানো বলে সপাটে ব্যাট ঘোরানোর চেষ্টা করেছিলেন। ঘাউড়ি শতরান বঞ্চিত হলেও ভারতীয় দলকে বড় রান গড়ার অনুকূল পরিস্থিতিতে নিয়ে এসেছিলেন। কিরমানি শেষ দিকে সংযমী ব্যবহারের সতর্কতায় অতিক্রম করলেন তার নিজস্ব প্রথম শতরানের দুর্লভ গণ্ডি। কিরমানির সেনচুরি পূরণের খানিক বাদেই ভারতীয় দল দান ছেড়ে দিল ৪৫৮ রানে। দ্বিতীয় দিনের খেলা যখন শেষ হলো তখন স্কোর বোর্ডে অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহে ছিল বিনা উইকেটে ১৫ রান।

ক্রিকেটের সত্যিকার চরিত্র বদল হলো তৃতীয় দিনে। আকস্মিক-ভাবে বোম্বাই এর উইকেটে বল পড়ে ঘুরতে লাগলো লাট্টুর মতো। এই ইনিংসে চমকপ্রদ বোলিং করলেন নবাগত দুই ভারতীয় স্পিনার। বিশেষ করে দোশী'র বাঁ হাতি স্পিন হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত মারাত্মক। বর্ডার ও হিউজ ওই অবস্থায় ভালই ব্যাট করছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যজনক ভাবে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তাসের ঘরের মতো ঝুরঝুর

করে ভেঙে পড়লো অস্ট্রেলিয়ার গোটা ইনিংস। একমাত্র ইয়ালোপ কিছুটা দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাতেও কোন কাজ হল না। মাত্র ১৬০ রানে গুটিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস। দোশী ৪৩ রানে পেলেন ৫টি ও যাদব ৪০ রানে চারটি উইকেট।

বোম্বাই বাতাস জয়ের উন্মাদনায় অচিরেই হয়ে উঠলো উত্তপ্ত। শুরু মুখেই এবার প্রথম দুটি প্রারম্ভিক ব্যাটধারীকে তুলে নিলেন কপিলদেব ও ঘাউড়ি। মাত্র ১৭ রানে ফিরে গেলেন হিলডিচ ও ধৈর্যবান পথের কাঁটা ইয়ালোপ। এই অবস্থায় তৃতীয় উইকেটে বর্ডার ও হিউজ এসে প্রাণশক্তিকে চেষ্টা করলেন ভারতীয় আক্রমণের মোকাবিলা করতে। ইডেনের বিন্যস্ত হিউজকে আরো পরিপূর্ণ চেহারায় দেখা গেল বোম্বাই-এর ঘূর্ণি উইকেটে। চমৎকার ব্যাটিং করলেন তিনি। তার ক্রিকেটের মধ্যে যেমন ছিল অস্ট্রেলিয়ত্বের নিপুণ মুনশীয়ানা, তেমনি ছিল ব্যক্তিগত রীতি কৌশল্যের পরিপাট্য। দলের অবস্থা অনুযায়ী একজন দলনায়ককে যে কিভাবে খেলতে হয় এই মরশুমে হিউজ তা বহুবার আমাদের দেখিয়েছেন। বর্ডারকেও এই ইনিংসে অনেকটা স্বভাবসিদ্ধ বিন্যস্ত চেহারায় দেখা গেল। মধ্যাহ্ন ভোজন পর্যন্ত এই দুই ব্যাটধারী যেভাবে রাজসিক কায়দায় ব্যাট করছিলেন তাতে অনেকেই আশা করেছিলেন ভারতকে জয়লাভের জন্য শেষ দিনে হয়ত ব্যাট হাতে নামতে হতে পারে। কিন্তু আগেই বলেছি ক্রিকেটের সচেতন চরিত্রের রোমাঞ্চকর অভিব্যক্তি মনুষ্য ধারণার বহির্ভুত। তাই হঠাৎ করেই অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে মধুর ইনিংসটির সহসা ছেদ পড়লো। যে হিউজ ২৫৯ মিনিট উইকেট থেকে ধৈর্যের চরম পরীক্ষা দিয়েছিলেন, সেই তিনি অচমকা কপিলের একটা লাফানো বলে হুক করতে গিয়ে অসংযমীর মতো বিদায় নিলেন নিজস্ব ৮০ রানে। চমৎকার একটি সতেজ ইনিংসের দুঃখজনক পরিণতির শোক গভীরভাবে উপলব্ধি করার আগেই এবার উইকেটে এসে একে একে

বিদায় নিলেন হোয়াটমোর, স্লিপ, ডিমক। ডারলিং কপিলের বাম্পারে বেপরোয়া হতে গিয়ে চোয়ালে আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়লেন। বেচারা বর্ডারের পক্ষে সে একক প্রচেষ্টায় দলের পরাজয় বাঁচানো সম্ভব হবে না, এটা তিনি বোঝার পরই কিছুটা বেপরোয়া হয়ে মারার চেষ্টা করলে, দোশীর বল তাকে ঠকিয়ে সরাসরি বোল্ড করে দেয়। যেখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় দলের রান ছিল ৩ উইকেটে ১৪৯ রান—সেই দলই হিগ্‌সের আউটে সমাপ্তি টানলো মাত্র ১৯৮ রানে।

নেমে এলো ক্রিকেটের বুকে সেই অমোঘ মুহূর্ত। ভারত ম্যাচ জিতলো—এক আধ রানে নয়, পাক্কা একশোটি রানসহ একটি ইনিংস। এই জয়ের সুবাদে ২-০ ম্যাচের ব্যবধানে হিউজের দলকে পেছনে ফেলে ভাগ্যবান গাভাসকার অধিনায়ক হিসাবে এই প্রথম ভারতবর্ষকে এনে দিলো অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রাবার জয়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান। সানির এই জয়—ভারতের জয়, ভারতীয় ক্রিকেটে তারুণ্যের জয়।

এখন প্রশ্ন এই সফর থেকে ভারতবর্ষের ক্রিকেট কি পেল? এই প্রশ্নের সহজ উত্তরে বলবো, এই সফর ভারতীয় ক্রিকেটকে খুব একটা মস্ত জায়গায় পৌঁছে দিতে পারেনি। কেবল লাভের মধ্যে লাভ, যশপালের ভূমিকা এবং দুটি নবাগত স্পিনারের আবির্ভাব—দলের মাঝারি জায়গায় একজন চৌকশ খেলোয়াড়ের যে অভাব, তা এই মরশুমের শেষেও সঠিকভাবে মেটেনি। ফলে সমস্যা যা ছিল এখনও সেই অবস্থাতেই আছে। তবে এই যা সুখের কথা, এই চলতি টেস্ট পর্যায়ে উভয় দলের ব্যাটিং-এর গড় তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন ক্রিকেটের অর্জুন বিশ্বনাথ। মোট ছ'টি টেস্টে আটটি ইনিংসে ব্যাটিং করে দুটি সেনচুরির বিনিময় মোট সংগ্রহ করেছেন ৫১৮ রান, যার গড় ৭৪·০০! আর সানি—তুলনামূলক বিচারে এই মরশুমে তার স্থান ৪২৫ রানের গড় হিসাবে (৫৩·১২) চতুর্থ।

ভিশ যে চলতি মরশুমে প্রচণ্ড ফর্মে আছেন, এই বিষয়ে কোন

সন্দেহ নেই। আর সেই কারণেই ভারতীয় ক্রিকেটের এই জন্ম-শিল্পীটির প্রতি আমাদের প্রত্যাশার আর্তি অনেক গভীর। দেখাই যাক আগামী পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট পর্যায়ের খেলায় তিনি আমাদের হৃদয় আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক হতে পারেন কি না। ভিশ যে ভারতীয় ক্রিকেটের শিল্পময় দেবদূত, ক্রিকেট প্রেমিকের হৃদয় দেবতা—ক্রিকেটের কাননের ব্রজের দুলাল।

ভারতীয় ক্রিকেটকে ঘিরে নানান প্রশ্নের মধ্যে আজ একটি প্রশ্ন বড় জোরদার হয়ে উঠেছে, তাহলো ভারতীয় ক্রিকেটের মূল্যায়ণে কার ভূমিকা বেশী—সানি না ভিশের। প্রশ্নটি আপাত দৃষ্টিতে ছোট মনে হলেও, এর উত্তর কিন্তু এককথায় দেওয়া কোন বুদ্ধিমানের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা জানি, ভারতীয় ক্রিকেটের মূল ভরসা হলেন এই দুই ব্যাটধারী। এই দুই ব্যাটধারীকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের ক্রিকেটের কথা ভাবাই যায় না। প্রভাবশালি এই দুই ব্যাটধারীর মধ্যে প্রকৃত পক্ষে শ্রেষ্ঠ কে, তার বিচার করা বড় কঠিন কাজ। তাছাড়া সংসারের নিয়মরক্ষায় একজনের সঙ্গে অন্যজনের হুবহু মিল পৃথিবীর কোন বস্তুর মধ্যে হয় না। কিছু না কিছু পার্থক্যকরণ থাকে বা থেকেই যায়—এই পার্থক্য সানি ও ভিশের মধ্যেও আছে। আছে প্রয়োগ পদ্ধতি ও মানসিক ভারসাম্যের তফাত। সানির ব্যাটে নিখুঁত শৈল্পিক গুণাগুণ বা ধ্রুপদিয়ানার সার্বিক বিন্যাস না থাকলেও, আছে বড় রান গড়ার রাজসিক গরিমা, বীরদীপ্ত তেজস্বীতা, অহংকারি দাপট এবং অটুট সংযমী মনভাব। প্রকারান্তরে ভিশের মধ্যে বড় রানের প্রতি কোন মোহ উদ্ভাসিত প্রবণনতা নেই বটে, সেই স্থানে ধরা পড়েছে জাত শিল্পীর ক্লাসিকতার মেজাজি ঘরাণা। তাই সানি যেখানে রান গড়ার যন্ত্র হিসাবে নিজের যাবতীয় ইচ্ছাকে সংযমের সীমারেখায় সঙ্কুচিত করতে অভ্যস্ত, ভিশ যেখানে উদার শিল্পীর মানসিকতায় আপন ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে বধ্যপরিকর। একজনের মধ্যে আছে সূর্যের

প্রখর দীপ্ত, অন্যজনের মধ্যে আছে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকিত জ্যোৎস্না নির্মলতা। একজন গরবের, অন্যজন মহিমার। তাই এই দুই ব্যাটধারীর চরিত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেমন আছে অমিল, তেমনি আছে গুণগত পার্থক্য।

ব্যাট হাতে উইকেটে পৌঁছবার আগে সানির মধ্যে একটি সঙ্কল্প দৃঢ় হয়ে থাকে, তাহলো বড় রান গড়ার এক ঐকান্তিক প্রবণতা। তাই তাকে বারবার উচ্চারিত করতে শোনা যায়; সানি কোন ভুলচুক যেন করো না, বল দেখে খেল। উইকেটের বাইরের বল ছেড়ে দাও। ঝুঁকি নিয়ে কোন দুর্লভ মার মারার চেষ্টা কর না। মনে রেখ তোমার বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ বোলার বল করছেন, তারা কি ভাবে বল দিয়ে থাকেন।

এতো গেল সানির কথা। এবার বলি ভিশের কথা। ওকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেছেন—"Who bothers, Just go there and do your best, that is all."

তাহলে বুঝুন আসল পার্থক্যটা কোথায়?

এই প্রসঙ্গে রাজু ভারতন তার "Indian Cricket: The vital phase" গ্রন্থে বলেছেন—"Sunil open with—we never known who. When Vishwanath cames in, it is nine times out of his ten to save the situations rather than consolidate it."

মনে হয় তুলনামূলক বিচারের দিক দিয়ে এই উক্তিটি যথেষ্ট, ভিশ যে ভারতীয় ক্রিকেটের একজন সংগ্রামী বিশ্বস্ত সৈনিক এর প্রমাণ আমরা বহুবার পেয়েছি। পেয়েছি ১৯৭৪-৭৫ সালে লয়েড দলের বিরুদ্ধে। ক্যারিবিয়ান পেশম্যানদের দাপটে নুয়ে পড়া ভারতীয় ইনিংসকে সেদিন একাই স্বতস্ফূর্ত আন্তরিকতায় রক্ষা করেছিলেন ভিশ। কলকাতা টেস্টে জেতার মূলে ছিল তার অবিস্মরণীয় ব্যাটিং গরিমা। কার্ষণ ঘাউড়িকে সঙ্গী করে ভিশ সপ্তম

উইকেটে রান টেনে নিয়ে গেলেন ১৯২ থেকে ২৮৩ রানে—সেই সঙ্গে ৩৭৪ মিনিট ধৈর্যের সঙ্গে ব্যাট করে করলেন ১৩৯ রান, যা আজো কোলকাতা মানুষের স্মৃতির মণিকোঠায় পিকাশোর তৈলচিত্রের মতো এক দুর্লভ নজির হিসাবে রক্ষিত আছে। এই ম্যাচে ভারতীয় দলের জেতার মূলে ছিল তার অনন্য ব্যাটিং মহিমা। মাদ্রাজের চিপক উদ্যানেও ভারত জিতেছিল—জিতেছিল ভিশের স্মরণীয় ব্যাটিং-এর স্নিগ্ধ পবিত্র নিষ্ঠা প্রবণতার রমনীয় বিন্যাসে। মাদ্রাজের চতুর্থ টেস্টে সানি হান ভারতীয় দলের সেদিন ছিল এক দৈন্যাবস্থা। গোটা দল আউট হয়ে গেল রবার্টসের দাপটে ১৯০ রানে। ভিশ গড়লেন এক স্বপ্নের অমর ইনিংস। নিজের ব্যক্তিগত গরিমা যা তিনি অতি সহজে সংগ্রহ করতে পারতেন, তা তিনি হেলায় পদাঘাত করে দলের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে জাতীয়তাবোধের যে উজ্জল নজির ক্রিকেটে রেখে গেলেন—তা ছিল বিস্ময়ের। তিলতিল করে আপন বুকের রক্তে গড়লেন ভারতীয় দলের ইনিংস—তার নিজস্ব রান ছিল ৯৭। অপরাজিত ভিশ-এর এই ইনিংসটি অবশ্যই তার জীবনের একটি সেরা ইনিংস।

তাই বা বলি কি করে—১৯৭৬ সালে পোর্ট অফ স্পেনের সেই ঐতিহাসিক ম্যাচ যে ভারত কোনদিন জিততে পারবো, এ বিশ্বাস কি ভারতবাসীর ছিল না। দ্বিতীয় উইকেটে গাভাসকার যখন বিদায় নিলেন তখন দলের রান মাত্র ১৭৭। এই অবস্থায় তৃতীয় উইকেটে বিশ্বনাথ এক অমর ইনিংস গড়লেন মহিন্দরের সঙ্গে জুটি বেঁধে। ১৭৭ রান থেকে ভিশ নিজস্ব ১১২ রান করে যখন উইকেট থেকে বিদায় নিলেন তখন জয়ের সৌভাগ্য ভারতীয় অনুকূলে প্রবেশ করে গেছে। কাজেই এই ঐতিহাসিক জয়ের মূলে ভিশের অনবদ্য ভূমিকার কথা আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই। ১৯৭৭ সালে ওয়েস্টইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভিশ-এর কল্যাণে বড় রানের এক ইনিংস গড়ে উঠেছিল বাঙালোরে। দিনের প্রথম বলে সানি আউট। হতাশামগ্ন ভারত-

বাসীর হৃদয়ে ভিশ ছিলেন সেদিন একমাত্র ভরসা। মাদ্রাজের সে ম্যাচে ভারত একটি মাত্র খেলায় জিতেছিল—সেই ম্যাচে জয়ের পিছনে ছিলেন এই খুঁদে ব্যাটধারী। খেলা শেষে ম্যান-অফ-দ্যা ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেওয়া ছিল সেদিন তার হাতে। এমন কি ১৯৭৯ সালে ইংল্যাণ্ডের লর্ডস মাঠে ভারত যে খেলায় অপ্রত্যাশিত ভাবে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল সেই খেলায় ভিশের ঐকান্তিক প্রবণতা প্রমান দিয়েছে তার বিশ্বাসী ত্রাণকর্তার শ্রেষ্ঠত্বের ভূমিকা।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একজন বিদেশী সাংবাদিকের মন্তব্য। ওয়েস্টইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভিশের খেলা প্রত্যক্ষ করে তিনি বলেছিলেন—"Three test in which Vishwanath rose to his full five foot—one stature as the finest player of fast bowling in India."

সানির মতো বড় রানে প্রতিষ্ঠার গরিমায় নিজেকে প্রকাশ করতে না পারলেও, ভিশের রান সংখ্যা খুব একটা কম নয়। তিনি সেনচুরির মতো ব্যক্তিগত জৌলুসে অভিসিক্ত না হয়েও অতি সহজে নিঃশব্দে পার করে গেছেন টেস্ট পর্যায়ে চার হাজার রানের সীমানা যা জাত শিল্পীর মেজাজি মনের এক ছন্দবদ্ধ উদাহরণ বলা যেতে পারে। তার ক্লাসিক্যাল ব্যাটিং-এর রূপ মাধুর্য পরিলক্ষিত করে বৃটিশ সমালোচক বলেছেন—"Vishwanath preferred herd hit strokes that were so well timed that fielders give up chosing once the ball had beaten them."

ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের প্রাক্তন ক্রিকেটার ফারুক ইঞ্জিনিয়ারের ভাষায়—"Vishwanath was magnificient. The west Indies embarrassment of riches in pace blaming did not bother him. He played some delightfull shots before he was blowed by Holding"—ভিশ প্রসঙ্গে

ইঞ্জিনিয়ারের এই উক্তি ছিল ১৯৭৯ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এর বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ পর্যায়ের ব্যাটিং প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য: ১৯৭৯-র বিশ্বকাপে ভঙ্গুর ভারতীয় ব্যাটধারাদের সঙ্গে একমাত্র ভিশই আপন সৌন্দর্যে ছিলেন দীপ্তমান।

তুলনামূলক বিচার তাই কখনই এই দুই ব্যাটধারীর মধ্যে করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাইছি পুনরায় "Indian Cricket: vital phase" গ্রন্থের লেখক রাজু ভারতনের একটি উক্তি—"If Vish is a finely tempered player, blending a sound compact defence with fluid grace of stroke, Gaveskar looks upon each ball as a scientific proposition to be tackled with mathematical precision."

মনে হয় তুলনার বিচারে এই উক্তিটি যথেষ্ঠ। সানিকে যদি আমরা অঙ্কের জটিল পদ্ধতি বিন্যাসিত বিশাল রানের গরিমাদীপ্ত আকাশচুম্বি এভারেস্ট হিসাবে চিহ্নিত করি, তাহলে তারি পাশে ভিশের ক্লাসিক ক্রিকেটের মোহমুগ্ধ দৃষ্টি নন্দন স্নিগ্ধতাকে বলতে পারি অবর্ণনীয় কাঞ্চনজঙ্ঘার অনুপম সৌন্দর্য স্বপ্ন। একজন পাটিগণিতের নিয়মরক্ষায় গরিমাদীপ্ত অন্যজন নির্ভুল জ্যামিতির জটিল বিন্যাসে সুবিন্যস্ত। একজনের মধ্যে প্রকাশ ঘটেছে রুদ্রের প্রখর রাজকীয় দীপ্ততার, অন্যজনের মধ্যে বিভাসিত হয়েছে মহিমাময় লাবণ্যের। সানিকে যদি আমরা ভারতীয় ক্রিকেটের প্রবাদ পুরুষ বলি তো, ভিশকে বলতে হবে ক্রিকেট স্বপ্নের রাজকুমার।

বোদ্ধা সমালোচক যারা ক্রিকেটকে সঠিক অর্থে অনুধাবন করে থাকেন, তারা সকলেই একটি বিষয়ে একমত সে ক্রিকেটের অম্লান সৌন্দর্য রচনা করা সকীয় প্রতিভা ছাড়া সম্ভব নয়। ভিশ জাত শিল্পী। তার কব্জির মোচড় মারা স্ট্রোকের অনাবীল প্রকাশ ভঙ্গিতে জাত শিল্পীর যাদুস্পর্শ। ভিশ ক্রিকেটের দুরূহ স্ট্রোকগুলিকে আপন স্বকীয় প্রতিভায় সেভাবে প্রকাশ করেন, তা আর অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

ক্রিকেটের জাত মার তার মজ্জাগত। সাধনসিদ্ধ গণ্ডির হাতে নিয়ে আপন পৌরুষ প্রতিভায় নিজেকে সুসজ্জিত করে অর্জুন যেমন একদা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে কৌরব শ্রেষ্ঠদের পরাজিত করেছিলেন, ঠিক তেমনি ভারতীয় ক্রিকেটের মহাকাব্যের এই দক্ষিণ ভারতীয় তনয়টি আপন প্রতিভার বিন্যাসিত লালিত্যের ধ্রুপদ বাহারে সঞ্জিবীত করে তুলেছেন বিশ্বজনের কাছে ভারতীয় ক্রিকেটের ঐতিহ্যকে—বিশ্বজন তার শিল্প সংযত মাধুর্যের রূপ পরিক্রমায় তাই যেমন মুগ্ধ হয়েছেন, তেমনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

এই তো সেদিন নতুন করে দেখা গেল ভিশকে কলকাতার ইডেনে। মন্থর উইকেট স্ট্রোকের পক্ষে অনুকুল না হওয়া সত্ত্বেও ভিশ সমস্ত প্রতিকুলতাকে অস্বীকার করে সৃষ্টি করেছিলেন একটি চমৎকার সনেট! ইডেনে শীত ছিল না, ছিল না ক্রিকেটের মেজাজ বা বাতাস, উইকেট ছিল রান বিমুখ—তবু তারি মধ্যে শিল্পসম্মত রীতির বিন্যাস কৌশল চাতুর্যে ভিশ মুগ্ধ করেছিলেন সকলকে। তার অনবদ্য ৯৬টি রান যেন ছিয়ানব্বইটি তাজা গোপালের রক্তে তৈরী। এখানেই বুঝি ভিশ একক, অনন্য। তাই বুঝি তার ললিত রাগাশ্রিত ক্রিকেট সৌন্দর্যের গরিমাদীপ্ত সুপ্রভায় স্নাত হয়ে তাদব ক্রিকেট লিখিয়ের দল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—ভিশ ভারতীয় ক্রিকেটের নন্দন কাননে একজন রূপমান দেবঋষি—যার রূপ ঐশ্বর্যের মধ্যে নেই কোন কামনার রাজসিক অহংকারের দাপট, নেই নিজেকে স্বমহিমায় প্রকাশ করার ঐকান্তিক হৃদয় বাসনা—যা আছে তাহলো বৈরাগ্যের মননশীলতায় গড়া স্বর্গীয় শিল্পীর আত্মস্থ দরদী মনের মুক্তির স্নিগ্ধ পরশ। ত্যাগের ব্রতে দীক্ষিত তাপস নিজেকে অম্লান মহত্বে বিলিয়ে দিয়েছেন ক্রিকেটের মহাতপস্যায়।

তাই বলি ক্রিকেট যতদিন থাকবে, ততদিন থাকবেন তিনি। থাকবেন ভারতীয় ক্রিকেটের স্বাশ্বত ক্রিকেট আদর্শের আঙিনা জুড়ে, বিশ্বাসী প্রহরীর আদর্শ প্রতিক হিসাবে।

হে ক্রিকেট অর্জুন, তোমার পবিত্র আগমনে ভারতীয় ক্রিকেট ভূমি আজ ধন্য—অমর তোমারি হাতের ব্যাটের সুর মুর্চ্ছনা, শিল্পীজ বিন্যাস সমৃদ্ধ ধ্রুপদী সৌন্দর্যের গরিমা। তোমার অমর শুভ আবির্ভাবে ভারতীয় ক্রিকেট ধন্য। বিশ্বজনের কাছে প্রকাশ পেয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট মহিমা। অবাক বিস্ময়ে বিশ্বক্রিকেট অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে সত্যিকার ভারতীয়ত্ব বলতে কি বোঝায়।

বৃটিশ ক্রিকেটের ব্যাকারণ বিন্যাস, ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট সমৃদ্ধ প্রাণ উন্মাদনা ও শিল্পের বিনম্র বিকাশ এবং অস্ট্রেলিয় ক্রিকেটের রান সংগ্রহের রিতীনিতী—এই ট্রিলজিও ধারার এক সার্থক সমন্বয়ের নামই গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ। ক্রিকেটের সার্থক ট্রিলজির প্রকাশ বিশ্বনাথের মধ্যে যত ব্যাপক, তত গভীর বিকাশ ঘটেছে সার্থক ভারতীয়ানার। হিমালয়ের বৈরাগ্য সাধন উদারতা, ধ্যান গম্ভীর আত্মনিমগ্নতা। অন্তহীন সুনীল আকাশের সীমাহীন ব্যাপ্তির সঙ্গে ভিশের আন্তরিক ক্রিকেটের সুর ঝংকারে প্রতি মুহূর্তে সুর মিলিয়ে বেজে উঠেছে নীল সমুদ্রের সুগভীর প্রাণোচ্ছল আর্তি। ক্রিকেট সাধক তার হাতের সাধন সিদ্ধ ব্যাটে সুরেলা যন্ত্রের মতো সপ্তসুরের মূর্চ্ছনা তুলে বিশ্বজনকে শুনিয়ে চলেছেন স্বর্গীয় সংগীতের ধ্রুপদ রাগিণী—সে সুর বিস্তারে প্রকাশ পেয়েছে মানবজীবনের শাশ্বত হৃদয়বোধের অনুপম ক্রিকেটীয় রাগরাগিণীর বিচিত্র আলাপন।

ভিশ-এর ক্রিকেট প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তাই একদা ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকর বলেছিলেন "Take Sunil and Vish, In my opinion, Vish is the sounder and better player. Pataudi was one of the greatest batsman I ever saw. Vish has the pontential to be equally great. But Vish is always going for his shots. Sunil is a greater by the contrast."

তাই যত দেখি, ততই এই রূপের শুচি শুভ্র মোহে মুগ্ধ হই।

রূপ মুগ্ধতার এই স্বপ্ন ঘোর কিছুতেই কাটতে চায় না। মেটে না আমাদের হৃদয়ের অনন্ত প্রাপ্তির পিপাসা। বরং যত দেখি ততই বেড়ে যায় দেখার আগ্রহ। যত দেখি ততই বেশী করে ইচ্ছে হয় ওই রূপের অরূপে আত্মস্থ হতে। কিন্তু হায়রে অবুঝ মন সে কি কাছে পাওয়ার, তার চোখের মোহিনী ইশারায় আছে বৈরাগ্যের সাধন মন্ত্র—তাকে কাছে পেয়ে ধরে রাখবো কোথায়? সে তো কাছে থাকার নয়। কাছে যাকে পেতে চাওয়া, তার জন্য তো কিছু দেওয়ার প্রশ্ন আছে। কি দেবে তাকে—সে ঐশ্বর্য আমাদের কোথায়? কি দিয়ে আমরা একনিষ্ঠ ভক্তের দল অনন্তকালের রূপতাপস এক সাধক সন্ন্যাসীকে সেবা করবো— সে ঐশ্বর্য তো আমাদের নেই। তার বিকাশ মাধুর্যকে কাছে রাখার মতো আমাদের হৃদয় প্রকাশ কতটুকু?

তবু দেওয়ার বাসনা ভক্তের মনে থাকে। প্রেমের অমোঘ টানে প্রেমিক নিস্ব হলেও নিজেকে প্রেম দরিয়ায় ভাসাতে কার্পণ্য করে না। প্রেমের প্রভায়, ভক্তি রসের মন্ত্রে, পদাবলী কবি জ্ঞানদাসের প্রেম সত্বায় যে সুগভীর অনুরাগ আর্তি ধ্বনিত হয়েছিল, সেই প্রেম আর্তি কি আমাদের হৃদয় কন্দরে মূর্চ্ছিত হয় না? আমরা কি ভারতীয় ক্রিকেটের নন্দন কাননের স্বর্গীয় দেবশিশুর রূপ মাধুর্য ও সৌন্দর্য মদিরায় আত্মস্থ হয়ে সুরভিত গন্ধে মাতোয়ারা হৃদয় চঞ্চলতায় প্রকাশ করি না আপন মনের অনুরাগ—? করি—নিশ্চয়ই করি। রক্তের প্রবাহ চঞ্চলতায় পদাবলীর হৃদয় আর্তির সুর মুর্চ্ছনা তো প্রকাশ ঘটে আমাদেরই মধ্যে। জ্ঞানদাসের ভাষায় আমরাও ক্রিকেটের প্রেম উন্মাদনার উচ্ছ্বাসে তাকে লক্ষ্য করে আবেগে বলে উঠি—

"বধূ হে, আর কি তোমারে দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেখানে তোমারে থোব॥"

বিশ্বনাথের টেস্ট পর্যায়ের রান ও গড় হিসাব

সিরিজ	বিপক্ষ	টেস্ট	ইনিংস	নঃ আউট	হাঃ রান	মোট রান	গড়
১৯৬৯-৭০	অস্ট্রেলিয়া	৪	৮	১	১৩৭	৩৩৪	৪৭.৭১
১৯৭১	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৩	৫	×	৫০	১৩৫	২৭.০০
১৯৭১	ইংল্যাণ্ড	৩	৬	১	৬৮	১২৮	২৫.৬০
১৯৭২-৭৩	ইংল্যাণ্ড	৫	১০	১	১১৩	৩৬৫	৪০.৪৫
১৯৭৪	ইংল্যাণ্ড	৩	৬	×	৫২	২০০	৩৩.৩৩
১৯৭৪-৭৫	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৫	১০	১	১৩৯	৫৬৮	৬৩.১১
১৯৭৬	নিউজিল্যাণ্ড	৩	৬	১	৮৩	১৯৭	৩৯.৪০
১৯৭৬	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৪	৬	×	১১২	২২৫	৪২.৫০
১৯৭৬-৭৭	ইংল্যাণ্ড	৫	১০	১	৭৯*	১৭৫	১৯.৪৪
১৯৭৭	নিউজিল্যাণ্ড	৩	৬	১	১০৩*	৩২৪	৬৪.৮০
১৯৭৭-৭৮	অস্ট্রেলিয়া	৫	১০	×	৮৯	৪৭৩	৫২.৫৫
১৯৭৮-৭৯	পাকিস্তান	৩	৫	×	১৪৫	২৪৯	৪৯.৮০
১৯৭৮-৭৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৬	৭	×	১৭৯	৫০০	৭১.৪০
১৯৭৯	ইংল্যাণ্ড	৪	৭	×	১১৩	৩৪১	৪৮.৫০
১৯৭৯	অস্ট্রেলিয়া	৬	৮	১	১৬১*	৫১৮	৭৪.০০

বিশ্বনাথের শতরানের হিসাব

সিরিজ	বিপক্ষ	স্থান	রান	টেস্ট ও	ইনিংস
১৯৬৯	অস্ট্রেলিয়া	কানপুর	১৩৭	২য়	২য়
১৯৭২-৭৩	ইংল্যাণ্ড	বোম্বাই	১১৩	৫ম	১ম
১৯৭৪-৭৫	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	কলকাতা	১৩৯	৩য়	২য়
১৯৭৬	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	পোর্ট অফ স্পেন	১১২	৩য়	২য়
১৯৭৭	নিউজিল্যাণ্ড	কানপুর	১০৩*	২য়	২য়
১৯৭৮-৭৯	পাকিস্তান	ফৈজালাবাদ	১৪৫	১ম	১ম
১৯৭৮-৭৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	মাদ্রাজ	১২৪	৪র্থ	১ম
১৯৭৮-৭৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	কানপুর	১৭৯	৬ষ্ঠ	১ম
১৯৭৯	ইংল্যাণ্ড	লর্ডস	১১৩	২য়	২য়
১৯৭৯	অস্ট্রেলিয়া	বাঙালোর	১৬১*	২য়	১ম
১৯৭৯	অস্ট্রেলিয়া	দিল্লী	১৩১	৪র্থ	১ম

বিশ্বনাথের ইনিংস পিছু রান (১৯৭৯ অস্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত)

সাল	দল	টেস্ট	স্থান	ইনিংস ১ম	ইনিংস ২য়
১৯৬৯	অস্ট্রেলিয়া	২য়	কানপুর	০	১৩৭
"	"	৩য়	দিল্লী	২৯	৪৪*
"	"	৪র্থ	কলকাতা	৫৪	৫
"	"	৫ম	মাদ্রাজ	৬	৫৯
১৯৭১	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১ম	কিংস্টন ওভাল	—	—
"	"	২য়	স্পোর্ট অফ স্পেন	—	—
"	"	৩য়	জর্জ টাউন	৫০	—
"	"	৪র্থ	বার্বাডোজ	২৫	০
"	"	৫ম	পোর্ট অফ স্পেন	২২	৩৮
১৯৭১	ইংল্যাণ্ড	১ম	লর্ডস	৬৮	৯
"	"	২য়	ওল্ড ট্রাফোর্ড	১০	৮*
"	"	৩য়	ওভাল	০	৩৩
১৯৭২-৭৩	ইংল্যাণ্ড	১ম	ফিরোজ শাহ কোটলা	২৭	৩
"	"	২য়	কলকাতা	৩	৩৪
"	"	৩য়	মাদ্রাজ	৩৭	০
"	"	৪র্থ	কানপুর	২৫	৭৫*
"	"	৫ম	বোম্বাই	১১৩	৪৮
১৯৭৪	ইংল্যাণ্ড	১ম	ওল্ড ট্রাফোর্ড	৪০	৫০
"	"	২য়	লর্ডস	৫২	৫
"	"	৩য়	বার্মিহাম	২৮	২৫
১৯৭৪-৭৫	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১ম	বাঙালোর	২৯	২২
	"	২য়	ফিরোজ শাহ কোটলা	৩২	৩৯
	"	৩য়	কলকাতা	৫২	১৩৯
	"	৪র্থ	মাদ্রাজ	৯৭*	৪৬
	"	৫ম	বোম্বাই	৯৫	১৭

সাল	দল	টেস্ট	স্থান	ইনিংস ১ম	২য়
১৯৭৬	নিউজিল্যাণ্ড	১ম	অকল্যাণ্ড	০	১১*
	”	২য়	ল্যানচেস্টার	৮৩	৭৯
	”	৩য়	উইলিংটন	৪	২০
১৯৭৬-৭৭	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১ম	বার্বাডোজ	১১	৬২
”	”	২য়	পোর্ট অফ স্পেন	২১	—
”	”	৩য়	”	৪১	১১২
”	”	৪র্থ	কিংস্টন ওভাল	৮	—
১৯৭৬-৭৭	ইংল্যাণ্ড	১ম	ফিরোজ শাহ কোটলা	৩	১৮
”	”	২য়	কলকাতা	৩৫	৩
”	”	৩য়	মাদ্রাজ	৯	৬
”	”	৪র্থ	বোম্বাই	৪	৫
”	”	৫ম	বাঙালোর	১৩	৭৯*
১৯৭৭	নিউজিল্যাণ্ড	১ম	বোম্বাই	১০	৩৯
”	”	২য়	কানপুর	৬৮	১০৩*
”	”	৩য়	মাদ্রাজ	৮৭	১৭
১৯৭৭-৭৮	অস্ট্রেলিয়া	১ম	ব্রিসবেন	৪৫	৩৫
”	”	২য়	পার্থ	৩৮	১
”	”	৩য়	মেলবোর্ণ	৫৯	৫৪
”	”	৪র্থ	সিডনি	৭৯	—
”	”	৫ম	এডিলেড	৮৯	৭৩
১৯৭৮	পাকিস্তান	১ম	ফৈজালাবাদ	১৪৫	—
”	”	২য়	লাহোর	২০	৮৩
”	”	৩য়	করাচী	০	১

সিরিজ	বিপক্ষ	টেস্ট	স্থান	ইনিংস ১ম	২য়
১৯৭৮-৭৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১ম	বোম্বাই	৫২	—
"	"	২য়	বাঙালোর	৭৩	—
"	"	৩য়	কলকাতা	৩২	—
"	"	৪র্থ	মাদ্রাজ	১২৪	৩১
"	"	৫ম	ফিরোজ শাহ কোটলা	৯	—
"	"	৬ষ্ঠ	কানপুর	১৭৯	—
১৯৭৯	ইংল্যাণ্ড	১ম	বার্মিহাম	৭৮	৫১
"	"	২য়	লর্ডস	২১	১১৩
"	"	৩য়	লিডস	১	—
"	"	৪র্থ	ওভাল	৬২	১৫
১৯৭৯	অস্ট্রেলিয়া	১ম	মাদ্রাজ	১৭	—
"	"	২য়	বাঙালোর	১৬১*	—
"	"	৩য়	কানপুর	৪৪	৫২
"	"	৪র্থ	ফিরোজ শাহ কোটলা	১৩১	—
"	"	৫ম	কলকাতা	৯৬	৭
"	"	৬ষ্ঠ	বোম্বাই	১০	—

কোন দেশের বিরুদ্ধে কত রান (১৯৭৯ অস্ট্রেলিয়া সিরিজ পর্যন্ত)

দল	সিরিজ	টেস্ট	ইনিংস	নঃ আউট	রান	গড়
অস্ট্রেলিয়া	১৯৬৯-৭০	৪	৮	১	৩৩৪	৪৭·৭১
	১৯৭৭-৭৮	৫	১০	×	৪৭৩	৫২·৫৫
	১৯৭৯	৬	৮	১	৫১৮	৭৪·০০
—		১৫	২৬	২	১৩২৫	৫৫·২০
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯৭১	৩	৫	×	১৩৫	২৭·০০
	১৯৭৪-৭৫	৫	১০	১	৫৬৮	৬৩·১১
	১৯৭৬	৪	৬	×	২৫৫	৪২·৫০
	১৯৭৮-৭৯	৬	৭	×	৫০০	৭১·৪০
		১৮	২৮	১	১৪৫৮	৫৪·০০

দল	সিরিজ	টেস্ট	ইনিংস	নঃ আউট	রান	গড়
ইংল্যাণ্ড	১৯৭১	৩	৬	১	১২৮	২৫.৬০
	১৯৭২-৭৩	৫	১০	১	৩৬৫	৪০.৫৫
	১৯৭৪	৩	৬	×	২০০	৩৩.৩৩
	১৯৭৬-৭৭	৫	১০	১	১৭৫	১৯.৪৪
	১৯৭৯	৪	৭	×	৩৪১	৪৮.৫০
		২০	৩৯	৩	১২০৯	৩৩.৫০
নিউজিল্যাণ্ড	১৯৭৬	৩	৬	১	১৯৭	১৯.৪০
	১৯৭৭	৩	৬	১	৩২৪	৬৪.৮০
		৬	১২	২	৫২১	৫২.১০
পাকিস্তান	১৯৭৮	৩	৫	×	২৪৯	৪৯.৮০

শতরান পিছু সময় ও বাউনডারী

সফর	বিপক্ষ	রান	সময়	বাউনডারী চার	বাউনডারী ছয়
১৯৬৯	অস্ট্রেলিয়া	১৩৭	২৫৭	১১	×
১৯৭২-৭৩	ইংল্যাণ্ড	১১৩	২৬৭	১৮	১
১৯৭৪-৭৫	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৩৯	৩৭৮	২৩	×
১৯৭৬	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১১২	২২১	১৫	×
১৯৭৬-৭৭	নিউজিল্যাণ্ড	১০৩	১৪৭	৮	×
১৯৭৮	পাকিস্তান	১৪৫	৩৫৬	১৬	×
১৯৭৮-৭৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১২৪	৩৪৬	১৭	×
১৯৭৮-৭৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৭৯	৪০৮	২১	×
১৯৭৯	ইংল্যাণ্ড	১১৩	৩৫৮	১২	×
১৯৭৯	অস্ট্রেলিয়া	১৬১	৩২২	১১	১
১৯৭৯	অস্ট্রেলিয়া	১৩১	২০৩	১৭	×

বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় বিশ্বনাথের রানের হিসাব :

সিরিজ	ইংল্যাণ্ড	ইস্ট আফ্রিকা	নিউজিল্যাণ্ড	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	শ্রীলংকা
১৯৭৫	৩৭	×	২	×	×
১৯৭৯	×	×	৯	৭৮	২২
	৩৭	×	১১	৭৮	২২

বিশ্বনাথের মোট টেস্ট পর্যায়ের খতিয়ান (১৯৭৯ অস্ট্রেলিয়া সফর পর্যন্ত)

দেশ	টেস্ট	ইনিংস	মোট রান	সেনচুরি	নঃ আঃ	গড়
ইংল্যাণ্ড	২০	৩৯	১২০৯	২	৩	৩৩·৫০
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৮	২৮	১৪৫৮	৪	১	৫৪·০০
নিউজিল্যাণ্ড	৬	১২	৫২১	১	২	৫২·১০
অস্ট্রেলিয়া	১৫	২৬	১৩২৫	৩	২	৫৫·২০
পাকিস্তান	৩	৫	২৪৯	×	×	৪৯·৮০
	৬২	১১০	৪৭৬২	১০	৮	৪৬·৬৮

কোন মাঠে কত রান (১৯৬৯-১৯৭৯ অস্ট্রেলিয়া সফর পর্যন্ত)

মাঠ	টেস্ট	ইনিংস	রান	সেঃ	হাফ সেঃ	শূন্য	নট আউট
কানপুর	৫	৭	৬৮৩	৩	৩	১	২
মাদ্রাজ	৭	১৩	৫৩৬	১	৩	১	১
কলকাতা	৬	১১	৪৬০	১	৩	×	×
বোম্বাই	৬	১০	৩৯৩	১	২	×	×
দিল্লী	৬	১০	৩৩৫	১	×	×	২
বাঙালোর	৪	৬	৩৭৭	১	২	×	১
কিংস্টন ওভাল	১	১	৮	×	×	×	×
পোর্ট অফ স্পেন	৩	৫	২৩৪	১	×	×	×
জর্জ টাউন	১	১	৫০	×	১	×	×
বার্বাডোজ	২	৪	৯৮	×	১	১	×
অকল্যাণ্ড	১	২	১১	×	×	১	১
ম্যানচেস্টার	১	২	১৬২	×	২	×	×
উইলিংটন	১	২	২৪	×	×	×	×
করাচী	১	২	১	×	×	১	×
ফৈজালাবাদ	১	১	১৪৫	১	×	×	×
লাহোর	১	২	১০৩	×	২	×	×
ব্রিসবেন	১	২	৮০	×	×	×	×

মাঠ	টেস্ট	ইনিংস	রান	সেঃ	হাফ সেঃ	শূন্য	নট আউট
মেলবোর্ণ	১	২	১১৩	×	২	×	×
সিডনি	১	১	৭৯	×	১	×	×
পার্থ	১	২	৩৯	×	×	×	×
এডিলেড	১	২	১৬২	×	২	×	×
লর্ডস	৩	৬	২৬৮	১	২	×	×
লিডস	১	১	১	×	×	×	×
ওভাল	১	৪	১৩৩	×	১	১	×
ওল্ডট্রাফোর্ড	২	৪	১০৮	×	১	×	১
বার্মিহাম	২	৪	১৮২	×	২	×	×

বিশ্বনাথের হাজার রান

টেস্ট	বিপক্ষ	মাঠ	রান	সাল
১৬	ইংল্যাণ্ড	ওল্ডট্রাফোর্ড	১০০০	১৯৭৪
২৭	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	বার্বাডোজ	২০০০	১৯৭৬
৪৩	এডিলেড	অস্ট্রেলিয়া	৩০০০	১৯৭৮
৫৩	বার্মিহাম	ইংল্যাণ্ড	৪০০০	১৯৭৯

*৩০০০ রান থেকে ৪০০০ রানে পৌঁছতে ভিশের সময় নিয়েছে মাত্র ১৩টি ইনিংস—ভারতীয় ক্রিকেটের পক্ষে এটাই হলো দ্রুততম ১০০০ রান পুরনের একটি রেকর্ড।

শত রানের জুটি

রান	উইকেট	জুটি	দল	টেস্ট	সাল
১০২	তৃতীয়	ওয়াদেকর	অস্ট্রেলিয়া	পঞ্চম	১৯৬৯-৭০
১২০	চতুর্থ	ওয়াদেকর	অস্ট্রেলিয়া	তৃতীয়	১৯৬৯-৭০
১১০	ষষ্ঠ	সোলকার	অস্ট্রেলিয়া	দ্বিতীয়	১৯৬৯-৭০
১১২	তৃতীয়	সানি গাভাসকার	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	তৃতীয়	১৯৭১
১৫০	পঞ্চম	সেলিম দুরানী	ইংল্যাণ্ড	পঞ্চম	১৯৭২-৭৩
১২১	পঞ্চম	এ. গায়কোয়াড়	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	পঞ্চম	১৯৭৪-৭৫
১৫৯	তৃতীয়	মাহিন্দর অমরনাথ	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	তৃতীয়	১৯৭৬
১৭২	চতুর্থ	এ. গায়কোয়াড়	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	ষষ্ঠ	১৯৭৯
১৬৬	চতুর্থ	ডি. বেঙ্কসরকার	পাকিস্তান	প্রথম	১৯৭৯
২১০	তৃতীয়	ডি. বেঙ্কসরকার	ইংল্যাণ্ড	দ্বিতীয়	১৯৭৯

রান	উইকেট	জুটি	দল	টেস্ট	সাল
১১৪	তৃতীয়	সানি গাভাসকার	পাকিস্তান	দ্বিতীয়	১৯৭৯
১৫৯	চতুর্থ	ডি. বেঙ্গসরকার	অস্ট্রেলিয়া	দ্বিতীয়	১৯৭৯
১৫৯	তৃতীয়	সানি গাভাসকার	অস্ট্রেলিয়া	চতুর্থ	১৯৭৯

এই পরিসংখ্যান ১৯৭৯ সালের অস্ট্রেলিয়া সফর পর্যন্ত

বিশ্বনাথের মোট রান	: ৪৭৬২ রান
টেস্ট ও ইনিংস	: ৬২টি টেস্ট ও ১১০টি ইনিংস
মোট শতরান সংখ্যা	: দশটি
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে	: তিনটি
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এর বিরুদ্ধে	: চারটি
নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে	: একটি
ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে	: দুটি
স্বদেশের মাটিতে রান	: ২৭৮৪ রান। ৩৪টি টেস্টে ৬০টি ইনিংসে।
বিদেশের মাটিতে রান	: ১৯৭৮ রান। ২৮টি টেস্টে ৫০টি ইনিংসে।
প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ	: ২৮৫৬ রান
দ্বিতীয় ইনিংসে সংগ্রহ	: ১৯০৬ রান
স্বদেশের মাটিতে সেনচুরি	: ছ'টি সেনচুরি
বিদেশের মাটিতে সেনচুরি	: ৪টি সেনচুরি
টেস্ট পর্যায়ে সর্বোচ্চ রান	: ১৭৯ রান কানপুরে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৭৭ সালে।
টেস্ট পর্যায়ে শূন্যরান	: ৬ বার
টেস্ট পর্যায়ে ক্যাচ	: ৪৫টি
টেস্টে সংগৃহীত উইকেট	: একটি
রণজি ট্রফিতে সর্বোচ্চ রান	: ২৪৭ রান
পুরস্কার	: 'অর্জুন' পুরস্কার ১৯৭৭

সমাপ্ত